আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতা

সনেট ॥ উনিশ শতক

জীবেন্দ্র সিংহরায় এম. এ., ডি. ফিল্
অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

ক্লাসিক প্রেস
৩/১এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

Adhunik Bangla Gitikavita : Sonnet
By JIBENDRA SINHA ROY

Gita Sinha Roy

প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর; ১৯৬৮

প্রকাশক : শান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত
৩/১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক : শ্রীনিমাই মুখার্জি
চলন্তিকা প্রেস
২নং রাণী দেবেন্দ্রবালা রোড,
কলিকাতা-২

দশ টাকা

স্বর্গত অগ্রজ

দ্বিজেন্দ্রবিনোদ সিংহরায়

এম. এস্-সি. (ক্যাল), পি-এইচ্. ডি. (লণ্ডন),
ডি. আই. সি. (লণ্ডন), এ. ইন্‌ষ্ট. পি. (ইংল্যাণ্ড)

মহাশয়ের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে।

নিবেদন

কাব্য-সংসারে গীতিকবিতার যেমন একটা স্বতন্ত্র জাতি-পরিচয় আছে, তেমনি আছে তার বিচিত্র প্রজাতি-পরিচয়। গীতিকবিতার সেই প্রজাতিগুলির মধ্যে প্রধান হচ্ছে ওড, সনেট ও এলিজি। য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সাহিত্যে এই তিন কাব্যবন্ধেরই নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলন হয়েছে এবং দীর্ঘ দিনের চর্চার ফলে তারা সেখানে স্থায়ী প্রতিষ্ঠাও লাভ করেছে। সেই প্রতিষ্ঠার নানা দিক খুঁটিয়ে বিচার করলে মনে হয়, গীতিকবিতার রূপভেদগুলির প্রত্যেকটিই কালক্রমে কম-বেশী পরিমাণে জটিল ও আয়াসসাধ্য কবিকর্ম হয়ে উঠেছে।

আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতার জন্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। সেই সময়ে রেনেসাঁসের আশীর্বাদ শিক্ষিত বাঙালীর চিত্তে ছড়িয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে আসে আত্মপ্রকাশের নতুন তাগিদ, দেখা দেয় কাব্য-সাহিত্যের নতুন রূপ ও রীতি সন্ধানের প্রয়োজন। সেই যুগ-প্রবৃত্তির দাবিতে ও নবজাগ্রত ব্যক্তিতন্ত্রকে কেন্দ্র করে আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতার উদ্ভব ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে য়ুরোপীয় আদর্শে গীতিকবিতার ক্ষেত্রে রূপ-বৈচিত্র্যও আসে। মধুসূদন প্রথম সনেট লেখেন, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রমুখ কবিরা লেখেন এলিজি এবং মধুসূদনই ওড-জাতীয় গীতিকবিতার প্রবর্তন করেন। ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায়, উনিশ শতকের মধ্যেই গীতিকবিতার প্রজাতি বা বিশিষ্ট রূপভেদগুলি প্রতিষ্ঠা লাভ করে ফেলেছে।

বাঙলা সমালোচনা-সাহিত্যে আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতার ভাব ও চরিত্র নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে বটে, কিন্তু তার রূপ ও রীতি নিয়ে তেমন আলোচনা হয় নি। অথচ আমরা জানি, কাব্য-সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ন রূপ-রীতির বিচার ছাড়া হতে পারে না। তাছাড়া সাম্প্রতিক কালে উন্নত সমালোচনা শাস্ত্রের বিশেষ ঝোঁকও পড়েছে প্রযুক্তিতত্ত্বের (stylistics) দিকে। এই সব কথা মনে রেখে আমি গীতিকবিতার বিচিত্র রূপ ও রীতি সম্বন্ধে চারটি গ্রন্থ রচনার পরিকল্পনা করেছি—এক, ওড ; দুই, সনেট ; তিন, এলিজি ; চার, সাধারণ গীতিকবিতা। আমার ওড-সম্পর্কিত আলোচনা পূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে এবং প্রকাশের পর গ্রন্থটির বিষয়-নির্বাচন ও পরিকল্পনা নূতন বলে স্বীকৃতি

লাভ করেছে। বর্তমান গ্রন্থে ঐতিহাসিক পদ্ধতিতে বাঙলা সনেটের প্রকার ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করেছি। পরিকল্পিত অন্য দুটি গ্রন্থ ক্রমে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে।

এই গ্রন্থের পরিকল্পনা ও আলোচনাপদ্ধতি সম্পর্কে কিছু বলা আবশ্যক মনে করি। গ্রন্থটির প্রথম অধ্যায়ে ঐতিহাসিক পটভূমিকায় য়ুরোপীয় সনেটের স্বরূপ ও বৈচিত্র্য নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। সনেট নিয়মানুগ হলেও এক আশ্চর্য নমনীয়তার ফলে দেশভেদে ভাষাভেদে কবিভেদে তা কি কি রূপ লাভ করেছে, তা-ই দেখাবার চেষ্টা অধ্যায়টিতে আছে। তবে সনেট সজীব রূপবন্ধ হলেও তার ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তনকে আমি সমর্থন করি নি যাতে তার চিহ্নিত রূপগঠনরীতি ও বিশিষ্ট পরিচয় বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। অর্থাৎ সনেটের রূপবন্ধের সজীবতার অর্থ যদৃচ্ছ ও মৌল পরিবর্তনশীলতা নয়। সেক্সপীরীয়, ফরাসী, মিল্টনীয় ইত্যাদি রূপভেদগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাতে কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও সনেট-লক্ষণ বজায় আছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি আধুনিক-পূর্ব বাঙলা কাব্যে যে সমস্ত চতুর্দশপদী কবিতা আছে, বাঙলা সনেটের ইতিহাসে তাদের যে কোনো স্থান নেই তা বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। তৃতীয় অধ্যায়ে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ববর্তী কালে বাঙলা দেশে ইংরেজী সনেট চর্চার যে সমস্ত উদাহরণ মেলে, তার বিবরন দিয়েছি এবং বাঙলা সনেটের আত্মপ্রকাশের আগে কয়েকজন কবির, বিশেষ করে মধুসূদনের চোখে ও কলমে সনেট কি রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছিল তা প্রাসঙ্গিকভাবেই নির্ধারণ করবার চেষ্টা করেছি। চতুর্থ অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত আছে বাঙলা সনেটের কবি-কেন্দ্রিক ইতিবৃত্ত। সহৃদয় পাঠক যদি মৎ-সম্পাদিত এক শত বৎসরের সনেট-সংগ্রহ 'বাঙলা সনেটের' দিকে লক্ষ্য রেখে বর্তমান গ্রন্থটি পাঠ করেন, তবে উনিশ শতকে বাঙলা সনেটের বিবর্তন সম্বন্ধে অবহিত হতে পারবেন বলে আমি আশা পোষণ করি।

উনিশ শতকে বাঙালী কবিদের সনেট-চর্চার বিবরণ দিতে গিয়ে কবিদের কোন্ কোন্ কবিতা সনেট হিসেবে গ্রহণযোগ্য এবং কোন্ কোন্ সনেট কোন্ জাতীয়, সেই বিচারে আমাকে বিশেষভাবে প্রবৃত্ত হতে হয়েছে। ফলে এই গ্রন্থে এমন কবিকর্মের প্রসঙ্গও উত্থাপিত হয়েছে, সনেটের রূপ ও রীতি পরিগ্রহ করা সত্ত্বেও যা শিল্পসৃষ্টি হিসেবে উৎকৃষ্ট বা উল্লেখযোগ্য নয়। তাছাড়া সনেটের প্রযুক্তিগত বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ মূল লক্ষ্য হওয়ায় সনেটের কবিত্ব বিচারের খুব বেশী অবসর আমি পাই নি। আরও লক্ষণীয় এই যে, কবি-কেন্দ্রিক আলোচনা-পদ্ধতি

অনুসরণ করেছি বলে উনিশ শতকে প্রকাশিত সব সনেটই (অখ্যাত বা অল্পখ্যাত কবিদের অনেক সনেট সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়েছিল, একথা এখানে স্মরণযোগ্য) বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন বোধ করি নি। গ্রন্থটিতে আলোচিত বিষয়ের কাল-পরিধি মোটামুটিভাবে উনিশ শতক। তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী-চর্চার আলোচনা 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীর' মধ্যেই প্রধানতঃ সীমাবদ্ধ রেখেছি। কারণ রবীন্দ্র-কবি-জীবনের ইতিহাসে 'মানসীর' একটা সুস্পষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

গ্রন্থটি প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছেন ক্লাসিক প্রেসের শ্রীঅমল সেনগুপ্ত, প্রুফ দেখেছেন শ্রীশান্তিরঞ্জন সেনগুপ্ত এবং নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করে দিয়েছেন বর্ধমান রাজ কলেজের অধ্যাপক শ্রীমান্ সত্যনারায়ণ দাশ। তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

১লা নভেম্বর, ১৯৬৮

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

জীবেন্দ্র সিংহ রায়

বিষয়-সূচী

পরিশিষ্ট

নির্ঘণ্ট

১। পাশ্চাত্য সনেটের রূপ ও রীতি

সনেটের জন্ম ইতালীতে। তার আদি পর্বের ইতিহাস কতকটা অস্পষ্ট ও অন্ধকারাচ্ছন্ন। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে সিসিলীয় কবিগোষ্ঠী ত্রুবাদুরদের রচিত প্রভেঁসাল গীতিকবিতাকে ভিত্তি করে সনেটের সূত্রপাত করেন।[১] একদা ফ্রান্সের দক্ষিণ পূর্বাংশে প্রভেঁস নামক অঞ্চলে গায়ক-কবি ত্রুবাদুররা যে প্রেম-সঙ্গীত রচনায় দক্ষতা দেখিয়েছিলেন, তার দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথমতঃ, প্রেমই ছিল তার একমাত্র বিষয়বস্তু। শৌর্য-বীর্য, মিলন-বিরহ, সুখ-দুঃখ, বসন্তোল্লাস ইত্যাদি ভাবগুলির প্রকাশও ছিল মূলতঃ নারীকেন্দ্রিক ও প্রেমঘটিত। অবস্থাভেদে নায়ক-কবির আকাঙ্ক্ষা ও মেজাজের তারতম্য ঘটলেও তিনি নায়িকার প্রতি প্রশংসা, তার নির্দয়তায় অনুযোগ ও নিজের আনুগত্য সম্বন্ধে ঐকান্তিক অঙ্গীকার করেছেন এবং কখনও কখনও ভিন্নতর সংবেদনশীলা নারীর প্রতি অনুরাগ প্রদর্শনের হুমকি দিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ, ত্রুবাদুর প্রেম ছিল আদিরসাত্মক ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র। সেই প্রেম কোনো কোনো কবির সৃষ্টিতে কালক্রমে কিছুটা মার্জিত, পরিশোধিত ও সূক্ষ্ম হয়েছিল,[২] সন্দেহ নেই; তথাপি ত্রুবাদুর প্রেম মর্মগতভাবে সম্ভোগাখ্যই ছিল। যুগানুগ ধর্মবোধের প্রক্ষেপ সম্ভোগাখ্য প্রেমের তীব্রতা বাড়িয়ে দিয়েছিল, তার মুখ

১. 'It is to them (Sicilian group of poets) or perhaps to one of them, Jacope da Lentini, that we owe the invention of the sonnet.'—Cassell's Encyclopaedia of Literature (1953), P. 299.

২. 'Guilhem rejects the traditional conception of sensual love···the love he sings of is rather a secularization of the mystic's veneration of Mary. Woman is now idealised as a remote incarnation of beauty···This platonic conception of woman was elaborated during the next 150 years'—Ibid, P. 468.

ভিন্ন দিকে ফিরিয়ে দিতে পারে নি।[৩] ক্রবাদুর প্রেমসঙ্গীতের এই মর্মগত তাৎপর্যের সঙ্গে তার রূপগত বৈশিষ্ট্যের কথাও মনে রাখা দরকার। ক্রবাদুররা কথা ও সুর দুই-ই সৃষ্টি করে যে সব গান রচনা করতেন তাদের মধ্যে মহত্তম ছিল রাজকীয় প্রেমসঙ্গীত বা canso d'amor। আরবীয় গজলের প্রভাবে উদ্ভূত এই ক্যান্সো ভাবের মামুলি ছকে, অলঙ্করণ-পদ্ধতিতে, বিষয়ের ক্রমান্বিত বিন্যাসে কালক্রমে নিয়মানুগত বিস্তৃতি লাভ করে—কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য নিয়ে তার একাধিক রূপভেদও দেখা দেয়।[৪]

ভাব ও রূপের এই সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে প্রভেঁসাল সাহিত্য তথা ক্রবাদুর গান খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে আপন ঐতিহ্য বহন করে চলতে থাকে। তার সবচেয়ে উজ্জ্বল কাল হচ্ছে খৃষ্টীয় দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দী। এই সময়ে প্রভেঁসাল সাহিত্যের ভাষা—langue d'oc—ইতালী ও স্পেনে লোকভাষা ও কাব্যভাষা রূপে প্রতিষ্ঠা পাওয়ায় প্রভেঁসাল গীতিকবিতাও আন্তর্জাতিক গুরুত্ব অর্জন করে। আর তারই ফল হিসেবে দেখা যায়, সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের (১১৯০-১২৫০) রাজত্বকালে সিসিলীয় কবিগোষ্ঠীর কাব্যপ্রচেষ্টায় প্রভেঁসাল প্রেমসঙ্গীতের মর্মবাণী ও রূপ-রীতি এসে মিলেছে। বস্তুত: ফ্রেডারিক ও তাঁর পুত্র ম্যান্‌ফ্রেড কাব্য-সাহিত্যের এতটা অনুরাগী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন যে, প্রভেঁসের ক্রবাদুররা তাঁদের রাজসভায় এসে কবিতা শোনাতেন, কখনও কখনও দূত মারফৎ কবিতা পাঠাতেন। এইভাবে ক্রবাদুর প্রেমসঙ্গীতের সংস্পর্শে আসার ফলে এবং তারই কোনো এক ধরনের রূপবন্ধ বা স্তবকবন্ধকে ভিত্তি করে কোনো কোনো সিসিলীয় কবি সনেটের সূচনা করেন। ইতালীয় সনেটের অন্যতম প্রধান উপকরণ যে সংবৃত চতুষ্কযুগল, তা প্রথম ব্যবহার করেন এঁদেরই অন্তর্ভুক্ত একজন কবি ইয়াকোপা দা লেন্তিনো (c. 1233)। এই প্রসঙ্গে বিবৃত চতুষ্কযুগলের আবিষ্কর্তা হিসেবে আর একজন সিসিলীয় কবি গুইত্তোনের (Guittone of Arezzo, d. 1294) নামও উল্লিখিত হয়ে থাকে। কারো কারো মতে,

৩. 'The Provencal lyric, despite its later refinements, remained at heart, sensuous and erotic. Religious concepts appeared, but their function was to give added piquancy to physical desire…'—J. W. Lever, The Elizabethan Love Sonnet (1956), P. 2.

৪. দ্র: Cassell's Encyclopaedia of Literature, P. 560.

ফ্রেডারিকের বন্ধু ও প্রধানমন্ত্রী পিয়ারো ভিনে (Piero delle Vigne, d. 1249) সনেটের প্রথম প্রবর্তক।[৫] সে যাই হোক, এটা স্পষ্ট যে কিছু কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর সিসিলীয় কবিগোষ্ঠীর হাতে সনেটের গোড়াপত্তন ঘটে এবং রসেটি অনূদিত ইয়াকোপা লেন্তিনোর সনেট[৬] পড়ে মনে হয়, সিসিলীয় সনেট শক্তিমান কবিদের হাতে রূপ ও ভাবের দিক থেকে কিছুটা উন্নতিও লাভ করে।

সিসিলীয় কবিদের সঙ্গে নিয়ে ফ্রেডারিক যখন ইতালী পরিভ্রমণ করেছিলেন, তখন লোম্বার্দি, তাস্‌কানি প্রমুখ বিভিন্ন স্থানে সিসিলীয় কাব্য ও তার মারফৎ প্রভেঁসাল সাহিত্যের প্রভাব বিস্তৃত হয়। তারপর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হোহেনস্টাউফেন শক্তির পতনের পর উত্তর ইতালীর তাস্‌কানি, ফ্লোরেন্স, বলোঞার মত নগর-রাজ্যগুলি সভ্যতা, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের কেন্দ্রস্থল হওয়ার ফলে সেই প্রভাব আরও বিস্তৃত ও গভীর হয়। সিসিলীয় কাব্য প্রচুর পরিমাণে তাস্‌কানে অনূদিত হয়ে এক বিশেষ ফ্লোরেন্তাইন কবিসমাজ সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এই সময়ে প্রভেঁসের ত্রুবাদুররা ধর্মযুদ্ধে উৎখাত হয়ে ইতালীতে আশ্রয় নেয় এবং নিজেদের কাব্যাদর্শ ও নারীস্তুতির আদর্শে কবি ও লোকসমাজকে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াস পায়। আর এরই পরিণতিতে দেখা যায়, আদিপর্বের কোনো কোনো তাস্‌কান কবি ত্রুবাদুরদের অনুকরণে তাদেরই ভাষায় কাব্যচর্চা করেছেন।[৭] তবে ফ্লোরেন্সের মতো নগররাজ্যগুলির[৮]

৫. 'His (Frederick's) prime minister Piero delle Vigne, composed excellent sonnets and may have invented that arduous form.'—Will Durant, The story of Civilization (1950), Part IV, P. 1056.

৬. দ্র: The Early Italian Poets (1959), D. G. Rossetti, Oxford University Press.

৭. 'Some early Tuscan poets carried their imitation of the French troubadours so far as to in Provencal. Sordello (c. 1200-70)···offended the Ezzelino, fled to Provence, and wrote, in Provencal poems of ethereal and fleshless love.'—'The story of Civilization, Part IV, P. 1057.

৮. 'The fragmentation of Italy favoured the Renaissance.··· it generated a noble rivalry of the cities and princes in cultural patronage, in the zeal to excel in architecture, sculpture, painting, education, scholarship, poetry.'—Ibid, Part V, P. 46.

আত্মপ্রত্যয়ব্যঞ্জক, ব্যক্তিস্বাধীনতাধর্মী ও নবভাবোদ্দীপ্ত পরিবেশে এবং বহু মনীষীর আবির্ভাবে[৯] প্রভেঁসাল ও সিসিলীয় জীবনধ্যান ও প্রেমচিন্তা অনেক পরিমাণে উন্নত হয়ে ওঠে। তখন তাস্‌কান কবিদের চোখে নারী পুরোপুরি আদর্শায়িত হয়ে বিশুদ্ধ সৌন্দর্য ও প্রেমের মূর্ত প্রতীক হয়ে পড়ে। নারীকে জীবনের ধ্রুবতারা করে তাকে পাওয়ার জন্য কবির অন্তরের আকূতিও অনুরণিত হতে থাকে। প্রেম হয়ে ওঠে ইন্দ্রিয়াতীত ও রক্তমাংসের রসস্পর্শহীন। শুধু তাই নয়, সেই ইন্দ্রিয়াতীত বিশুদ্ধ প্রেমের আবেগ প্রকাশের জন্য কবিরা গড়ে তোলেন একটা মধুর নবীন কাব্যরীতি—dolce stil nuovo।[১০] এর ফলে যে উদ্দীপিত কবিসমাজ আত্মপ্রকাশ করে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন বলোঞ্ঞার গুইদো গুইনিচেল্লি (Guido Guinicelli of Bologna—1230 ?-75)। তিনি প্রেমের সঙ্গে দার্শনিকতার সঙ্গম ঘটান, প্রেমকে ঈশ্বরত্বের প্রমূর্ত স্বরূপ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। এজরা পাউণ্ডের মতে, গুইনিচেল্লিই প্রথম লক্ষ্য করেন যে, এক রকমের কান্‌ৎসোনে স্তবক স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং স্বতন্ত্রভাবে রচিত সেই কান্‌ৎসোনে স্তবকই কালক্রমে সনেট আখ্যা পেয়েছে।[১১] পাউণ্ডের এই উক্তি পুরোপুরি ঐতিহাসিক সত্য না হলেও ইতালীয় সনেটের ইতিহাসে গুইনিচেল্লির যে একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তারপর দান্তের বন্ধু গুইদো কাভালকান্তির (Guido Cavalcanti—c. 1258-1300) নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রাজনীতির সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত থাকলেও এবং স্বাধীন চিন্তার অধিকারী হলেও তিনি এমন এক মনীষা ও অভিজাত মনের ঐশ্বর্য লাভ করেছিলেন যা সনেটের ক্লাসিক রূপাবয়বের সঙ্গে ভালভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। তিনি

৯. 'In Florence had been produced such glorious human beings as the world has rarely seen. The whole population formed an aristocracy of genius.'—Symonds : quoted by Myers, Medieval History, P. 333.

১০. দ্রঃ The Story of Civilization, Part IV, P. 1057.

১১. 'So far as I can discern he was the first writer to discover that a certain form of *canzone stanza* is complete in itself. This form of stanza, standing alone, we now call the sonnet.'—Ezra Pound, The Spirit of Romance, P. 103.

সনেটের আত্মা ও রূপ প্রতিষ্ঠায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন, তা ইংরেজীতে অনূদিত তাঁর নিম্নলিখিত সনেটটি পড়লে বোঝা যায়—

Beauty in woman ; the high will's decree ;
Fair knighthood armed for manly exercise ;
The pleasant song of birds ; love's soft replies ;
The strength of rapid ships upon the sea ;
The serene air when light begins to be ;
The white snow, without wind that falls and lies ;
Fields of all flower ; the place where waters rise ;
Silver and gold ; azure in jewellery :—
Weighed against these the sweet and quiet worth
Which my dear lady cherishes at heart
Might seem a little matter to be shown ;
Being truly. over these, as much apart
As the whole heaven is greater than this earth.
All good to kindred natures cleaveth soon.

—Translated by D. G. Rossetti.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ত্রুবাদুর প্রেম-সঙ্গীতের মধ্যে কালক্রমে যে প্রথাগত শীতলতা বা কৃত্রিমতা দেখা দিয়েছিল, তাস্‌কান বা ফ্লোরেন্তাইন কবিকুলের সারস্বত সাধনার মধ্য দিয়ে তা ভাবে ও রূপে নূতন উদ্দীপনা ও অগ্রগতি লাভ করে। সেই উজ্জীবিত সাহিত্যের উজ্জলতম (মধ্যযুগীয়) আলোকস্তম্ভ হচ্ছেন দান্তে। বস্তুতঃই কবি-মনীষী (১২৬৫-১৩২১) দান্তের সাহিত্য-সাধনায় তাঁর যুগ ভাষা পেয়েছে।[১২] একজন ফ্লোরেন্তাইন হিসেবে তিনি একদিকে যেমন প্রভেঁসাল আদর্শ-প্রভাবিত সিসিলীয় ঐতিহ্যের, তেমনি কিছু পূর্ববর্তী দার্শনিক ঐতিহ্যের (গুইনিচেল্লির অনুশীলিত) উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন।[১৩] অন্য দিকে তিনি অন্তর্জীবনে পেয়েছিলেন সিমোনে-দে বার্দির সুন্দরী স্ত্রী বিয়েত্রিচের প্রতি

১২. 'He (Spencer) summed up his age as no man had ever summed up any age since Dante'—Will Durant, The story of Philosophy (1953), P. 300.

১৩. On october 20, 1828, Goethe said to Eckermann: 'Dante appears great to us, but he had a culture of centuries behind him."—Quoted in E. R. Curtius' European Literature and the Latin Middle Ages (1952), P. 378.

অসামান্য ভালবাসার ঐশ্বর্য। দান্তে প্রেয়সীকে কখনও কাছে পান নি, দূর থেকেই তিনি তাঁকে সসম্ভ্রমে প্রেম নিবেদন করেছেন। আর এই বিয়েত্রিচের প্রতি অনুপম প্রেম থেকেই উৎসারিত হয়েছে তাঁর প্রথম কাব্য ভিতা নুয়োভা (Vita Nuova) ও শ্রেষ্ঠকাব্য দিভিনা কোম্মেদিয়া (Divina Commedia)।

বাস্তব জগতে এক আশ্চর্য নারীকে দেখে দান্তের মনে যে অনুরাগের অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা হয়েছিল গদ্যপদ্যময় চম্পূ ভিতা নুয়োভায় তার স্বতঃস্ফূর্ত ও চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে। কবির তখন বয়স অল্প—দৃষ্টি রঙীন, অনুভূতি সজীব, চিত্ত সংবেদনশীল (১২৮৩ থেকে ১২৯২ সালের মধ্যে অর্থাৎ কবির আঠারো থেকে সাতাশ বৎসর বয়সের মধ্যে ভিতা নুয়োভার কবিতাগুলি রচিত)।[১৪] বিয়েত্রিচের প্রথম দর্শন লাভের বিবরণ দিতে গিয়ে ভিতা নুয়োভার গদ্য-টীকায় দান্তে নিজেই বলেছেন—'At the moment, I say most truly that the spirit of life, which hath its dwelling in the secretest chamber of the heart, began to tremble so violently that the least pulses of my body shook therewith; and in trembling it said these words: Here is a deity stronger than I; who, coming shall rule over me.'[১৫] কবির উদ্বেলিত হৃদয়ের এই প্রেমোচ্ছ্বাস নিয়ে কাব্যটির সনেটগুলি রচিত। তারই ফলে সনেটগুলির মধ্যে ভাবাবেগের প্রাচুর্য এবং কল্পনার লীলা-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়।[১৬] রূপ ও রীতির দিক থেকেও সিসিলীয় কবিকুল এবং গুইনিচেল্লির মতো

১৪. 'At intervals in the next nine years (1283-92) he composed the sonnets, and later added the prose. He sent one sonnet after another to Cavalcanti, who preserved them and now became his friend.'—The Story of Civilization, Part IV, P. 1059,

১৫. দ্রঃ The Early Italian Poets, Part II, Dante and his circle-এর অন্তর্গত ও রসেটি-অনূদিত The New Life (La Vita Nuova), Oxford University Press.

১৬. এখানে রসেটির উক্তি স্মরণীয়—'it is true that Vita Nuova is a book which only youth could have produced, and which must chiefly remain sacred to the young; to each of whom the figure of Beatrice, less lifelike than lovelike, will seem the friend of his own heart.'—Ibid, Introduction to Part II.

ইতালীয় কবিদের সনেট থেকে দান্তের সনেট অনেক উন্নত হয়েছে ; যা পূর্ববর্তী কবিদের কাব্যপ্রচেষ্টায় অনেকটাই স্তবক ও মিল রচনার একটা পদ্ধতি মাত্র ছিল, তা প্রবল আবেগ ও সৃজনক্ষম কল্পনার স্পর্শে সনেট নামক স্বয়ংসম্পূর্ণ কবিতা হয়ে উঠেছে। স্থানবিশেষে গুইনিচেল্লির প্রভাবে তাঁর প্রেমানুভবের মধ্যে দার্শনিকতা এসেছে, প্রেম হয়ে উঠেছে যিশুর প্রতীক,—তবু তাতে প্রেমের সৌন্দর্য ও মাধুর্য কম-বেশী অক্ষুন্ন আছে।

My lady looks so gentle and so pure
When yielding salutation by the way,
That the tongue trembles and has nought to say,
And the eyes which fain would see, may not endure.
And still, amid the praise she hears secure,
She walks with humbleness for her array ;
Seeming a creature sent from Heaven to stay
On earth, and show a miracle made sure.
She is so pleasant in the eyes of men
That through the sight the inmost heart doth gain
A sweetness which needs proof to know it by :
And from between her lips there seems to move
A soothing essence that is full of love,
Saying for ever to the spirit, 'Sigh !'

—Translated by D. G Rossetti.

কিন্তু এই আপেক্ষিক উৎকর্ষ সত্ত্বেও দান্তের সনেট ভাব-কল্পনা ও রূপবন্ধের সুন্দর সামঞ্জস্যে পরিপূর্ণভাবে শিল্পসম্মত আকার লাভ করতে পারে নি। যদি ভিতা নুয়োভার সনেটগুলির মধ্যে কবির মনোভাবের অত্যুত্তম প্রকাশ ঘটত, তবে সনেটগুলি লিখেই তিনি তৃপ্ত থাকতেন, গদ্যে সেই প্রেমকবিতাগুলির তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে অগ্রসর হতেন না। শুধু তাই নয়, ভিতা নুয়োভা লেখার পরে কবির মনে হয়েছে, কাব্যটি তাঁর প্রেয়সীর যোগ্যতম স্তব-গীতি হয়ে ওঠে নি।[১৭] তাই তিনি মর্ত্যপ্রেমের ঈশ্বরমুখী দিব্যযাত্রা[১৮] নিয়ে পরবর্তী কালে

১৭. 'Vita Nuova'-র একেবারে শেষে দান্তের গদ্যটীকায় আছে—'After writing this sonnet ('Beyond the sphere which spreads to widest space'.), it was given unto me to behold a very wonderful vision : wherein I saw things which determined me

'দিভিনা কোম্মেদিয়া' নামক মহাকাব্যটি তের্ৎজা রিমা ছন্দে লিখেছিলেন। এ থেকেই বোঝা যায়, আপন অন্তরের উদ্বর্তিত মহিমান্বিত প্রেম ও যুগ-প্রবৃত্তিকে শেষ পর্যন্ত সনেটের পত্রপুটে ধরে রাখা দান্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। কবির বিকাশমুখী প্রেমাবেগের পক্ষে সনেটের রূপবন্ধের এই অযোগ্যতা যেখানে কবি নিজেই উপলব্ধি করেছেন, সেখানে তাঁর সনেটের শিল্পগত সিদ্ধি পুরোপুরি ঘটতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, প্রভেঁসাল সাহিত্য তথা ক্রবাদুর প্রেমসঙ্গীতের যে ঐতিহ্য দান্তের যুগে এসে পৌঁচেছিল, তার মধ্যেও একটা দ্বিধা ছিল। ক্রবাদুরদের প্রেমসঙ্গীত ছিল অংশতঃ সম্ভোগভিত্তিক, অংশতঃ ইন্দ্রিয়াতীত ভাবনামূলক।[১৯] ক্রবাদুর ঐতিহ্যে লালিত দান্তের মন সেই দ্বিধাবিভক্ত প্রেমের দায় থেকে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করে নি। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনে যে প্রেম তিনি আস্বাদন করেছিলেন, তার মধ্যেও ছিল স্ব-বিরোধ।[২০] সম্ভোগের মধ্যে দূরে থাকুক, উত্তপ্ত সান্নিধ্যের মধ্যে না-পাওয়া নারীকে নিয়ে কবির মনের যে অনন্ত আকূতি, তা যেন কোনো স্থির আলোকবিন্দুর মতো সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ

that I would say nothing further of this most blessed one, until such time as I could discourse more worthily concerning her··· it is my hope that I shall yet write concerning her what hath not before been written of any woman.'—Ibid.

১৮. 'To choose as guide in a poetic vision of the other world a loved woman who has been thus exalted is still within the bounds of Christian philosophy and faith. But Dante goes much further than this. He gives Beatrice a place in the objective process of salvation.'—E. R. Curtius, European Literature and the Latin Middle Ages, P. 372-73.

১৯. এ-সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। দ্রঃ Charles S. Singleton, An Essay on Vita Nuova.

২০. এই স্ব-বিরোধের চমৎকার উদাহরণ আছে 'I felt a spirit of love begin to stir' শীর্ষক সনেট ও তার গদ্য-ব্যাখ্যার মধ্যে। মূল কবিতায় অগ্রবর্তিনী জোয়ান ও পশ্চাদ্‌বর্তিনী বিয়েত্রিচেকে বলা হয়েছিল 'spring' ও 'love'; কিন্তু গদ্য-ব্যাখ্যায় জোয়ানকে সেণ্ট জন ও বিয়েত্রিচেকে যিশু ভেবে বলা হয়েছে—'Joan is taken from that John who went before the true light.'

করতে পারে নি। আর তাই ভিতা নুয়োভায় একদিকে দেখা যায়—নারীর প্রতি কবির লৌকিক অনুরাগ, বিরাগ ও বিরহের নানা ছন্দ, অন্যদিকে দেখা যায়—তত্ত্ব-দর্শনের আশ্রয় নিয়ে সেই প্রেমকে ঈশ্বরীয় করার ঐকান্তিক প্রয়াস। দান্তের প্রেম-চিন্তায় এই বিরোধ বা সামঞ্জস্যের অভাবই তাঁর সনেট-চর্চায় পরিপূর্ণ সিদ্ধি লাভ না করার দ্বিতীয় কারণ।

ভিতা নুয়োভার সনেটগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে সর্বত্র ভাবগত সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় নি। দান্তে গদ্যব্যাখ্যায় নিজেই প্রত্যেকটি সনেটের বিভিন্ন অংশের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। যেমন 'The thoughts are broken in my memory' শীর্ষক সনেটটির কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন—'This sonnet is divided into two parts. In the first, I tell the cause why I abstain not from coming to this lady. In the second, I tell what befalls me through coming to her; and this part begins here, "When thou art near." And also this second part divides into five distinct statements.' তিনি কবিতাগুলির ভাব স্পষ্ট করার জন্য এই যে বিশ্লেষণমূলক পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা কোনো কোনো স্থলে অনাবশ্যক বলে মনে হলেও কবিতাগুলির ভাবগত ঐক্য বিচারে সাহায্য করে। সে বিচারে দেখা যায়, স্থান বিশেষে কবির ভাবধারা সত্যিই সুসমঞ্জস রস-পরিণতি লাভ করে নি। যেমন 'My lady carries love within her eyes' শীর্ষক কবিতাটির প্রথম সাত পংক্তিতে কবি প্রেয়সীর চোখ বা দৃষ্টির মধ্য দিয়ে প্রেমের মহৎ প্রকাশের বিবরণ দিয়েছেন, শেষের ছয় পংক্তিতে দিয়েছেন তার হাসি ও ভাষণের মধুর মহিমার বিবরণ; এই দুই অংশের মধ্যে এক পংক্তির যে তৃতীয় অংশ আছে ('O women, help to praise her in somewise') তা যেন প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, সনেটের অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ এবং তাদের মধ্যবর্তী আবর্তন-সন্ধির দিকে তিনি সর্বত্র লক্ষ্য রাখেন নি। উপরের উদাহরণের প্রক্ষিপ্ত চরণটির জন্য অষ্টকের ভাবগত ও রূপগত ঐক্য ক্ষুণ্ণ হয়েছে, সন্দেহ নেই। তৃতীয়তঃ, ইতালীয় সনেটের দ্বিধাবিভক্ত রূপটিতে প্রথমে অষ্টক ও পরে ষট্‌ক সন্নিবেশের রীতি তিনি অনুসরণ করেন নি। 'All ye that pass along loves trodden way' শীর্ষক সনেটটি সম্পর্কে অনুবাদক রসেটির মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে—'It will be observed that this poem is not

what we now call a sonnet. Its structure, however, is analogous to that of the sonnet, being two sextetts followed by two quatrains, instead of two quatrains followed by two triplets. Dante applies the term sonnet to both these forms of composition and to no other.' দুটি ষট্‌ক দিয়ে সনেট আরম্ভ করার এই রীতি নিশ্চয়ই খাঁটি ইতালীয় রীতির মর্যাদা পেতে পারে না।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, দান্তের হাতে সনেটের উন্নতি ঘটলেও তার চরম উৎকর্ষ ও পরিণতি ঘটে নি।

দান্তের এক পুরুষ পরে আবির্ভূত হন ইতালীয় রেনেসাঁসের কবি-পুরোহিত ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা (Francesco Petrarca—1304-1374)। তিনিই সনেটকে বিশিষ্ট, পূর্ণাঙ্গ ও পরিণততম রূপ দিয়ে সাহিত্যের জগতে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দেন। ফলে ইতালীয় সনেটের সঙ্গে পেত্রার্কার নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়ে এবং সনেট ও পেত্রার্কা শব্দ দুটি পরস্পর-সাপেক্ষ হয়ে ওঠে। আজ তাই ইতালীয় সনেট পেত্রার্কীয় সনেট নামে সর্বত্র পরিচিত।

পেত্রার্কার পিতা ছিলেন ফ্লোরেন্সের ব্যবহারজীবী। ফ্লোরেন্সের আভ্যন্তরীণ গোলযোগের দিনে শ্বেতদলভুক্ত হওয়ায় কৃষ্ণদল দলিল জাল করার অভিযোগ এনে তাঁকে ফ্লোরেন্স থেকে নির্বাসিত করে। তিনি তখন কিছুদিনের জন্য আরেজোতে আসেন। সেখানে ১৩০৪ সালে পেত্রার্কার জন্ম হয়। আরেজো থেকে পেত্রার্কারা প্রথমে আশ্রয় নেন পিসায়, সেখান থেকে প্রভেঁসের অন্তর্গত এভিগ্ননে ও কার্পেন্ত্রাসে। বড় হয়ে ফ্রান্সিস্কো পেত্রার্কা আইন পড়তে গুইনিচেল্লির জন্মস্থান বলোঞাতে তিন বছর ছিলেন। বলোঞা সহরের বিশ্ববিদ্যালয়টির পরিবেশ ছিল জ্ঞানার্জন ও স্বাধীন চিন্তার অনুকূল—তাই সহরটি পেত্রার্কার ভাল লেগেছিল। এখানে তিনি আইন পড়তে গিয়ে যখন রোমান এন্টিকুইটির সন্ধান পান, তখন প্রাচীন বিদ্যা ও দর্শনের এক নূতন জগৎ তাঁর সামনে খুলে যায়। তাই পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি ক্লাসিক্যাল কাব্য ও রোমান্টিক প্রণয়-শিল্প অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করেন। পেত্রার্কার জীবনেতিহাসের এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যাবে যে, তিনি একদিকে যেমন পৈতৃক সূত্রে ফ্লোরেন্সীয় মানসিক ঋদ্ধির উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি এভিগ্ননের মতো নগর-রাজ্যের সাংস্কৃতিক সম্পদ লাভ

করেছিলেন। মনে রাখতে হবে, এভিগ্ননের পরিবেশে প্রভেঁসের বিলীয়মান মধ্যযুগীয় সংস্কৃতির সঙ্গে এসে মিলেছিল ইতালীয় হিউম্যানিজমের নবজাগ্রত ভাবধারা।[২১] ফলে পেত্রার্কা হতে পেরেছিলেন পূর্ববর্তী ও সমকালীন, পুরাতন ও নূতন সমস্ত ভাবধারার সাগর-সঙ্গম। তিনি একদিকে যেমন ছিলেন 'affected by the heritage of the Latin Middle ages',[২২] অন্যদিকে তেমনি ছিলেন 'the first modern man' এবং 'the Father of the Renaissance.'[২৩]

ক্যাথলিক খৃষ্টধর্মে অবিশ্বাসী না হলেও প্রাচীন বিদ্যার নিরবচ্ছিন্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তিনি একটা মানসিক খোলা হাওয়ার অধিকারী হতে পেরেছিলেন। তাঁর পরিশীলিত মন বিচারহীন বিশ্বাসকে প্রশ্রয় দেয় নি, অপ্রাকৃতে আস্থা প্রকাশ করে নি। ঐহিকতাবোধ ও মানবতন্ত্রী প্রত্যয় নিয়ে মর্ত্য ও মানুষের জয়গান করে গিয়েছেন তিনি। তাঁর প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, সুখদুঃখবোধ, প্রেমপ্রীতি, কর্মকাণ্ড সবই এক ভৌম চেতনা ও ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এদিক থেকে দান্তের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য অনেক।

এমনিতর মানুষ যে পেত্রার্কা, তিনি তাঁর জীবনে পেয়েছিলেন এক অনুপম প্রেমের ঐশ্বর্য। ১৩১২ খৃষ্টাব্দের গুড ফ্রাইডের দিনে এভিগ্ননের সাণ্টা ক্লারা গীর্জায় তিনি প্রেয়সী লরাকে প্রথম দেখতে পান। পেত্রার্কা সেই মানসীকে নিয়ে তাঁর অন্তরের আবেগ ও কামনা নিঃশেষে উজাড় করে দিয়েছেন, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দিয়েছেন, অথচ তার সত্যিকারের পরিচয় কোথায়ও লিপিবদ্ধ করে যান নি। লরাকে নিয়ে পেত্রার্কার মন যখন আবেগাত্মক ও কল্পনামুখর, তখন লরার কাছ থেকে কোনো সাড়া এসেছিল বলে মনে হয় না। কিন্তু এই সাড়ার অভাব কবির মনকে দমিয়ে দিতে পারে নি, বরং এক অবিনশ্বর ও অপ্রাপণীয় প্রেমের বৃত্তে তাকে চিরদিনের জন্য বন্দী করে ফেলেছিল। আর তারই ফলে এই মর্ত্য-নারীর জন্য কবির আন্তরিকতার অভাব দেখা যায় নি; তিনি তাকে মনে প্রাণে অনুভব করেছেন, তাকে নিয়ে চিন্তা করেছেন এবং সর্বোপরি তাঁর জীবনে এই প্রেমের অনতিক্রমণীয় প্রভাবের কথা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে এই

২১. দ্রঃ J. W. Lever, The Elizabethan Love Sonnet (1956) P. 3.

২২. E. R. Curtius-এর পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৭।

২৩. Will Durant, The History of civilization, Part V, P. 5 & 47.

প্রসঙ্গে এটাও স্বীকার করতে হবে যে, লরাকে তিনি ইন্দ্রিয়াতীত প্রেমের রক্ত-মাংসহীন রূপকল্প হিসেবে দেখেন নি, তিনি তাকে দেখেছেন অপার্থিব গুণের অধিকারিণী এক সজীব মর্ত্য-প্রতিমা রূপে। আর পরিদৃশ্যমান বস্তুজগতের অঙ্গরূপে লরাকে দেখার ফলে পেত্রার্কীয় প্রেম দান্তের পন্থা অনুসরণ করে দিব্যযাত্রায় কখনও উৎসাহ বোধ করে নি।

রেনেসাঁসের জনক ও প্রবক্তা পেত্রার্কার ক্লাসিকস্-ভক্ত মুক্ত চেতনা ও লরা-কেন্দ্রিক মর্ত্যপ্রেম তাঁর মানসমণ্ডলে এক আশ্চর্য ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য নিয়ে দেখা দিয়েছিল। তাস্‌কান কবিকুল, এমন কি তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যিনি সেই দান্তে যে ভাবগত স্ব-বিরোধের জন্য মানসিক ভারসাম্য লাভ করতে পারেন নি, পেত্রার্কার পরিশীলিত মন তারই মধ্যে স্বাভাবিক সঙ্গতি স্থাপন করতে পেরেছিল। সেই ভাবগত সঙ্গতি সাধনে কবির জীবনবোধ ও অভিজ্ঞতা, মুক্ত বুদ্ধি ও ভৌম চেতনা যে খুবই কাজে লেগেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পেত্রার্কার এই সুসমঞ্জস ও উজ্জ্বল মানসধর্মের সুমিত প্রকাশের পক্ষে ত্রুবাদুরদের প্রথাবদ্ধ পদ্ধকলা, এমন কি তাস্‌কান কবিদের নির্বস্তুক ও নিরাকার প্রেমপ্রকাশক্ষম নবকাব্যরীতিও (dolce stil nuovo) ঠিক উপযুক্ত ছিল না। আর সেই কারণে পেত্রার্কা তাঁর মনোভাবের বাহনরূপে গীতিকবিতার সনেট নামক বিশিষ্ট প্রজাতিটিকে বেছে নিয়েছিলেন। স্বীকার করতেই হবে, সনেটের কাব্যরূপের মধ্যে কবির সুশৃঙ্খল মনোভাব যথার্থভাবে সাকার হয়ে উঠেছে।

In what bright realm, what sphere of radiant thought
 Did nature find the model whence she drew
 That delicate dazzling image where we view.
Here on this earth what she in heaven wrought ?
What fountain-haunting nymph, what dryad sought
 In groves, such golden tresses ever threw
 Upon the gust ? What heart such virtues knew ?—
Though her chief virtue with my death is fraught.
He looks in vain for heavenly beauty, he
 Who never looked upon her perfect eyes,
The vivid blue orbs burning brilliantly—
 He does hot know how love yields and denies ;
He only knows who knows how sweetly she
 Can talk and laugh, the sweetness of her sighs.

—Translated by J. Auslander.

এই ধরনের পেত্রার্কীয় সনেট বিচার করলে দেখা যায়, তিনি পূর্বসূরী ক্রবাদুর ও তাস্কান কবিদের কাব্য-ঐতিহ্য স্বীকার করে নিয়ে তাকে অতিক্রম করে গিয়েছেন। একদিকে প্রেম-বন্দনা ও নারী-স্তুতির ক্রবাদুর ফ্যাসান, অন্যদিকে তাস্কান কবিদের উদ্দীপিত প্রেমপূজার আদর্শ তিনি আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, ক্রবাদুরদের ক্যান্‌সোর রূপ ও রীতির সঙ্গে যেমন তাঁর পরিচয় ছিল, তেমনি সিসিলীয় ও তাস্কান কবিদের কান্‌ৎসোনে ও সনেটের শিল্পরীতির সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। কিন্তু অনেক দিনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে পূর্বসূরীদের হাতে সনেট যতটুকু পরিমাণে আকারিত হয়ে উঠেছিল তাতে পেত্রার্কা সন্তুষ্ট থাকতে পারেন নি। তিনি তার মধ্যে অবশ্যই দেখেছিলেন অবয়ব-সংস্থানের ত্রুটি, অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপের মধ্যে পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য ও ভারসাম্যের অভাব। তাই কবি তাঁর মার্জিত ও সংহত মানসাধিকারকে সনেটের ক্ষেত্রে এমন সুমিতভাবে প্রয়োগ করলেন যাতে এই বিশেষ শিল্পকৃতি সুসঙ্গত রূপ লাভ করতে পারে। আর তারই ফলে পেত্রার্কার কাব্য-সাধনায় ইতালীয় সনেট ভাব ও রূপের দিক থেকে পরিণততম আকার নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে।

পেত্রার্কীয় সনেটের সাংগঠনিক কৌশলের মধ্যে তার শিল্পোৎকর্ষের যাদু নিহিত। এর চোদ্দ চরণের সীমায়িত পরিসরের মধ্যে দুটো সুস্পষ্ট ভাগ থাকে—প্রথম ভাগকে বলা হয় অষ্টক (octave), দ্বিতীয় ভাগকে ষট্‌ক (sestet)। এই বিভাজন যেমন ভাবের দিক থেকে ঘটে থাকে, তেমনি ঘটে থাকে রূপের দিক থেকে। অষ্টকে কবিতার মূল ভাব উপস্থাপিত করা হয়, আর সেই মূল ভাবের সমর্থন বা বিস্তৃতি বা উপসংহার বিবৃত করা হয় ষট্‌কে। সনেটের এই ভাবগত বিভাজন-রীতি তার রূপগত বিন্যাসের মধ্যে প্রতিফলিত হয় বলে অষ্টকের মিলের পদ্ধতির সঙ্গে ষট্‌কের মিলের পদ্ধতির সুস্পষ্ট পার্থক্য থাকে। উত্তম পেত্রার্কীয় সনেটে অষ্টকের অন্তর্গত প্রথম চতুষ্কে যে ভাবের জন্ম হয়, তার মধ্যে একটা প্রগত চলিষ্ণুতা (progressive movement) থাকায় দ্বিতীয় চতুষ্কের ভাবের পর্যায়ে পৌঁছোবার জন্য স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়। কিন্তু দ্বিতীয় চতুষ্কের অন্তে আবর্তন-সন্ধি (break) সেই ভাবগত প্রগতি-প্রবণতাকে পরাগত (backward) করে দ্বিতীয় চতুষ্কের ভাবকে প্রথম চতুষ্কের ভাবের সঙ্গে যুক্ত করে রাখে। রূপের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রথম চতুষ্কের প্রতি দুই চরণের মিলগত যে বিশেষ রীতির (কখ, খক) জন্য ছন্দোগত চলিষ্ণুতা আসে, দ্বিতীয় চতুষ্কে সেই একই রীতির পুনরাবৃত্তি পূর্বতন চতুষ্কের মিল-ধ্বনির

স্মৃতি জাগিয়ে তুলে দুটি চতুষ্কের রূপাবয়বকে পরস্পর-সাপেক্ষ (correlated) করে রাখে। ফলে ভাব ও রূপের দিক থেকে সনেটের অষ্টক এক অখণ্ড ও উজ্জ্বল ইউনিট হিসেবে বিরাজ করে, কবি-সম্বোধির এক সুষম সৃষ্টি রূপে প্রতিভাত হয়। অন্যদিকে অষ্টকের শেষে আবর্তন-সন্ধির পর যে ছয় চরণের ষট্‌ক থাকে, তাতে অষ্টকের ভাবের সমর্থন বা বিস্তৃতি বা উপসংহার দেখানোরও একটা বিশিষ্ট কৌশল লক্ষ্য করা যায়। তাতে কবি দুটি ত্রিকে (tercet) এমন আন্তঃশৃঙ্খলার সাহায্যে ও প্রতিসমভাবে পরস্পর-সাপেক্ষ চিন্তানুভূতিকে উপস্থাপিত করেন যার ফলে একটা সামগ্রিক সৌষম্য পরিস্ফুট হয়। দুটি ত্রিকে ভাব বিপ্রতীপ ভঙ্গিতে নয়, প্রগত ও পরাগত পদ্ধতিতেও নয়—বেশ সরল, সাবলীল ও পরস্পর-সাপেক্ষ ভঙ্গিতে রূপায়িত হয়। ভাবের বিন্যাস-ভঙ্গির সঙ্গে তাল রেখে ছন্দ-মিলের পদ্ধতিতেও দেখা দেয় একটা পরস্পর-সাপেক্ষ বা প্রতিসম ঢঙ। প্রথম ত্রিকের দুটি (বা তিনটি) মিলের ছন্দ-ধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায় দ্বিতীয় ত্রিকের দুটি (বা তিনটি) মিলের মধ্যে। ফলে ষট্‌কের দুটি ত্রিকের মিলের মধ্যে যেমন সমন্বয়ের গুণ দেখা দেয়, তেমনি স্ুঁচের ফোঁড়ের মতো তা দুটি ত্রিকের ভাবকে এক সূত্রে গ্রথিত করে ভাবগত সৌষম্য সৃষ্টিতে সহায়তা করে। আর এই কারণেই একটা বিশিষ্ট ভঙ্গিতে ভাব প্রকাশের পক্ষে পেত্রার্কীয় সনেটের বিশেষ ছন্দোরীতিও অপরিহার্য বলে মনে হয়।

কিন্তু পেত্রার্কীয় সনেটের এই দ্বিধাবিভক্ত দেহডৌলই তার আসল সৌন্দর্য নয়, তার আসল সৌন্দর্য হচ্ছে সেই দ্বিধাবিভক্ত দেহডৌলের মধ্যে পরিণামে একটা অখণ্ড ভঙ্গিমার সুষম সৌন্দর্য পরিস্ফুটন। কবিতার ভাব ও রূপের বিন্যাসের মধ্যে আবর্তন-সন্ধির কৌশল দেখিয়েও কবি এমন একটা এককেন্দ্রিকতার চাবিকাঠি নিজের হাতে রাখতে পারেন যা দুই অংশের অন্তরঙ্গ ভাবে ও বহিরঙ্গ রূপে ভারসাম্য বজায় রেখে সমগ্রভাবে কবিতাটিকে অখণ্ড শিল্পের অবিনশ্বর গৌরব ও সৌন্দর্য দান করতে পারে। তার জন্য পেত্রার্কীয় সনেটের ভাবে ও ভাষায় সম্ভবপর সংযম ও পরিমিতি রক্ষা করা দরকার হয়; তার নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে সামান্যতম অতিরেক বা দুর্বলতা দেখানো চলে না। শুধু তাই নয়, কবি তাঁর সনেটের সুমিত ও সাবলীল প্রকাশ অব্যাহত রাখতে গিয়ে তাকে এমনই কঠিন নিয়ম-বন্ধনে বাঁধেন যে, তার গঠন হয়ে ওঠে প্রস্তর-সন্নিভ দৃঢ়পিনদ্ধ। আর দৃঢ় কাঠামোর মধ্যে বাঁধার ফলে বাইরের দিক থেকে সনেটকে কঠিন-শীতল স্থাপত্য বা ভাস্কর্যকল্প বলে মনে হয়। এই কারণে সমালোচকগণ সনেটের মধ্যে

দেখেছেন ক্লাসিকসুলভ চারিত্র। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বহিরঙ্গে সনেট যতই ভাস্কর্যের মতো এক অচঞ্চল ভঙ্গিমায় স্তম্ভিত বলে মনে হোক না কেন, তার ভেতরে গীতিকাব্যসুলভ এক নিরুদ্ধ আবেগের প্রকাশ ঘটে। পেত্রার্কীয় সনেটে এই আবেগ-কম্পিত ভাব-আত্মাকে নমনীয় বস্তুর মতো কেমন কৌশলে তার শরীরের শক্ত কাঠামোর মধ্যে খাপ খাইয়ে বিকশিত করতে হয়, সেইটে বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তার নিটোল ও দীপ্তিশালী রূপ যেন সেই সুন্দর মূর্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার পাথুরে রূপাবয়বের মধ্যে ভাস্করের আবেগাত্মক সৌন্দর্যস্বপ্ন পুষ্পিত হয়ে আছে।

এই হচ্ছে ইতালীয় বা পেত্রার্কীয় সনেট সম্পর্কে সার কথা। দেখা গেল, এই জাতীয় সনেটই হচ্ছে আদি সনেট। ফলে স্বভাবতঃই এর কৌলীন্য বা মর্যাদা খুবই বেশী। একে ক্লাসিক্যাল সনেটও বলা হয়ে থাকে।

২.

পেত্রার্কার মৃত্যুকালের মধ্যেই ইতালীয় রেনেসাঁসের সর্বাঙ্গীণ ভিত্তি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর কিছু সময়ের ব্যবধানে রেনেসাঁসের ভাবধারা ইতালীর সীমা পেরিয়ে ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, পোর্তুগাল ইত্যাদি পশ্চিম য়ুরোপের দেশগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে এবং তার ফলে ইতালী সেই দেশগুলির পণ্ডিত ও কবিসমাজের তীর্থক্ষেত্র হয়ে ওঠে। রেনেসাঁসের জোয়ার সর্বশেষে এসে পৌঁছোয় ইংল্যাণ্ডে। এইভাবে রেনেসাঁসের স্ফূর্তির ফলে পশ্চিম য়ুরোপের জাতিগুলির মর্মমূলে সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চারিত হওয়ায় তাদের সৃজন-বৃত্তি সক্রিয় হয়ে সাহিত্যের নূতন ফুল ফোটাতে শুরু করে। ইংরেজী সাহিত্যের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, ইংরেজী রেনেসাঁসের আদি ও অন্ত্য পর্বের দুই মূর্তিমান বিগ্রহ চসার ও মিল্টনের মধ্যবর্তীকালে সেখানকার কবিরা ইতালীয় রেনেসাঁসের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে গ্রীক ও ল্যাটিন বিদ্যাচর্চায় ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁরা ইতালী থেকে মহৎ কাব্যের ভাব এবং কাব্যের বিচিত্র রূপ ও রীতি আমদানি করেছিলেন। সেই আহৃত কাব্যবন্ধগুলির অন্যতম হচ্ছে সনেট।

চসারের মৃত্যুর পর খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্য ও সংস্কৃতি-

কর্মীদের সঙ্গে ইতালীর সংযোগ হারিয়ে যাওয়ায় ইংরেজী কাব্যের ক্ষেত্রে একটা পশ্চাদ্মুখিতা দেখা দেয়। সেই সংযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসেন ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজ কবি টমাস ওয়াট (১৫০৩-১৫৪২)। তিনি ইতালীতে গিয়ে সেখানকার কাব্যের মধুর ও মহিমাব্যঞ্জক রসাস্বাদ এবং উপযুক্ত সাহিত্য-শিক্ষা লাভ করেন। বলোঞা, ফ্লোরেন্স ইত্যাদি পরিভ্রমণের সময় তিনি খুব সম্ভবতঃ অ্যাকুইলার (Serafino dell' Aquila) অষ্টম চরণের স্ট্রামবত্তি (Strambotti) এবং পেত্রার্কার কান্‌ৎসোনে ও সনেটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। এই সাহিত্য-শিক্ষার মধ্য দিয়ে তিনি একথা বুঝতে পেরেছিলেন যে, ভিন্ন দেশীয় প্রাচীনেরা নিজেদের ভাষায় যে যে বিষয়ের চর্চা করেছেন, নিজের ভাষার প্রকৃতি অনুযায়ী সেই সব বিষয় অনুশীলন করাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট কাজ। তাই ওয়াটের সাহিত্যকীর্তির আলোচনা-প্রসঙ্গে টিলিয়ার্ড বলেছেন—'If it was patriotic to write well in the English tongue, it was doubly patriotic to write in an Italian or French form, to show that an English poet could compete with the foreigner on his own ground.'[১] আর বোধ হয় এই মনোভাব নিয়েই তিনি ইংরেজী ভাষায় বিভিন্ন কাব্যগোত্র ও ছন্দোরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করেন।

ওয়াট প্রথমে অ্যাকুইলার কয়েকটি স্ট্রামবত্তি[২] ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তারপর তিনি অট্টা রিমা, তের্‌জা রিমা ইত্যাদি সহ সনেটেরও অনুশীলন করেছেন। ওয়াটের যে আটত্রিশটি সনেট পরবর্তীকালের হাতে এসে পৌঁচেছে, তাদের মধ্যে কতকগুলিকে[৩] অনুবাদ বা অনুবাদকল্প কবিতা বলে কেউ কেউ মনে করেন। এই ধরনের সনেটের পেত্রার্কীয় মূল উৎস যেমন নির্দেশ করা যায়, তেমনি দেখানো যায় মিলের পদ্ধতি ও চোদ্দ চরণের পরিসরের দিক থেকে মূলের সঙ্গে তাদের সামঞ্জস্য। তবে এগুলিতেও যে পয়ারপুচ্ছ (final couplet) ও দশাক্ষর চরণ রয়েছে তা অবশ্যই মূলের ব্যতিক্রম। এ থেকে বোঝা যায়,

১. E. M. W. Tillyard, The Poetry of Sir Thomas Wyatt (1929), P. 22.

২. এই ষ্ট্রামবত্তি থেকে সনেটের কাব্যরূপ বিবর্তিত হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।

৩. A. Lytton Sells-এর মতে তেরটি, J. W. Lever-এর মতে উনিশটি।

অনুবাদ বা অনুবাদকল্প সনেটগুলিতে ওয়াট কিছু কিছু স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। শুধু তাই নয়, এই কবিতাগুলির অষ্টকে স্থানবিশেষে চার চরণের পর পেত্রার্কা-নির্দেশিত উপচ্ছেদের (half pause) বদলে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হওয়ায় পেত্রার্কার অষ্টকও ওয়াটের কবিতায় দুটি চতুষ্কের নামান্তর হয়ে দাঁড়িয়েছে। অন্যদিকে দেখা যায়, পয়ারপুচ্ছকে চিহ্নিত বা উজ্জ্বল করবার জন্য তিনি ষট্‌কের মিলের পদ্ধতিকে সরল করে নিয়েছেন এবং তারই ফলে ষট্‌কের প্রথম দিকে চার চরণ নিয়ে তৃতীয় একটি চতুষ্ক আত্মপ্রকাশ করেছে। এই অনুবাদ বা অনুবাদকল্প কবিতাগুলিতে শিক্ষানবিসির পর তিনি যে সব মৌলিক সনেট রচনা করেন, তাতে এই রূপগত নূতনত্ব আরও দৃঢ় হওয়ায় স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ইংরেজী সনেট আকার নিতে থাকে। অধিকন্তু ওয়াটের যে কাব্য-ছন্দ প্রথমে খুবই বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্তিকর ছিল, কবি ক্রমে তাকে অনেকটা নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আনতে সমর্থ হন এবং পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিক ছন্দকে ইংরেজী সনেটের ক্ষেত্রে কম-বেশী প্রতিষ্ঠিত করেন। নিম্নলিখিত সনেটটি পড়লে বেশ বোঝা যায়, ওয়াট ইংরেজী সনেটকে পেত্রার্কীয় আদর্শ থেকে কতটা দূরে সরিয়ে আনতে পেরেছেন।

Mye love toke skorne my servise to retaine
  Wherein me thought she vsid cruetie ;
  Sins with good will I lost my libretye
  To follow her wiche causith all my payne.
Might never care cause me for to refrayne,
  But onlye this wiche is extremytie :
  Gyving me nought, alas, not to agree
  That as I was her man I might remayne.
But sins that thus ye list to order me,
  That wolde have bene your servaunte true and faste,
  Displese the not, my doting dayes bee paste :
And with my losse to leve I must agree ;
  For as there is a certeyne tyme to rage,
  So ys there tyme suche madness to asswage.

এই জাতীয় উদাহরণে (কখখককখখকগঘঘগচচ)[৪] সেক্সপীরীয় সনেটের

৪. 'Such is the course that natures kinde hath wrought' শীর্ষক সনেটে প্রথম তিনটি চতুষ্কে কখকখ মিলের পদ্ধতি দেখা যায়। এতে নিঃসন্দেহে সেক্সপীয়ারের সনেটসুলভ একান্তর রীতির মিলের পূর্ব-সূচনা রয়েছে।

প্রাথমিক আদল নিঃসন্দেহে পাওয়া যায়। এবং সে কারণেই ওয়াটকে সেক্সপীরীয় সনেটের প্রথম আবিষ্কারক বলা যেতে পারে। বস্তুতঃ এই বিদেশী রূপবন্ধের মাধ্যমেই গীতিকবিতার আদর্শ ও ব্যক্তিগত বিষয় ইংরেজী কাব্যে পুনরায় প্রবেশ করে।

আর্ল অব সারে (১৫১৭-৪৭) ওয়াটের চেয়ে বয়ঃকনিষ্ঠ ও তাঁর শিষ্যকল্প হলেও একই টিউডর রেনেসাঁসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তিনি শিক্ষকের কাছ থেকে অল্প বয়সেই ল্যাটিন, ফ্রেঞ্চ, ইতালীয়ান ও স্প্যানিশ শিখেছিলেন। বন্ধু ডিউক অব রিচমণ্ডের সঙ্গে ফ্রান্সে থাকাকালে তিনি ক্লাসিক্যাল ও রেনেসাঁসের সাহিত্যে যেটুকু শিক্ষা পেয়েছিলেন, তা তাঁর কবি-জীবনে ফলপ্রদ হয়েছিল। সারে প্রথমে ওয়াটের মতো পেত্রার্কীয় সনেট নিয়ে শিক্ষানবিসি করেন এবং ওয়াটের পন্থা অনুসরণ করে শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে তাঁকে অনেকটা ছাড়িয়ে যেতেও সমর্থ হন। ওয়াটের সনেটের ছন্দোরীতি ছিল অমসৃণ; শ্বাসাঘাতের পারস্পরিক সম্বন্ধ ছিল অনির্দিষ্ট ও খেয়ালপ্রসূত; কিন্তু সারে সেই ছন্দোরীতিকে মার্জিত ও সরল এবং শ্বাসাঘাতকে নির্দিষ্ট করে নিয়ে স্বরচিত সনেটকে বহিরঙ্গে উন্নত করে তোলেন। শুধু তাই নয়, ওয়াটের অনুশীলনে যে পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিক ছন্দ প্রবর্তিত হলেও পূর্ণ মর্যাদা পায় নি, সনেটের ছন্দ হিসেবে তিনি তাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পূর্বে আমরা দেখেছি, ওয়াট কিভাবে অনুবাদ বা অনুবাদকল্প সনেটে স্থান বিশেষে পেত্রার্কীয় অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগকে বিপর্যস্ত করে কার্যতঃ তিনটি চতুষ্ক ও একটি পয়ারগুচ্ছ সৃষ্টি করেছিলেন। সারে ওয়াটের সেই প্রাথমিক প্রচেষ্টাকে আরও সার্থক রূপ দেন এবং একান্তর মিলের (কখকখ) চতুষ্ক রচনার যে সূত্রপাত ওয়াটের একটি সনেটে ঘটেছিল তাকেই ইংরেজী সনেটের মিলের নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন। সারের 'Alas! so all thinges nowe doe holde their peace' শীর্ষক সনেটটিকে তার পেত্রার্কীয় মূলের সঙ্গে মিলিয়ে বিচার করে লেভার দেখিয়েছেন, পেত্রার্কা যেখানে কখখক মিলের পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন, সেখানে সারে সচেতনভাবেই তাকে কখকখ করে নিয়েছেন। অধিকন্তু কবিতাটির কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ বিবৃতিকে সাধারণ বিবৃতিতে, অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ নির্বিশেষ চিত্রকল্পকে অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ বিশেষ চিত্রকল্পে পরিণত করে এবং মূলের বক্তব্যকে অধিকতর পরিসর যোগানের মধ্য দিয়ে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগকে বিপর্যস্ত করে তিনি কৌশলে ইংরেজী সনেটকে যুক্তি-

নিয়ন্ত্রিত গঠন (form of logical deduction) দান করেছেন। ক্ষেত্র-বিশেষে তিনি পেত্রার্কীয় কল্পনার ওপর স্থানীয় রূপ-রস-রঙ আরোপ করতে দ্বিধা করেন নি। বিষয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, তিনি ইতালীয় রীতি অনুসরণ করে লেডি এলিজাবেথ ফিট্জেরাল্ড নাম্নী রমণীর প্রতি প্রেমকে সনেটের উপজীব্য করলেও এবং সেই প্রেমিকা নারীর প্রতি অনুরাগকে মহিমান্বিত করার প্রয়াস পেলেও[৫] ভিন্নতর বিষয়ের দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর হাতে সনেট অন্য বিষয়াশ্রিত হয়েও সংহত চিন্তা, মহিমান্বিত দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংগঠনিক শক্তির জন্য কতটা মূল্যবান হয়ে উঠতে পারে তার উদাহরণ হচ্ছে এই সনেটটি—

Thassyrian king in peace, with foule desire,
And filthy lustes, that staynd his regall hart,
In war that sould set princely hartes on fire :
Did yeld, vanquished for want of marciall art.
The dint of swordes from kisses seemed strange :
And harder, than his ladies syde, his targe :
From glutton feastes to souldiars fare, a change :
His helmet, farre above a garlands charge.
Who scarce the name of manhode did retayn,
Drenched in slouth and womanish delight,
Feble of spirite, impacient of pain :
When he had lost his honor, and his right :
Proud, time of wealth, in stormes appalled with drede,
Murthered himself to shewe some manful dede.

সারের মৃত্যু ও এলিজাবেথীয় যুগের সূত্রপাতের অন্তবর্তীকালে ইংরেজী কাব্যচর্চা খুব উল্লেখযোগ্যভাবে না ঘটলেও স্বাতন্ত্র্যপূর্ণ ইংরেজী সনেটের সাধনা অপ্রধান কবিদের দ্বারা চলতে থাকে। তারপর সনেটের কবি হিসেবে ফিলিপ সিড্নির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ক্লাসিক্যাল ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অধিকার অর্জন করেছিলেন। ১৫৭৩-৭৪ খৃঃ ইতালী পরিভ্রমণ করার কালে

৫. প্রেমিকার গৌরব বৃদ্ধি করতে গিয়ে সারে বলেছেন—

From Tuscan cam my ladies worthi race ;
Farie Florence was sometime her auncient seate ;

ইতালীয় ভাষায় তিনি বুৎপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর রচিত 'আর্কেডিয়া' নামক গল্প-রোমান্সে যে সব কবিতা ছড়ানো রয়েছে তার মধ্যে উনিশটি হচ্ছে সনেট। এই সনেটগুলিতে পেত্রার্কীয় প্রেমাদর্শ ও প্লেটোনিজমের পরিচয় পাওয়া যায়। পেত্রার্কীয় রীতি অনুযায়ী অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সনেটগুলির অঙ্গ-সংস্থানও করা হয়েছে। তথাপি ছন্দ-মিলের দিক থেকে তাতে ওয়াট ও সারের রীতিই অনুসৃত হয়েছে।[৬] এইভাবে 'আর্কেডিয়ার' সনেটের উপাদানগুলি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি 'অ্যাস্ট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলা' কাব্যগ্রন্থের পরিণত সনেটগুলি রচনা করেন। এই সনেটগুলিতে তিনি নানা রকমের অষ্টক ও ষট্ক রচনা করেন বলে তাদের কাব্যরূপের মধ্যে একটা বৈচিত্র্য এসে গেছে। তিনি স্থানবিশেষে ওয়াটের মতো মিলের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন—কখখক কখখক গঘঘগ চচ। তবে সমগ্রভাবে বিচার করলে কখকখ কখকখ গঘগঘ চচ[৭] পদ্ধতিতেই তাঁর পক্ষপাতিত্ব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু একটা কথা মনে রাখা দরকার। ওয়াটের আমল থেকে পেত্রার্কীয় রীতি থেকে একটু একটু দূরে সরে এসে স্বতন্ত্র ধরনের ইংরেজী সনেট রচনার যে চেষ্টা চলেছিল, সিড্‌নির সনেট-চর্চায় তা অব্যাহত থাকলেও অষ্টক ও ষট্ক বিভাগ স্পষ্টতঃই বজায় আছে। অনেকে যে সিড্‌নির সনেটের মধ্যে দেখেছেন পেত্রার্কীয় আদর্শের বিজয়-বৈজয়ন্তী, এটা তার অন্যতম কারণ।

নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটিতে সিড্‌নির সেক্সপীরীয় রীতির সনেট-চর্চার একটি চমৎকার নিদর্শন পাওয়া যায়—

> Leave me, o love, which reachest but to dust,
> And thou my mind aspire to higher things :
> Grow rich in that which never taketh rust :
> What ever fades, but fading pleasure brings.
> Draw in thy beames, and humble all thy might
> To that sweet yoke, where lasting freedoms be :

৬. 'My true love hath my heart, and I have his' শীর্ষক কবিতায় মিলের পদ্ধতি হচ্ছে কখকখ গঘগঘ পকপক চচ।

৭. 'Sidney produces a characteristically English poem, in which the epigrammatic pull of the final couplet is the dominating factor.'—Martin Seymour-smith, Shakespeare's Sonnets (1963), p. 8.

Which breakes the clowdes and opens forth the light
That doth both shine and give us sight to see.
O take fast hold, let that light be thy guide,
In this small course which birth draws out to death,
And thinke how evill becommeth him to slide,
Who seeketh heav'n, and comes of heavn'ly breath.
Then farewell world, thy uttermost I see,
Eternal love maintaine thy life in me.

১৫৯১ খৃষ্টাব্দে সিড্‌নির 'অ্যাস্ট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলা' প্রকাশের ফলে ইংরেজ কবিদের মধ্যে সনেটের প্রতি অনুরাগ নূতন করে জেগে ওঠে। এডমণ্ড স্পেন্‌সারের রচিত সনেটগুচ্ছে সেই পুনরুজ্জীবিত অনুরাগের উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন কেম্‌ব্রিজের ছাত্র; সেখানে সাত বছরে তিনি ক্লাসিক্যাল বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন। আধুনিক কোবিদসমাজের মধ্যে ক্লেমঁা মারো, দ্যু বেলে, দেপর্তে, ট্যাসো ইত্যাদির কাব্যকলায় তিনি গুণগ্রাহী ছিলেন। কেউ কেউ মনে করেন, দ্যু বেলের রচনার মাধ্যমেই পেত্রার্কার সঙ্গে স্পেন্‌সারের প্রথম পরিচয় ঘটে। তাঁর কাব্য আলোচনা করলে দেখা যায়, পেত্রার্কীয় প্লেটোনিজম্‌ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর ও ঘনিষ্ঠ। তৎসত্ত্বেও তিনি সনেট রচনায় পেত্রার্কীয় রীতি অনুসরণ করেন নি। ১৫৯১ খৃষ্টাব্দে 'The Complaints' নামক কাব্যগ্রন্থে 'Visions of Bellay' ও 'Visions of Petrarch'[৮] শীর্ষক যে দুটি সনেটগুচ্ছ সংযোজিত হয়, তাদের মধ্যে একটি সনেট

৮. 'Visions of Bellay' ও 'Visions of Petrarch' নিঃসন্দেহে প্রাক্‌-স্নাতক যুগে কেম্‌ব্রিজে থাকাকালে স্পেন্‌সার রচনা করেন (১৫৬৯)। কিন্তু পরে (১৫৯১) খৃষ্টাব্দে 'The Complaints'-এর অন্তর্ভুক্ত করার সময় তিনি সংশ্লিষ্ট কবিতাগুলির প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পরিবর্তন করেন; প্রথমোক্ত গ্রন্থটির কবিতাগুলি আগের সংস্করণে ছিল ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লিখিত, কিন্তু কবি সেগুলিকে সেক্সপীরীয় রীতির মিলের দ্বারা সজ্জিত করেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটির চারটি কবিতা আগের সংস্করণে ছিল দ্বাদশ চরণের, কবি সেগুলিকে প্রসারিত করে চোদ্দ চরণের পরিসর দান করেন (মিল অবশ্য আগের সংস্করণেই ছিল)। 'Visions of Petrarch'-এর নব সংস্করণের শেষ সনেটটি নূতন রচনা, পূর্ববর্তী সংস্করণের একটি অন্য জাতীয় কবিতার বদলে কবি এটিকে সংযোজিত করেন।

বাদে অন্য সবগুলিতে সেক্সপীরীয় শিল্পরীতিই অনুসৃত হয়েছে। স্পেন্সার অবশ্য নিজস্ব রীতির সনেটও লিখেছেন, তবে তার কথা সেক্সপীরীয় রীতির সনেটের বিবর্তনের ক্ষেত্রে আলোচ্য নয়।

এইভাবে ওয়াট,- সারে, সিড্‌নি, স্পেন্সার, ড্রেটন প্রভৃতির চর্চার ফলে যে স্বাতন্ত্র্যধর্মী ইংরেজী সনেট গড়ে উঠতে থাকে, তা পরিণততম রূপ লাভ করে সেক্সপীয়ারের সনেটে। সেক্সপীয়ার ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষ দিকে সনেট রচনায় মনোনিবেশ করলেও তাঁর সনেট-সংগ্রহ ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। একথা ঠিক যে, তিনি ইতালীয় সনেটের সঙ্গে সরাসরি পরিচিত ছিলেন না; তবে পেত্রার্কীয় রীতির ইংরাজী সনেটের কথা ভালোভাবেই জানতেন বলে মনে হয়। সবচেয়ে বড়ো কথা, ১৫৯১ থেকে ১৫৯৮ পর্যন্ত সময়টি ছিল ইংরেজী কাব্যের ক্ষেত্রে সনেট রচনার যুগ। তখনকার দিনে সনেট রচনা যে ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তার মূলে ছিল সিড্‌নির 'অ্যাষ্ট্রোফেল অ্যাণ্ড স্টেলার' জনপ্রিয়তা এবং র‍ঁসার, দেপর্তে প্রমুখ ফরাসী সনেটকারদের প্রভাব। সেক্সপীয়ারের সনেট রচনার পেছনে এই যুগগত প্রেরণা যেমন ছিল, তেমনি ছিল তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশের তাড়না। এই প্রতিভাবান্ শিল্পীর জীবনে নিশ্চয়ই প্রেম, নারী, বন্ধুপ্রীতি ইত্যাদি সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার প্রাচুর্য জমে উঠেছিল এবং তার সুষ্ঠু প্রকাশের পক্ষে সনেটের মতো ব্যক্তিগত রূপবন্ধ অত্যন্ত উপযুক্ত ছিল।[৯] শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার দাবি অনুযায়ী তিনি যেমন পেত্রার্কীয় রূপবন্ধ নির্বাচন না করে ওয়াটের আমল থেকে সৃজ্যমান ইংরেজী রূপবন্ধের আশ্রয় নিয়েছেন, তেমনি শিল্পকলার দাবি অনুযায়ী রূপবন্ধের ছক অনুসারে নিজের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ ও বর্জন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করেছেন। ফলে তাঁর সনেট ভাব ও রূপের সামঞ্জস্যে ইংরেজী রীতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর স্বতন্ত্র

৯. 'Here the poet has a medium which is absolutely congenial to him, and with which, as with Blank Verse, he can do anything he likes. With his usual sagacity he chooses the English form, and prefers its extremest variety—that of the three quatrains and couplet, without any interlacing rhyme.'—G. Saintsbury, A History of English Prosody, Vol. II (1961), p. 59.

রীতির ইংরেজী সনেট সেক্সপীয়ারের হাতে উৎকৃষ্টতম রূপ লাভ করায় তা কালক্রমে সেক্সপীরীয় সনেট আখ্যা লাভ করে।*

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, ওয়াট থেকে শুরু করে সেক্সপীয়ার পর্যন্ত বিভিন্ন কবি স্বতন্ত্র রীতির সনেট গড়বার জন্য যে নিরন্তর অনুশীলন করেছেন, তার যথার্থ কারণ কি? এ কি ইংরেজ কবিদের খেয়াল বা স্বেচ্ছাচারিতা বা স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তার উদাহরণ, না কি তার পেছনে কোনো গভীরতর সামাজিক বা সাংস্কৃতিক বা শৈল্পিক কারণ নিহিত আছে? এ-সম্বন্ধে লেভার বলেছেন যে, ত্রুবাদুর প্রেমসঙ্গীত ও পেত্রার্কীয় সনেটের ভাবগত ঐতিহ্য ইংরেজ জাতির রক্তগত সংস্কার এবং ইংরেজী গীতিকাব্য ও আখ্যানকাব্যের ঐতিহ্যের অনুকূল নয়। তাছাড়া পূর্বাগত ইংরেজী কাব্যের রূপ ও রীতির ঐতিহ্য এমন ছিল না যার ওপর নির্ভর করে যথার্থভাবে পেত্রার্কীয় সনেটকে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। ফলে 'the Shakespearean sonnet form and its variants are…evolved in response to the distinctive qualities of the English outlook and tradition.' দ্বিতীয়তঃ বলা হয়েছে, সেক্সপীয়ারের কাল পর্যন্ত ইংরেজের সমাজে ও চিত্তে দুই বিরোধী শক্তির মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব ছিল—একদিকে সৌন্দর্য ও সভ্য, অন্যদিকে বিকৃতি ও চপলতা, একদিকে ভাববিচিত্রার সহ-অবস্থান, অন্যদিকে তাদের বিরুদ্ধ-বিন্যাস। ইংরেজ জাতির এই মানসিক অবস্থার বাঙ্ময় প্রকাশ পেত্রার্কীয় সনেটের বুদ্ধিশাসিত ও পরস্পর-সাপেক্ষ রূপবন্ধ অপেক্ষা একটা ন্যায়ধর্মী ও অবরোহী রূপবন্ধে অধিকতর সহজ ছিল। তৃতীয়তঃ বলা হয়েছে, স্বরান্তশব্দবহুল ইতালীয় ভাষায় সমধ্বনিসম্পন্ন দুটি স্বরান্ত অক্ষরে মিল দেওয়া যতটা সুবিধাজনক, ব্যঞ্জনান্ত-শব্দবহুল ইংরেজী ভাষায় সেই ধরনের স্বরান্ত অক্ষরের মিল দেওয়া ততটা সুবিধাজনক নয়।[১০] অন্যদিকে ইংরেজী ভাষায় হলন্ত শব্দের দাবি অগ্রগণ্য।

* সেক্সপীয়ারের একটি সনেট চতুর্থ অধ্যায়ে উদ্ধৃত করা হয়েছে। সেটি দ্রষ্টব্য।

১০. এখানে মনে রাখা দরকার যে, চার বা পাঁচটি মিলের দ্বারা পেত্রার্কীয় সনেট রচনা করতে হয়। ফলে চোদ্দটি চরণে মিলের প্রয়োজনে সমধ্বনিসম্পন্ন শব্দ বেশী ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। কিন্তু সেক্সপীরীয় সনেট রচিত হয় সাতটি মিলের দ্বারা এবং সে-কারণেই সমধ্বনিসম্পন্ন শব্দের ব্যবহার সেখানে অপেক্ষাকৃত কম ঘটে।

অথচ তার দ্বারা স্বরান্ত শব্দ বা অক্ষরের মিলের মতো ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। ফলে ইংরেজ কবিদের পক্ষে স্বাতন্ত্র্যধর্মী সনেটরীতি প্রবর্তন করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। চতুর্থতঃ সেণ্টস্‌বারির মতে 'The national thirst for what Drayton so quaintly calls "the Gemell" comes in here (Shakespearean form) rightly and legitimately; and swift counter-twist in form of the couplet-close suits our head-long and masterful tongue better than the drawn-out dying of the sestet, and the end that is no end of the tercet itself.' অর্থাৎ ইংরেজ জাতির প্রাণ-পিপাসার দিক থেকে যেমন, তেমনি উচ্চারণ-সৌকর্যের দিক থেকে সনেটের সেক্সপীরীয় রীতির উপযুক্ততা অধিকতর।

সুতরাং দেখা গেল, কতগুলি সঙ্গত কারণেই ইংরেজ কবিরা সনেটের পেত্রার্কীয় রীতির বদলে একটা নিজস্ব রীতি গড়ে তুলেছেন।[১১] এই খাঁটি ইংরেজী রীতির

---

১১. কেউ কেউ স্বতন্ত্র রীতির ইংরেজী সনেটের সপক্ষে যে সমস্ত যুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেন না। তাঁদের মতে—মিল্টন, ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থ, কীট্‌স, রসেটি প্রমুখ কবিদের রচিত পেত্রার্কীয় রীতির অজস্র সনেট সেই সব যুক্তির সুস্পষ্ট প্রতিবাদ। কিন্তু আমার মনে হয়, ইংরেজী ভাষায় পেত্রার্কীয় সনেটের চর্চা কম-বেশী সব যুগে ঘটলেও সেক্সপীরীয় রীতির প্রতি ইংরেজ কবিদের অনুরাগ বরাবরই দেখা গেছে। দ্বিতীয়তঃ, পেত্রার্কীয় রীতির সনেট ইংরেজী ভাষায় লেখা হয়েছে বলে ঐ ধরনের সনেট রচনায় ইংরেজ কবিদের অস্বাচ্ছন্দ্যের কারণ থাকতে পারে না, এ ঠিক যুক্তিসহ বক্তব্য নয়। তৃতীয়তঃ, মিল্টন খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতির সনেট রচনা করতে পারেন নি, কারণ তাঁর সনেটে আবর্তন-সন্ধি প্রায় অনুপস্থিত। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সনেটেও একটা শিথিলতা লক্ষ্য করা যায়। আর তাই পেত্রার্কীয় রীতির বিশ্বস্ত অনুসরণ উল্লিখিত কবিদের ক্ষেত্রে সর্বত্র ঘটে নি। অন্যদিকে ইংরেজ কবিরা যদি ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহ্য এবং জাতীয় মানসিকতার দিক থেকে সেক্সপীরীয় রীতিকে সহজতর বলে মনে করে থাকেন, তাতে রীতিটার নিকৃষ্টতা প্রমাণিত হয় না। বাঙলা দেশে প্রমথ চৌধুরীও সনেট রচনায় ফরাসী রীতি অনুসরণ করেছিলেন 'ওরই মধ্যে একটু সহজ বলে।' আসল কথা, যে-কোনো কারণেই হোক, ইংরেজ কবিরা সনেট রচনায় স্বতন্ত্র পন্থা অবলম্বন করে সেক্সপীরীয় রীতিকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিতে পেরেছেন এবং সে কারণেই তার মূল্য অনস্বীকার্য।

সনেটের সাংগঠনিক কৌশল কি ধরনের শিল্প-সুষমার সৃষ্টি করে, তা-ই এবার বিচার করে দেখা যাক। প্রথমতঃ, যেটা বিশেষভাবে চোখে পড়ে তা হচ্ছে, এতে ভাব ও রূপগত অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ঘটে না এবং অষ্টকের শেষে আবর্তন-সন্ধিও অনুপস্থিত। তার বদলে একান্তর ও বিভিন্ন মিলের তিনটি চতুষ্ক এবং একটি অন্তিম পয়ারবন্ধ নিয়ে সেক্সপীরীয় রীতির সনেট গঠিত হয়। ফলে পেত্রার্কীয় সনেটের মতো এর রূপাবয়ব দ্বিধাবিভক্ত নয়, স্পষ্টতঃই চতুর্ধাবিভক্ত। সেক্সপীরীয় সনেটের এই চার ভাগের মধ্যে প্রথম তিন ভাগে একটা আবেগপ্রধান ভাবের ক্রমিক অভিব্যক্তি ঘটে—কখনও সরল বা দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে, কখনও বিভিন্ন ভাষাভঙ্গি বা তুলনা বা চিত্রকল্পের সাহায্যে। তারপর অন্তিম পয়ারবন্ধটিতে সেই ভাবের ন্যায়সঙ্গত উপসংহার বা logical deduction ঘটে, কখনও বা ভাব নূতন দিকে মোড় ফিরে একটা চমৎকার সমাপ্তির আস্বাদ দেয়। সুতরাং সেক্সপীরীয় সনেটের তিনটি চতুষ্ককে যেমন একটা ভাবগত ইউনিট হিসেবে ধরা যায়, তেমনি আরেকটি ইউনিট হিসেবে ধরা যায় শেষের পয়ারবন্ধটিকে। এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করতে গেলে মনে হয়, দ্বিতীয় ইউনিটটি হচ্ছে প্রথম ইউনিটেরই উজ্জ্বল চূড়া বা শিখা মাত্র।

অন্যদিকে সেক্সপীরীয় সনেটের ভাব-প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তার রূপগত গঠন পরিকল্পিত হয়। প্রথম চতুষ্কে মিলের পদ্ধতি হচ্ছে কখকখ অর্থাৎ তাতে একান্তর মিল থাকে। এইভাবে একান্তর মিলের দ্বারা গঠিত চার চরণের চতুষ্কটি বিবৃত (open) হওয়ায় যে ছন্দোগত চলিষ্ণুতা দেখা দেয় (মনে রাখা দরকার, একান্তর মিলের রীতি একটা Progressive movement-এর অনুকূল), দ্বিতীয় চতুষ্কের মিলগত একান্তর রীতির মধ্যে তা অব্যাহত থাকে। কিন্তু দ্বিতীয় চতুষ্কে শুধু একান্তর মিলই থাকে না, ভিন্নতর মিলও থাকে অর্থাৎ তার মিলের পদ্ধতি হচ্ছে গঘগঘ। এই ভিন্নতর মিল যোজনার ফলে পূর্বতন চতুষ্কের ধ্বনিস্মৃতি জাগে না এবং ছন্দোধ্বনির ক্ষেত্রে কোনো পরাগত চলিষ্ণুতা দেখা দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং দ্বিতীয় চতুষ্কের একান্তর অথচ ভিন্নতর মিলের মধ্যে দিয়ে প্রথম চতুষ্কের ছন্দোগত চলিষ্ণুতা স্বচ্ছন্দভাবেই তৃতীয় চতুষ্কে গিয়ে পৌঁছোয়। এই তৃতীয় চতুষ্কের মিলও হচ্ছে একান্তর ও ভিন্নতর অর্থাৎ পফপফ এবং পূর্বোক্ত কারণে এর মধ্যেও ছন্দোগত প্রগতিশীলতা বজায় থাকে। এই ভাবে বিশ্লেষণ করলে মনে হয়, সেক্সপীরীয় সনেটের তিনটি চতুষ্কের গঠন ও ছন্দ-মিলের রীতি অব্যাহত চলিষ্ণুতারই পরিপোষক। অবশেষে সেক্সপীরীয় সনেটের উদ্ধৃত

ধাতুমূর্তিকে অন্তিম পয়ারবন্ধের শক্ত বাঁধুনির দ্বারা সম্পূর্ণতা দান করা হয়। এই জাতীয় সনেটের গঠনকর্মে শেষ দুটি মিত্রাক্ষর চরণের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উইলিয়াম শার্প যথার্থই বলেছেন—'The Shakespearean sonnet is like a red-hot bar being moulded upon a forge till-in the closing couplet—it receives the final clinching blow from the heavy hammer.'

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সেক্সপীরীয় সনেটের চতুর্ধাবিভক্ত রূপটি শেষ পর্যন্ত পেত্রার্কীয় সনেটের মতোই এক অখণ্ড সৌষম্যের মধ্যে বিধৃত হয়। তবে উভয় জাতীয় সনেটের গঠনের মধ্যে সামগ্রিকভাবে একটা অখণ্ড ভঙ্গিমা থাকলেও তাদের সাংগঠনিক কলাকৌশলের মধ্যে পার্থক্যও আছে। পেত্রার্কীয় সনেটের গঠন-পদ্ধতি যেখানে dialectical, সেখানে সেক্সপীরীয় সনেটের গঠন-পদ্ধতি হচ্ছে logical; প্রথমটির সৌন্দর্য নিহিত থাকে আবর্তন-সন্ধির রহস্যের মধ্যে, দ্বিতীয়টির সৌন্দর্যের চমক রয়েছে পয়ারপুচ্ছের epigrammatic ভঙ্গির মধ্যে।

ইংরেজী সনেটের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে বোঝা যাবে, ইংল্যাণ্ডের মাটিতে, একটা ভিন্নতর ভাষার ক্ষেত্রে ইতালীয় সনেটের আকৃতি ও প্রকৃতির পরিবর্তন কি ভাবে কত দূর ঘটল। পূর্বেই বলেছি—দেশ, ভাষা ও মানসিকতা-ভেদে আদি সনেট-রীতির এই পরিবর্তন দোষাবহ নয়।

৩.

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে ফরাসী দেশে সনেটের চর্চা চলে আসছে। তবে প্রভেঁস ফ্রান্সের অন্তর্গত হলেও ত্রুবাদুরদের প্রেম-সঙ্গীত থেকে তা কালক্রমে আকার লাভ করেনি। পূর্বে আমরা দেখেছি, রেনেসাঁসের ভাবধারা ইতালী থেকে পশ্চিম য়ুরোপের যে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে পড়ে, ফ্রান্স তাদের অন্যতম। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে পূর্বাভাস দেখা গেলেও ষোড়শ শতাব্দীতেই, বিশেষ করে ১৫৩০-১৫৬০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, সেই নবজাগরণের পূর্ণ প্রস্ফুটন ঘটে। আর এই সময়েই ইতালীয় সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের ফলে ফ্রান্সের কাব্য-জগতে যখন বিপ্লব আসে, তখন সনেটের রূপবন্ধের দিকেও সেখানকার কবিদের দৃষ্টি পড়ে। এ-প্রসঙ্গে ক্লেমেঁ মারোর (Clément Marot) নাম প্রথমে উল্লেখযোগ্য।

তিনি পেত্রার্কার ছয়টি সনেট অনুবাদ করেন এবং ফরাসী ভাষায় প্রথম মৌলিক সনেট লেখেন। তিনি সমকালের কবি-নেতা হলেও উৎকৃষ্ট গীতিকবি ছিলেন না; তাঁর সনেটেরও ঐতিহাসিক মূল্য যতটা, যথার্থ কাব্য-মূল্য ততটা নয়। প্লেইয়াদ্-গোষ্ঠীর আবির্ভাবের পূর্বেকার ফরাসী রেনেসাঁসের আরেকজন উল্লেখ যোগ্য কবি হচ্ছেন মেলাঁ্য দ্য সাঁগে (Mellin de Saint-Gelais)। তিনি সভাকবি হলেও ইতালীয় রেনেসাঁস থেকে নূতন প্রেরণা লাভ করে ও পেত্রার্কার পন্থা অনুসরণ করে সনেট লেখেন এবং ফ্রান্সে এই কাব্যবন্ধ জনপ্রিয় করে তোলেন। Louise Labé-এর সনেট ইতালীয় আদর্শে রচিত হলেও তার মধ্যে প্রেম-কবিতার প্রথাবদ্ধ আবেদনের বদলে একটা ব্যক্তিগত আবেগ অনুভব করা যায়। প্লেইয়াদ্-গোষ্ঠীর কবিদের মধ্যে দ্যু বেলে (Joachim Du Bellay), রঁসার (Pierre de Ronsard) ও দেপর্তে (Phiippe-Desportes) সনেটকার হিসেবে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন। 'L' Olive'-এর অন্তর্গত সনেটগুলিতে দ্যু বেলে বিশ্বস্তভাবেই পেত্রার্কার রীতি মেনে নিয়েছেন, তবে কোথায়ও কোথায়ও তাঁর কবিতা বুদ্ধির ব্যায়াম-কৌশল হয়ে দাঁড়ানোর ফলে হৃদয়কে তেমন স্পর্শ করে না। অন্য দিকে "The sonnets, all written in ten-syllabled lines, are not perfectly regular, according to the pattern that was to be settled very shortly after."[১] তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য সনেট-সংগ্রহ হচ্ছে 'Les Antiquitis de Rome' ও 'Les Regrets'. প্রথমটিতে তিনি রোমের ধ্বংসাবশেষ দেখে তাঁর মনের ভাব ও জীবনের উত্থান-পতন সম্বন্ধে চিন্তা প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয়টিতে আছে ব্যক্তিগত কথা; নিজের হতাশা, একঘেয়েমি, গৃহ-কাতরতা সম্পর্কে নানা মন্তব্য। গ্রীক ও ল্যাটিনবিদ্ কবি রঁসারের সনেট-সংগ্রহ 'Amours de Cassandre'[২], 'Amours' ও 'Sonnets pour Hélène'. এর মধ্যে প্রথমটিতে যে পেত্রার্কাসুলভ শাসন ছিল দ্বিতীয়টিতে তিনি তা থেকে কতকটা মুক্ত হয়েছেন। প্রেম-বিষয়ক সনেট হিসেবে তৃতীয় গ্রন্থের কবিতাগুলি খুবই জনপ্রিয়।

এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাসে আভাস দেওয়া হয়েছে, কি ভাবে ফরাসী দেশে সনেট

১. L. Cazamian's 'A History of French Literature' (1960), p. 82.

২. সনেট ছাড়া অন্য জাতীয় কবিতাও এর মধ্যে আছে।

প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুতঃ পক্ষে সে দেশের শ্রেষ্ঠ কবিগণ অনুশীলন করায় এই বিশেষ রূপবন্ধের কবিতা অল্প দিনেই প্রধান কাব্যবন্ধ হয়ে ওঠে। কিন্তু ফরাসী সনেটে পেত্রার্কীয় আদর্শের বিশ্বস্ত অনুসরণের প্রয়াস সত্ত্বেও প্রথম থেকেই স্বাতন্ত্র্যের একটা লক্ষণ দেখা যায়। এতে পেত্রার্কীয় সনেটের মতো দ্বিধা-বিভাগ নেই, আছে ত্রিধা-বিভাগ। অষ্টকে ইতালীয় আদর্শের বিশ্বস্ত অনুসরণের পর ষট্কের প্রথম দুই চরণে পরস্পর পয়ার-মিল দেখানো হয়; তারপর অবশিষ্ট চার চরণে আবার আদি সনেট রীতির অনুবর্তন ঘটে। অর্থাৎ কখখক, কখখক, গগ, চছচছ। সুতরাং ষট্কের প্রথম দুই চরণে ইতালীয় আদর্শের লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়।

ফরাসী সনেটে[৩] নবম ও দশম চরণে যে আঁটসাঁট পয়ার-মিল থাকে তা মধ্যভাগে একটা নূতন মোড় এনে সমগ্র রূপ-প্রতিমাকে নিঃসন্দেহে তিন ভাগে বিভক্ত করে দেয়। কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায়, ত্রিভঙ্গ মুরারির মূর্তির মধ্যেও যেমন একটা অখণ্ড সুষমা বিরাজ করে, তেমনি ফরাসী সনেটের ত্রিভঙ্গ ঠামের মধ্যেও সুষম রূপ-সমগ্রতা বজায় থাকে। সে ক্ষেত্রে অষ্টকের ভাগটি হচ্ছে উত্তমাঙ্গ, চার চরণের ষট্কাংশ হচ্ছে অধমাঙ্গ এবং মাঝখানের পয়ারী দুটি চরণ হচ্ছে কটি-দেশের খড়্গবন্ধ। এই তুলনা থেকে বোঝা যাবে যে, ফরাসী কবিদের হাতে পেত্রার্কীয় সনেটের দ্বিধা-সুন্দর দেহডৌল বিপর্যস্ত হলেও তার বদলে সনেট-কবিতার ত্রিভঙ্গঠাম তাঁরা গড়ে তুলেছেন এবং তার মধ্যে অখণ্ড সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সামঞ্জস্য বজায় রাখার সুযোগ রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, মধ্যভাগের মিত্রাক্ষর চরণ দুটি সনেটে যে একটা গঠনগত ঔজ্জ্বল্য আনে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। তৃতীয়তঃ, দ্যু বেলের মতো কোনো কোনো ফরাসী কবি আয়রনি ও স্যাটায়ার প্রকাশ করতে গিয়ে এই রীতির সদ্ব্যবহার করতে পেরেছেন। যেখানে অষ্টকে পেত্রার্কীয় ঢঙ অনুসরণের পর সেক্সপীরীয় রীতির পয়ারভাগ সন্নিবেশে একটা সমাপ্তির ভাব আসে, সেখানে শেষ চার চরণে আবার পেত্রার্কীয় রীতির পুনরাবর্তনের মধ্যে একটা অপ্রত্যাশিত ঝোঁক ও anticlimax-এর ভঙ্গি আছে। আর তারই সুযোগ নিয়ে বিদ্রূপের রস ও কষ জমিয়ে তোলা সহজ। আর

৩. তবে ফরাসী ভাষায় লিখিত সনেট মাত্রেই ফরাসী রীতি অনুসৃত হয়নি, এ কথা মনে রাখতে হবে। যেমন রঁসারের 'Sonnets pour Hélène'-তে খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতির সনেটও আছে।

এই যে ফরাসী সনেটের অভিনব রূপমূর্তি—তাতে সেক্সপীরীয় সনেটের প্রোজ্জ্বল পয়ারপুচ্ছ নেই, নেই পেত্রার্কীয় সনেটের দ্বিধাসুন্দর দেহডৌল, কিন্তু যা আছে সেই কটি-দেশের খণ্ডবন্ধ আর চোদ্দচরণের ত্রিভঙ্গ ঠাম পাঠকের রসবোধকে তৃপ্ত করে বলেই আমার বিশ্বাস। মনে রাখতে হবে, ফরাসী সনেটের এই রীতি-স্বাতন্ত্র্য কবি-বিশেষের খেয়ালপ্রসূত নয়, তা প্রথমাবধি শ্রেষ্ঠ ফরাসী সনেটকারগণের চর্চার দ্বারা বিকশিত।[৪] একটা ফরাসী রীতির সনেটের অনুবাদ উদ্ধৃত করছি—

When you are old···

When you are old and sit by candle-light
At evening near the fire and spin away,
You will chant my verse and, marvelling, you' ll say :
"Ah ! Ronsard sang my beauty when 'twas bright."
Hearing the tidings that you tell of me,
Your drowsing maids will waken at my name,
Extolling you and your immortal fame,
For you will share my immortality.
While I in darkness 'neath the myrtles rest,
A ghost, my body shed, among the blest,
You' ll huddle by the hearth all bowed and grey,
And o'er my love and your disdain you' ll sorrow.
Live now, love ; heed me, wait not till to-morrow,
But cull life's roses while 'tis yet to-day.

—Ronsard.

রঁসারের কবিতাটির অ্যালান কণ্ডার-কৃত এই অনুবাদে ফরাসী-রীতির সনেটের মিলের বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি বজায় নেই[৫], তবু সে সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করা যেতে পারে।

---

৪. Melin De Saint-Gelais-এর একটি সনেটের নবম ও দশম চরণ হচ্ছে—

Ni tant ya de monstres en Afrique,
D'opinions en une republique,

[অনুবাদ : Nor are there so many monsters in Africa, opinions in a republic]

৫. মূল ফরাসী কবিতায় মিল-বিধায়ক শব্দগুলি হচ্ছে—প্রথম চতুষ্ক :

অতএব ফরাসী কাব্যে আদি সনেট-রীতির একটা পরিবর্তন দেখা যায়। এই নতুন রীতিতে কিছু কিছু উৎকৃষ্ট সনেট ফরাসী কবিরা রচনা করেছেন। শুধু তাই নয়, ফরাসী রীতির ভাগ্যে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতিও ঘটেছে। এমন কি এই বাঙলা দেশের কবিরাও ফরাসী রীতিকে অঙ্গীকার করে নিয়ে ভালো ভালো সনেট লিখেছেন। আর সে কারণেই সনেটের বিবর্তনের ইতিহাসে এই রীতির একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

৪.

ফরাসী সনেটে যেমন পেত্রার্কীয় সনেটের একটু ব্যতিক্রম দেখা যায়, তেমনি ব্যতিক্রম দেখা যায় মিল্টনের সনেটে। ইংল্যাণ্ডের এক নিদারুণ রাজনৈতিক ঝড়ঝঞ্ঝার দিনে তিনি এই সনেটগুলি লিখেছিলেন। বিষয় ও সুরের দিক থেকে এদের সঙ্গে এলিজাবেথীয় সনেটের কোনো মিল নেই। একদিকে তাঁর সনেট যেমন বিচিত্রবিষয়ক, অন্যদিকে তেমনি পরস্পর-বিচ্ছিন্ন। সুতরাং প্রেমবিষয়ক সনেট-পরম্পরা লেখার যে ফ্যাসান দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত ছিল মিল্টন তা অনুসরণ করেন নি। রূপ ও রীতির ক্ষেত্রে তিনি পেত্রার্কীয় আদর্শ অনুসরণ করলেও একটি বিষয়ে স্পষ্টতঃই স্বাধীনতা অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর সনেটে অষ্টকের পরে অনেক ক্ষেত্রে কোনো ছেদ নেই—ভাব অষ্টক থেকে অবলীলাক্রমে ষট্‌কে প্রবাহিত হয়ে গেছে। যেখানে অষ্টম চরণের পরে ছেদ আছে, সেখানেও কবি সচেতনভাবে সেই ছেদ বসিয়েছেন কিনা সন্দেহ। এ থেকে অনুমান করা যায়, মিল্টন সজ্ঞানেই পেত্রার্কীয় রীতির মধ্যে এই পরিবর্তনটুকু ঘটিয়েছেন। তাঁর একটি সনেটে আবার পয়ারপুচ্ছ দেখা যায়[১]—কিন্তু সেটাকে মিল্টনীয় রীতির মধ্যে না ধরাই বাঞ্ছনীয়। অষ্টকের পর ছেদ

Chandelle-filant-émerveillant-belle ; দ্বিতীয় চতুষ্ক : nouvelle-sommeillant-réveillant-immortelle ; প্রথম ত্রিক : os-repos-accroupie ; দ্বিতীয় ত্রিক : dédain-demain-vie। প্রথম ত্রিকের অন্তর্গত নবম ও দশম চরণের পয়ারী মিল লক্ষণীয়।

১. সনেটটির শিরোনাম—'To The Lord Generall Cromwell May 1652

না দেওয়ার যে রীতি মিল্টন প্রবর্তন করেন, পরবর্তীকালের রোমান্টিক কবিগণ সেই রীতি মোটামুটিভাবে অনুসরণ করেন। এদিক থেকে পেত্রার্কীয় রীতির একটু ব্যতিক্রম হিসেবে মিল্টনীয় রীতির যে একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য রয়েছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

মিল্টনীয় রীতির একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত পাওয়া যাবে নিম্নলিখিত সনেটটিতে—

Avenge O Lord thy slaughter'd Saints, whose bones
Lie scatter'd on the Alpine mountains cold,
Ev'n them who kept thy truth so pure of old
When all our Fathers worship't Stocks and Stones,
Forget not : in thy book record their groanes
Who were thy Sheep and in their ancient Fold
Slayn by the bloody Piemontese that roll'd
Mother with Infant down the Rocks. Their moans
The Vales redoubl'd to the Hills, and they
To Heav'n. Their martyr d blood and ashes sow
O're all th' Italian fields where still doth sway
The triple Tyrant : that from these may grow
A hundred-fold, who having learnt thy way
Early may fly the Babylonian wo.

—On the late Massacher in Piemont.

এই সনেটটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হয়েছে—'Here we see what his genius made of the sonnet. He returned to the Italian form at its strictest, the two quatrains followed by the two tercets, each with their two rhymes. But he makes no division in the idea. The fourteen lines follow a single uninterrupted train of thought ; a phrase is continued from one line to another, even from one quatrain to another. The effect is surprising : sentences seem to be cut short, not by art but by indignation'[২] উদ্ধৃতির শেষ চরণটিতে যে বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে, তার দিকে লক্ষ্য

২. A History of English Literature (1947), By Legouis and Cazamian, P. 379.

য়েখেই বোধহয় মিল্টনীয় সনেট প্রসঙ্গে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ বলেছেন—'in his hand/ The thing became a trumpet.'

এখানে আর একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। মিল্টনের আঠারোটি[৩] ইংরেজী সনেটের মধ্যে সাতটিতে অষ্টকের পরে পূর্ণচ্ছেদ আছে, সাতটিতে আছে উপচ্ছেদ এবং চারটিতে কোনো প্রকারের ছেদ নেই। যেখানে পূর্ণচ্ছেদ আছে সেখানেও পেত্রার্কীয় সনেটের আবর্তন-সন্ধি সম্পর্কে কবি সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। দ্বিতীয়তঃ, আবর্তন-সন্ধি অনুপস্থিত বা অনির্দিষ্ট হওয়ার দরুণ ভাবের দিক থেকেও খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেটসুলভ অষ্টক-ষটকের ভারসাম্য অনেক ক্ষেত্রে বজায় থাকে নি। আর সে-কারণেই মিল্টনীয় সনেটকে সমগ্রভাবে বিচার করাই শ্রেয়। তখন দেখা যাবে পেত্রার্কীয় আদর্শের ব্যতিক্রম সত্ত্বেও তার 'পূর্ণ নিটোল গোলোকত্ব' বা 'single uninterrupted train of thought'-এর মধ্যেও একটা সনেট-সন্নিভ সৃষ্টি-সৌন্দর্য রয়েছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, স্পেন্সারের সনেটে যে মিলগত নূতনত্ব দেখা যায়, তার জন্য কেউ কেউ সনেটের ক্ষেত্রে স্পেন্সারীয় রীতিকেও[৪] স্বতন্ত্র মর্যাদা দেওয়ার পক্ষপাতী।

৫.

সুতরাং দেখা গেল, সনেটের তিনটি রীতি কালক্রমে বিশ্ব-সাহিত্যে দাঁড়িয়ে গেছে—পেত্রার্কীয়, সেক্সপীরীয় ও ফরাসী। গৌণতঃ মিল্টনীয় রীতির কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে, সনেট একটি সজীব রূপবন্ধ। কিন্তু এই সজীবতার অর্থ যদৃচ্ছ রূপপরিবর্তনশীলতা নয়। সাধারণভাবে আমরা জানি, যাদুঘরের মতো কঙ্কাল নিয়ে সৃষ্টিশীল সাহিত্য কারবার করে না; তা হচ্ছে 'the House beautiful', 'a warehouse of tradition' নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও স্মরণ রাখতে হয় যে, 'the concept of tradition is not abandoned' এবং 'A community of the great

৩. 'On the new forcers of Conscience under 'the Long Parliament'-কে সনেট হিসেবে গণ্য করা হয় নি।

৪. স্পেন্সারীয় মিলের রীতি হচ্ছে—কখকখ খগখগ গঘগঘ চচ।

authors throughout the centuries must be maintained.' আর সে-জন্তই কোনো সাহিত্যরূপেরই বিবর্তন এমনভাবে ঘটা উচিত নয় যা তার ঐতিহ্যের বিরোধী, যাতে তার বিশিষ্ট পরিচয় হারিয়ে যায়। সনেটের রূপ ও রীতির পরিবর্তন সম্বন্ধে একথা আরও জোর দিয়ে বলা যেতে পারে। মনে রাখতে হবে, সনেটের একটা চিহ্নিত রূপগঠনভঙ্গিমা আছে এবং তার কলারীতি অন্যান্য রূপবন্ধের কলারীতির চেয়ে অধিকতর নির্দিষ্ট ও কঠিন। আর তার জন্তই সনেটের ক্ষেত্রে এমন পরিবর্তন সমর্থনযোগ্য নয় যাতে তার চিহ্নিত রূপগঠনভঙ্গিমা ও বিশিষ্ট পরিচয় বিপর্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং সনেটের রূপবন্ধের সজীবতার অর্থ মৌল পরিবর্তনশীলতা নয়। সেক্সপীরীয়, ফরাসী ও মিল্টনীয় সনেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, তাতে কিছু কিছু পরিবর্তন সত্ত্বেও সনেট-লক্ষণ বজায় আছে।

এবার সাধারণভাবে সনেট সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যেতে পারে। কিন্তু তার আগে স্মরণ রাখতে হবে যে, সব রীতির সনেটকেই কিছু কিছু নিয়মের শাসন মেনে চলতে হয় এবং সেই নিয়মের শাসনের জন্তেই তাদের মধ্যে কতকগুলি সামান্য লক্ষণ দেখা যায়।

সনেট সম্পর্কে প্রথম কথা হচ্ছে এই যে, তা চোদ্দ চরণের ছোট কবিতা। দীর্ঘ গীতিকবিতায় ভাবের পূর্ণ প্রকাশ ঘটানো কঠিন নয়, কিন্তু চতুর্দশপদীর সংহত ও নির্দিষ্ট রূপের মধ্যে ভাব ফুটিয়ে তোলা দুঃসাধ্য। তার জন্য চাই কবির গভীর রস-চেতনা, আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের পরিমিতিবোধ। ঢিলে-ঢালা আবেগ ও চিন্তার শৈথিল্য নিয়ে সনেটের নিরেট প্রতিমা গড়ে উঠতে পারে না। চোদ্দ চরণের আঁট-সাট শক্ত-সমর্থ কায়ার মধ্যে ভাবের আত্মাটি কখনওই সাকার হয়ে ওঠে না, যদি না তার পেছনে থাকে কবির সযত্ন প্রসাধনকলা। আর্টের গুণে সনেটের স্বল্পায়তন দেহভৌল পাঠকের সৌন্দর্যতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করে, এক একটা সার্থক বড় কবিতার মতোই মূল্যবান হয়ে ওঠে।[১] এতে সৃজনশীলতার একটা কঠিন পরীক্ষা হয়, সন্দেহ নেই, তবু অনেক কবি এর মধ্যে দেখতে পান আপন শিল্পী-প্রাণের মুক্তির পথ এবং অসীমের আভাস—

ভালবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন,
শিল্পী যাহে মুক্তি লভে অপরে ক্রন্দন।

এ যেন মুকুরতলে ব্রহ্মাণ্ডের ছায়া,
অসীমেরে টেনে আনা সীমার মাঝারে,

—প্রিয়ম্বদা দেবী

অনিত্যের স্মৃতি-চিহ্ন—হোক এতটুকু—
নিত্যের গবাক্ষে জ্বলে; অতি ক্ষুদ্র দান
ক্ষুদ্র দীপ, আঁধারের তবু অভিজ্ঞান,—
মুখে তার রক্তরাগ, স্নেহে সিক্ত বুক,—

—সুশীলকুমার দে

সুতরাং কবিকর্ম হিসেবে সনেটের মর্যাদা অনেক। অথচ কারও কারও ধারণা, এ যেন কানাকড়ি নিয়ে খেলা। কিন্তু তারা ভুলে যান, খেলতে জানলে কানাকড়ি নিয়েও খেলা যায়, তাতেও জয় প্রতিশ্রুত। এর প্রমাণ দেখেছি ইতালীয় সাহিত্যে। সেখানে শুধু সনেটের জন্ম হয় নি, হয়েছে তার চরম বিকাশ। তাই একজন সমালোচক মন্তব্য করেছেন—'Whoever finds sonnets unattractive or repulsive to him is out of tune with the whole genius of Italian poetry.' ইংরেজী সাহিত্যেও কয়েক শতাব্দীব্যাপী চর্চার ফলে তার মূল্য শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। অতএব স্বীকার করতেই হবে, সনেট অক্ষম কবির অকিঞ্চিৎকর সৃষ্টি নয়, ভাবের অভাব বা অবক্ষয় থেকেও তার জন্ম হয় না।

দ্বিতীয়তঃ, সনেট হচ্ছে লিরিকের একটি বিশিষ্ট প্রজাতি এবং তার মূল প্রেরণা হচ্ছে লিরিক-প্রেরণা। কিন্তু সেই লিরিক-প্রেরণার গতি যদি হয় বাধাবন্ধহীন প্রসারের দিকে তবে তা নিয়ে সনেট রচনার চেষ্টা দুঃসাহসের কথা। অন্য দিকে যে লিরিক-প্রেরণার প্রবণতা ভেতরের দিকে—সঙ্কোচনের দিকে—ঘনতার দিকে, তা-ই এর যথার্থ বিষয়। অনেকখানি ভাব সংহত হয়ে একটুখানি ঘনীভূত ভাব যেখানে দেখা দেয়, সেখানেই সনেটের সুনিয়মিত ছাঁচে তার রূপায়ণ হতে পারে। অন্যভাবে বলা যায়, সনেটকারের

১. 'In the hands of a master techniques become hightened means of expression. Artifice passes over into art and is absorbed in it.'—E. R. Curtius, European Literature and the Latin Middle ages (1948), p. 390.

লিরিক্যাল মানসে উচ্ছ্বাসধর্মিতা প্রবল হলে কোনো পূর্ব-নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে তাকে শাসন করে রাখা যায় না। তাই সনেটের ক্ষেত্রে কবির লিরিক-প্রেরণার ঝোঁকটা থাকে সংহতি ও আত্মস্থতার দিকে। সনেটের লিরিক-কল্পনায় এই সংহতি ও সংযমঘটিত ক্লাসিক্যাল ঝোঁক আছে বলেই তাকে একটা বিশেষ ছাঁচে ফেলে, একটা নির্দিষ্ট নাগপাশের বন্ধনে সুঠাম ও সুডৌল রূপাবয়ব দেওয়া সম্ভব।

সনেটে কবির লিরিক-প্রেরণার ঝোঁকটা যে ক্লাসিক্যাল সংযম ও সংহতির দিকে হওয়া চাই, তা ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের দুটো কবিতার তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে প্রমাণ করা যায়। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি 'To The Cuckoo' নামে একটি লিরিক রচনা করেন। তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ। কবিতাটিতে তাঁর আবেগ ও উচ্ছ্বাস চল্লিশটি চরণের ছন্দে ছন্দে বেজে উঠেছে, একটা পুলকের শিহরণ কবিতাটির অঙ্গে অঙ্গে অনুভব করা যায়।

O Blithe New-comer ! I have heard,
I here thee and rejoice.
O Cuckoo ! Shall I call thee Bird.
Or but a wandering Voice ?

While I am lying on the grass
Thy twofold shout I hear,
From hill to hill it seems to pass,
At once far off, and near.

Though babbling only to the vale,
Of sunshine and of flowers,
Thou bringest unto me a tale
Of visionary hours.

Thrice welcome, darling of the Spring !
Even yet thou art to me
No bird, but an invisible thing,
A voice, a mystery. ইত্যাদি

এই সুপরিচিত ও সুন্দর লিরিকটি রচনার বছরেই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মাইকেল-আঞ্জেলোর মূল ইতালীয় ভাষা থেকে একটি সনেট অনুবাদ করেন ('To The Supreme Being')। কিন্তু সনেটের সেই অনুবাদ তাঁর কাছে সহজসাধ্য মনে হয় নি—'he even attempted fifteen of the sonnets of Michael-angelo, but so much meaning is compressed into so little room

in those pieces that he found the difficulty insurmountable',[২] এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মনটা তখন ভাবৈশ্বর্যধর্মী সনেট রচনার অনুকূল ছিল না (যদিও ১৮০১ সালে সনেট রচনায় তাঁর হাতেখড়ি হয়), বরং উচ্ছ্বসিত আবেগে লিরিক লেখা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল। তাই তিনি তখন বনবিহঙ্গটিকে নিয়ে ভাবের রসানুকূল শব্দে ও ছন্দে একটি সুন্দর লিরিকই লিখেছেন। তারপর ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সাতান্ন বছর বয়সে ও মানসিক অবস্থান্তরে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সেই একই বনবিহঙ্গকে নিয়ে একটি সনেট রচনা করেন—

Not the whole wrabling grove in concert heard
When sunshine follows shower, the breast can thrill
Like the first summons, Cuckoo! of thy bill,
With its twin notes inseparably paired.
The captive 'mid damp vaults unsunned, unaired,
Measuring the periods of his lonely doom,
That cry can reach ; and to the sick man's room
Sends gladness, by no languid smile declared.
The lordly eagle-race through hostile search
May perish ; time may come when never more
The wildness shall hear the lion roar ;
But, long as cock shall crow from house-hold perch
To rouse the dawn, soft gales shall speed thy wing,
And thy erratic voice be faithful to the spring !

—To the cuckoo.

পূর্বোক্ত লিরিকটির তুলনায় এ সনেটটি অনেক বেশী সংযত ও গম্ভীর। তার কারণ, সনেটের ভাব-আত্মা ও রূপবন্ধের দাবি সম্বন্ধে কবির সচেতনতা।[৩] লিরিকে যেখানে কোকিলের কুহুধ্বনিতে কবির উল্লাস কয়েকটি স্তবক জুড়ে ঘুরে ঘুরে কথা কয়েছে, সেখানে সনেটটিতে কুহুধ্বনির মোহময়তার কথা বেজে উঠেছে

২. The Complete Poetical Works of William Wordsworth (1950). Macmillan & Co, p, lix.

৩. ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ যখন সনেটটি রচনা করেন, তখন তাঁর সৃষ্টি-প্রতিভা অস্তগামী। সে-কারণেও সনেটটির মধ্যে প্রসন্ন কবিত্বের অভাব ঘটেছে ও গাম্ভীর্যের ভাব দেখা দিয়েছে—এই ধরনের মত ঠিক অযৌক্তিক না হলেও কবিতাটির গাম্ভীর্যের শিল্পগত কারণটিই এ-প্রসঙ্গে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ।

মাত্র আটটি চরণে—তাতেও আবার কবির ব্যক্তিগত আনন্দের ধ্বনি নেই, আছে একটা সাধারণ আনন্দ-সংবাদ মাত্র। সনেটটির শেষ ছয়টি চরণে কবির মনোভাবও ('একদিন হয়তো প্রভুত্বকামী ঈগল-জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে, অরণ্যের বন্যতায় স্তব্ধ হবে সিংহের গর্জন, কিন্তু যতদিন ঘরে ঘরে মোরগ-ডাকা ঊষা দেখা দেবে, ততদিন মৃদু বাতাস তোমার ডানায় গতি আনবে, তোমার বিশৃঙ্খল কণ্ঠস্বর বসন্তের প্রতি অনুরক্ত থাকবে') লিরিকটিতে ছিল না : কিন্তু অষ্টকের বক্তব্যকে ষট্‌কের মধ্যে পরিণতি দিতে গিয়ে এই ধরনের একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সনেটটির পক্ষে অপরিহার্য ছিল। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, লিরিকটিতে ভাবের যে তোড় ছিল সনেটটিতে তা অনুপস্থিত। অন্য দিকে সেই ভাবগত উদ্দাম প্রবাহের বদলে একটা ক্রম-বিন্যস্ত সংযত ভাব চতুর্দশপদীটিতে দীপ্তিমান্। ভাষা ও ছন্দের পার্থক্যও লক্ষণীয় ; যেখানে সহজ সরল শব্দের আনাচে কানাচে ছোট ছোট বাক্যের খাতে খাতে লিরিকটির ভাব উচ্ছ্বসিত, সেখানে দীর্ঘায়ত চরণে অপেক্ষাকৃত কঠিন শব্দের শৃঙ্খলে, এমন কি তুলনামূলক চিত্রকল্পের সাহায্যে সনেটটির ভাব স্ফূর্তি পেয়েছে। দ্বিতীয় কবিতায় মিল্টনীয় সনেটের ক্লাসিক-ঝোঁকেরও প্রভাব আছে বলে মনে হয় (মিল্টনের সনেট শুনে ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ সনেট রচনা করতে অনুপ্রাণিত হন, তাঁর নিজের এই স্বীকারোক্তি এখানে স্মর্তব্য)। আসল কথা, লিরিকটির মনোভাব নিয়ে কবি সনেটটি রচনা করেন নি ; তাতে একটা আলাদা মন ও মেজাজের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

সুতরাং একথা স্বীকার্য যে, একটা ক্লাসিকধর্মী মানস-চেতনা ছাড়া বিশুদ্ধ বা সার্থক সনেট রচনার কৃতিত্ব অর্জন করা খুবই শক্ত। সেই ক্লাসিক-চেতনা কোনো কবি-মনের সর্বকালীন মৌলধর্ম যেমন হতে পারে, তেমনি তা কবি-মনের সৃজন-মুহূর্তের ধর্মও হতে পারে। মিল্টনের মতো এমন অনেক কবি আছেন যাঁদের মনের গড়নটাই হচ্ছে ক্লাসিক চেতনাবিশিষ্ট ; আর সে কারণেই তাঁদের মনোধর্ম স্বাভাবিকভাবেই সনেটের ভাব ও রূপের সংহত গাম্ভীর্যের অনুকূল। আবার এমন কবিও আছেন যাঁদের মানস-সত্তা পরিবর্তনশীল এবং সে-কারণেই তাঁরা একই সময়ে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। সুতরাং একথা বলা চলে না যে, তাঁদের মনের গড়নটাই হচ্ছে ক্লাসিকধর্মী। তবু যদি তাঁরা সনেট রচনায় ব্রতী হন এবং সাফল্য লাভ করেন, তবে বুঝতে হবে, অন্য সময় যা-ই হোক না কেন, সনেট রচনার কালে তাঁদের কবি-মনের তাৎক্ষণিক বৈশিষ্ট্য নিশ্চয়ই ঐ জাতীয় কবিতার অনুকূল ছিল।

অর্থাৎ সেক্ষেত্রে ক্লাসিক-চেতনা কবির সর্বকালীন না হলেও সৃজন-মুহূর্তের সম্পদ্।

সনেটের সৃষ্টির ক্ষেত্রে কবি-মনের ক্লাসিক-চেতনার কথাটা যেমন উল্লেখ-যোগ্য, তেমনি উল্লেখযোগ্য তার ক্লাসিক পটভূমি। 'সনেটের আগম-নির্গমের মধ্যে যে নাটকীয়তা বিদ্যমান বা তার সংগঠনে যে সংহত গাম্ভীর্য, মহাকাব্য এবং নাটকের সঙ্গে তা মর্মবন্ধনে সম্বদ্ধ। তাই পেত্রার্কের পটভূমিতে আছেন দান্তে, সেক্সপীয়ারের সনেটের ওপর নাটকের চন্দ্রাতপ বিকীর্ণ, মিল্টন একাধারে নব মহাকাব্যকার ও সনেট রচয়িতা, জেরার্ড ম্যান্লি হপকিন্স ক্যাথলিক মননে ও ভাবসংহতিতে সুনিয়ন্ত্রিত মিল্টনিক।' এর ব্যতিক্রমের উদাহরণও অনেক আছে, তবু কয়েকজন স্বনামধন্য সনেটকারের ক্ষেত্রে যে ক্লাসিক পটভূমি দেখা যায়, তার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

তৃতীয়তঃ, সনেটে রীতিভেদে রসাভিব্যক্তির তারতম্য ঘটতে পারে, কবি-স্বভাব অনুযায়ী ভাব ও রূপের প্রকাশ স্থূল-সূক্ষ্ম হতে পারে; কিন্তু কোনো অবস্থাতেই শৈথিল্যের প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নয়, পরিমিত কথায় গভীর ভাব-প্রকাশের দাবি থেকে তার নিস্তার নেই। বোধ হয়, শৈথিল্যের সম্ভাবনা পরিহার ও সংযমের বন্ধন দৃঢ় করার জন্যই সনেটকারগণ এমন দৈর্ঘ্যের কবিতা রচনা করেন যা ভাবপ্রবাহিণী গীতিকবিতার মতো অনির্দিষ্টপরিসর না হয়। অন্য দিকে ভাবের দীপ্তি ও স্ফূর্তি, স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল প্রকাশ অভীপ্সিত বলেই তাঁরা চুটকির মতো অস্বচ্ছ অল্পায়তন কবিতাও রচনা করেন না। এই দু'দিক থেকেই চোদ্দ চরণ উপযুক্ত বলে বিবেচিত। যদিও 'সনেট' শব্দটি শুধুমাত্র ক্ষুদ্রার্থবাচক এবং তা থেকে চরণ-সংখ্যার কোনো নির্দেশ পাওয়া যায় না, তথাপি আদি যুগ থেকে সনেট যে চোদ্দ চরণের আশ্রয়ে বিবর্তিত হয়েছে তার একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে। তাছাড়া চরণ-সংখ্যা যদি বাড়ানো বা কমানো হয়, তবে পেত্রার্কীয় বা সেক্সপীরীয় সনেটের যে সাংগঠনিক বিশেষত্ব রয়েছে (সে-বিষয়ে পূর্বে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি) তা আর বজায় থাকবে না। এই সমস্ত কারণে চোদ্দ চরণকেই সনেটের দৈর্ঘ্যগত অপরিবর্তনীয় পরিমাপ হিসেবে গ্রহণ করা উচিত।[৪] অন্যথায় সনেটের বিশিষ্ট পরিচয়টি নষ্ট হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

৪. মেরিডিথ ষোল চরণের তথাকথিত সনেট লিখেছেন। সাম্প্রতিক কালে

চতুর্থতঃ, সনেটের রূপ ও রীতির যে কাঠিন্য বা শাসন তার দ্বারা ভাবের লিরিক-প্রেরণাকে আটকে রাখার ফলে সনেটের কলাকীর্তি একটা বিশেষ দীপ্তি ও স্ফূর্তি লাভ করে। কিন্তু সেই দীপ্তি ও স্ফূর্তি কখনওই সম্ভব নয়, যদি না রূপ ও ভাবের সম্বন্ধ সঙ্গত ও সুন্দর হয়। তাই সার্থক সনেট মাত্রেই (অন্যান্য সার্থক সাহিত্যের মতো) আধারের সঙ্গে আধেয়ের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বলা চলে। যে সমস্ত সনেটে organic form রয়েছে, কেবল সেখানেই যে ভাব ও রূপের হরগৌরী-মিলন দেখতে পাওয়া যায় তা নয়, যেখানে কবি আগে সজ্ঞানভাবে সনেটের রূপ-নির্বাচন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন এবং পরে ভাব 'পতিগতপ্রাণা সতীর মতো' সেই রূপের অঙ্গে অঙ্গে মিলন খোঁজে (অর্থাৎ যেখানে abstract form রয়েছে) সেখানেও কবি-প্রতিভার মায়ায় শেষ পর্যন্ত ভাব ও রূপের সম্বন্ধ সুন্দর ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে উঠতে পারে। আর সেই সব ক্ষেত্রে ভাবচেতনা ও রূপসাধনার মধ্যে কোনো ব্যবধান থাকে না। কিন্তু সনেটের বিশেষত্ব এই যে, তার রূপটি হচ্ছে নির্দিষ্ট (সাধারণ গীতিকবিতার সঙ্গে এখানেই তার পার্থক্য) এবং সেই নির্দিষ্ট রূপটির সঙ্গে ভাবের মিলন ঘটেছে কিনা সেটা লক্ষ্য করা দরকার। যেহেতু এই জাতীয় কবিতায় ভাব ও রূপের সম্বন্ধ বিচারের ক্ষেত্রে রূপের নির্দিষ্টতার কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখতে হয়, সেই জন্যই কেউ কেউ মনে করেন যে, সনেটে রূপের প্রসাধন কবি-প্রযত্নের প্রধান কথা। কেউ বা আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন, সনেটে টেকনিকটাই হচ্ছে আসল এবং ভাব সেই টেকনিকের কাঠামোর ওপর মাটির প্রলেপ ও সৌন্দর্যের রঙ ছড়িয়ে দেয় মাত্র। সনেটের ক্ষেত্রে রূপ ও রীতির ওপর এইভাবে অতিরিক্ত জোর দেওয়ার আরেকটা কারণ হচ্ছে এই যে, যেখানে রূপ আছে অথচ ভাব অপরিস্ফুট সেখানে রচনা কবিতা হিসেবে মর্যাদা পায় না, কিন্তু যেখানে সনেটের রূপ আছে অথচ ভাব অকিঞ্চিৎকর বা অপরিস্ফুট—এক কথায় কবিত্বের অভাব আছে, সেখানে অনেক সময় কবিতাকে বহিরঙ্গ বিচারেই সনেটের মর্যাদা দেওয়া হয়ে থাকে। আমার

বাঙলা ভাষায়ও বার বা তের বা পনের চরণের কবিতাকে সনেট নামে অভিহিত করার চেষ্টা দেখা যায়। সনেটের দৈর্ঘ্য নিয়ে এই সমস্তই খেয়ালী পরীক্ষা মাত্র। সনেট কেন চতুর্দশপদী, সে-সম্পর্কে আলোচনা প্রমথ চৌধুরীর 'নানা-কথা' গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।

মনে হয়, সনেটের ফর্মকে এমনভাবে বড় করে দেখার কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ এই ধরনের কবিতায় ভাব ও রূপের মিলনের অর্থ নিঃসন্দেহে বিশেষ প্রকৃতির ভাবের সঙ্গে নির্দিষ্ট রূপের মিলন। আর তাই ফর্মটাকে আলাদাভাবে গুরুত্ব দেওয়া অনুচিত এবং তা করতে গেলে কবিত্বের দিকটা ছোট হয়ে পড়ে। তবে যেখানে নিখুঁত ফর্ম থাকলেও কবিত্বের অভাব আছে, সেখানে কবিতাকে নিকৃষ্ট শ্রেণীর সনেট আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

পঞ্চমতঃ, সনেটের ছন্দ-মিলের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যেতে পারে। পূর্বে আমরা দেখেছি, এই জাতীয় কবিতায় একটা বিশেষ গুরুগম্ভীর সুর থাকে, হাল্‌কা চাল বা লঘু ঢঙ তার পক্ষে অনুপযুক্ত। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই ইতালীয় সনেটে একটা বিশেষ ছন্দ গড়ে তোলা হয়েছে, ইংরেজী কাব্যে আয়াম্বিক পেণ্টামিটারকে শেষ পর্যন্ত সনেটের ছন্দ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। লঘুরীতি বা নৃত্যচপল ছন্দ সনেটের গুরুগম্ভীর সাঙ্গীতিকতার অনুকূল নয়। অন্য দিকে সনেটে নির্দিষ্ট মিলের পরিকল্পনার পশ্চাতে একটি যুক্তি থাকে। তা নিতান্তই কবিদের খেয়ালী পরিকল্পনা নয়। এক এক জাতীয় সনেটে যে এক এক ঢঙে এক এক ভাবরসের সাধনা থাকে এবং তাদের মিলের পদ্ধতিও হয় ভিন্ন ভিন্ন, তা আগে ইতালীয়, সেক্সপীরীয় ও ফরাসী সনেটের প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। সেখানে আরও দেখেছি যে, এক এক প্রকার চিন্তা-এককের (thought-unit) সঙ্গে এক এক প্রকার মিল-রীতির (rhyme-system) ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রয়েছে। অধিকন্তু মিল-ধ্বনি যাতে ভাবের গভীর ও গম্ভীর ধ্বনিকে বিশৃঙ্খল করে না দেয়, তার জন্যও একটি সুনিয়মিত মিলের পদ্ধতি সনেটে অনুসরণ করা হয়। তাছাড়া সনেটে একটা সুষম ছন্দ-ধ্বনি অনুরণিত হয় বলে বহুবিচিত্র মিল বা একই ধরনের মিল বর্জনীয়। মিলের অসামঞ্জস্য বা নামমাত্র মিলও অনুপযুক্ত, কারণ তা ভাবকে ঘনীভূত করতে বা ভাবের বিভিন্ন অঙ্গকে সম্বদ্ধ করতে সাহায্য করে না। আবার কারো কারো মতে, যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিল বা feminine rhyme কবির অক্ষমতারই পরিচায়ক। সনেটে যে বিশেষ ছন্দ-ধ্বনি ও ভাব-সৌন্দর্য প্রত্যাশিত, তা এই ধরনের মিলের মধ্যে অভিব্যক্ত হয় না। আমার মনে হয়, এ-কথার মধ্যে যুক্তি আছে। প্রমথ চৌধুরীর সনেটে যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিলের আধিক্য দেখতে পাই—আচার্য-শিরোধার্য-আর্য-উচ্চার্য ('ভাস'), ধন্য-পণ্য-নগণ্য-সৈন্য ('ধুতুরার ফুল'), বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-

প্রাণান্ত-একান্ত ('বিশ্ব-ব্যাকরণ') সজ্জা-শয্যা-লজ্জা ('রোগ-শয্যা'), কুরঙ্গ-নারঙ্গ-তরঙ্গ-সারঙ্গ ('পাষাণী'), ক্ষুদ্র-রৌদ্র-সমুদ্র-রুদ্র ('সনেট-সুন্দরী') ইত্যাদি। সত্য বটে, শব্দের ধ্বনি-মাধুর্য যাতে তন্দ্রাচ্ছন্নতার আবহাওয়া সৃষ্টি না করে, সনেটের সজাগ ভাবটা যাতে বজায় থাকে, সেজন্যই প্রমথ চৌধুরী যুক্তব্যঞ্জন-মূলক মিল বেশী ব্যবহার করেছেন। তবু মনে হয়, তাতে তাঁর সনেটের বিশেষ ছন্দ-ধ্বনি ক্ষুণ্ণ হয়েছে, যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিল অনেকটা আঘাতের ধ্বনির মতো শোনায় বলে তাঁর সনেটের ভাবের আবেদনও কতকটা নষ্ট হয়েছে। সুতরাং ভালো সনেটে feminine rhyme-এর সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়াই সঙ্গত।

সনেটের মিল সম্পর্কে উপরে যে কথাগুলি বলা হল, তা মনে থাকলে মিলহীন সনেট রচনার চেষ্টাকে কিছুতেই সমর্থন করা যায় না। সনেটের মিলের কাজ প্রধানতঃ দুটি—(১) তা বিভিন্ন চরণকে এক সূত্রে গ্রথিত করে সনেটের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে প্রয়োজন মতো চতুষ্ক, ত্রিক ও যুগ্মক সৃষ্টি করে। এইভাবে যে সাংগঠনিক একক (structural unit) সৃষ্টি হয় তার সঙ্গে চিন্তা বা ভাবের একক মিলে যায় বলে ভাব ও রূপের দিক থেকে এককটি অতিরিক্ত শক্তি লাভ করে। (২) একটা বিশেষ ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টিতে মিল সহায়তা করে। অতএব এ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে, মিল হচ্ছে সনেটের ক্ষেত্রে 'literary constant' এবং সে-কারণেই মিলবর্জিত হলে সনেট তার বিশেষ পরিচয় নিয়ে দাঁড়াতে পারে না।[৫] অন্য দিকে মিত্রাক্ষর পয়ারের (অর্থাৎ সাতটি যুগ্মকের) দ্বারাও যথার্থ সনেট গঠন করা যায় না। কারণ সে-ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি সাংগঠনিক একক ও ভাবগত একক মাত্র দুটি চরণকে নিয়ে গড়ে উঠবে এবং সমগ্র কবিতা সাতটি ভগ্নাংশে বিভক্ত হয়ে পড়বে। ফলে প্রয়োজনমতো চতুষ্ক বা ত্রিকের ব্যবহার অনিশ্চিত হয়ে যাবে এবং পেত্রার্কীয়, সেক্সপীয়রীয় ও ফরাসী

৫. খৃষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ইতালীয় কাব্যে যে মিলের আবির্ভাব ও প্রতিষ্ঠা ঘটল, তার সঙ্গে সনেটের মিলের আদর্শ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। একটা ছন্দ-মিলের দ্বারা রূপ পরিগ্রহ করে সনেট যেন দেখিয়ে দিল—'The manifold possibilities of the rhymed stanza represent a whole new system of forms.' সুতরাং ঐতিহাসিক দিক থেকেও সনেটের সঙ্গে মিলের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে।

সনেটের কলারীতির প্রতি সুবিচার করা হবে না।[৬] অন্য দিকে একটানা পয়ার-মিল থাকলে সনেটে যে সুষম ও অখণ্ড ছন্দ-সঙ্গীত প্রত্যাশিত, তা গূঢ় ও গভীর হয়ে ওঠে না। যেমন হয় দূরান্তরিত মিলের ক্ষেত্রে। আর সে-কারণেই সনেটের ক্ষেত্রে আগাগোড়া মিত্রাক্ষর ব্যবহার অসঙ্গত।

৬. একটানা পয়ারী ছন্দ-মিলে একটানা ভাবের কবিতা চোদ্দ চরণে রচিত হলেও সনেটপদবাচ্য নয়। এ-সম্বন্ধে আলোচনা পঞ্চম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

২। আধুনিক-পূর্ব বাঙলা কাব্যে চতুর্দশপদী কবিতা

প্রাচীন বাঙলা পদগীতির কোনো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্য ছিল না। চর্যাগীতি থেকে কবিগান পর্যন্ত প্রাচীন পদগীতির যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, তার দিকে দৃষ্টি দিলে নানা দৈর্ঘ্যের খণ্ডকবিতা চোখে পড়ে। সেকালের কবি-সাধকেরা ভাব-প্রকাশের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পদগীতির রূপাবয়ব নির্মাণ করেছেন, তাকে প্রয়োজন-নিরপেক্ষভাবে কোনো নির্দিষ্ট চরণ-সংখ্যার মধ্যে সীমায়িত করে রাখার চেষ্টা করেন নি। তাই আমরা প্রাচীন পদগীতিতে যেমন ছয়, আট, দশ, বারো, ষোল, আঠারো ইত্যাদি চরণ-সংখ্যা দেখতে পাই, তেমনি দেখতে পাই চোদ্দ চরণের সমাবেশ। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এই সব চোদ্দ চরণের পদগীতির মধ্যে সনেটের কোনো লক্ষণ দেখতে পাওয়া যায় কিনা।

চর্যাপদে যে তিনটি চোদ্দ চরণের পদ আছে (১০, ২৮ ও ৫০ সংখ্যক) তার মধ্যে একটি হচ্ছে এই—

গঅণত গঅণত তইলা বাড়ী হেঞ্চে কুরাড়ী।
কণ্ঠে নৈরামণি বালি জাগন্তে উপাড়ী॥
ছাড়ু ছাড় মাআ মোহা বিষম দুন্দোলী।
মহাসুহে বিলসন্তি শবরো লইআ সুণ-মেহেলী॥
হেরি সে মোর তইলা বাড়ী খসমে সমতুলা।
সুকড়এ সে রে কপাসু ফুটিলা॥
তইলা বাড়ির পাসেঁর জোহ্না বাড়ী উএলা।
ফিটেলি অন্ধারি রে আকাশ-ফুলিআ॥
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে শবরশবরী মাতেলা।
অণুদিন শবরো কিম্পি ন চেবই মহাসুহেঁ ভোলা॥
চারিবাসে গড়িলারে দিআ চঞ্চালী।
তহিঁ তোলি শবরো ডাহ কএলা কান্দই সগুণশিআলী॥
মারিল ভবমত্তারে দহদিহে দিধলী বলী।
হের সে সবর নিরেবণ ভইলা ফিটিল ষবরালী॥

—৫০ নং পদ।

পদটির মর্মার্থ হচ্ছে—'তৃতীয় শূন্যে[১] লগ্ন বাড়ি চতুর্থ শূন্যরূপ[১] হৃদয়-কুঠারে ছেদন করার পর যে যোগী নৈরাত্মাকে[১] কণ্ঠে ধারণ করে জাগ্রত থাকেন, কায়-বাক্-চিত্ত তাঁর আয়ত্তের মধ্যে। অতএব যোগীর পক্ষে তুচ্ছ মায়ামোহের দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ করা সঙ্গত। চিত্তরূপ শবর এই সব পরিত্যাগ করে শূন্যতা-মেয়েকে (অর্থাৎ নৈরাত্মাকে) কণ্ঠে ধারণ করে মহাসুখে বিলাস করছে। তৃতীয় শূন্যে অবস্থিত শবরের বাড়ি যখন চতুর্থ শূন্যতুল্য হল, তখন তার বাড়িতে মহাসুখরূপ কার্পাস ফুল ফুটে উঠল, জ্ঞান-জ্যোৎস্নার উদয়ে অজ্ঞানের অন্ধকার আকাশ-কুসুমের মতো দূর হয়ে গেল। মহাসুখরূপ কঙ্গুচিনা ফল পাকল, শবর-শবরী আনন্দে মত্ত হল; দিনের পর দিন শবরের আর কোন চেতনা রইল না। এইভাবে চঞ্চল ইন্দ্রিয়াদি বন্ধন করে শবর চতুর্থ আবাস গঠন করায় ও সেখানে ভবমত্ততাকে তুলে দিয়ে দগ্ধ করায় বিষয়-বাসনারূপ সগুণ-শিয়ালী কাঁদতে লাগল। ভবমত্ততা দশদিকে বলি দেওয়া হলে শবর নির্মূল হল অর্থাৎ তার নির্বাণ ঘটল।'

এই পদটির মধ্যে ইন্দ্রিয়াদির বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে নির্বাণ লাভের কথা আগাগোড়া পয়ার-মিলে রচিত। ভাব-প্রকাশের ভঙ্গির মধ্যে কোনো শিল্প-কৌশল নেই। সিদ্ধাচার্যগণের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতিতে সন্ধা ভাষায় গুহ্য ধর্মমতটিকে বিবৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে চোদ্দ চরণের পরিমাপ ছাড়া সনেটের আর কোনো আঙ্গিকের সন্ধান পাওয়া যায় না।

বৈষ্ণব সাহিত্যেও চোদ্দ চরণের অনেক পদ পাওয়া যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীর বিদ্যাপতি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবদাস পর্যন্ত বহু কবি সেই সব পদ লিখেছেন। আলোচনার সুবিধার জন্য সেই সব পদ থেকে কয়েকটি বেছে নিচ্ছি।

বিদ্যাপতির একটি সুপরিচিত পদ হচ্ছে—'রয়নি ছোট অতি ভীরু রমণী।' পদটিতে কবি বলতে চেয়েছেন—'রজনী ছোট, রমণী অতিশয় ভীরু। কতক্ষণে সেই গজগামিনী আসবে? একে তো পথে কত ভয়ঙ্কর সাপ রয়েছে, আরও কত সঙ্কট রয়েছে, আবার তার চরণ দুখানি কোমল। হে বিধাতা, তোমার পায়ে মিনতি জানাচ্ছি, নির্বিঘ্নে যেন সুন্দরী অভিসার করতে পারে। আকাশ

১. শব্দগুলির তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু রচিত 'চর্যাপদে'র ২৩১-২৩৫ পৃষ্ঠায়।

মেঘাচ্ছন্ন, পৃথিবী কর্দমাক্ত, বিঘ্ন চারদিকে যেন ছড়িয়ে আছে। দশদিক ঘন অন্ধকার, চলতে গেলে পা পিছলে যায়, পথ দেখা যায় না। সে কি এসব ভুলে গেল? এত সত্ত্বেও যদি সে আসে তবে বলতে হবে সে মিলনের উৎকণ্ঠায় চঞ্চলা হয়েছে বা মিলনের জন্য লোভার্ত হয়েছে। বিদ্যাপতি কবি বলেন যে কুলবতী প্রেমের প্রভাব সহ্য করছেন।'[২] এখানে কতকটা নাটকীয় ভঙ্গিতে ('কতক্ষণে সেই গজগামিনী আসবে?' 'সে কি এসব ভুলে গেল?' ইত্যাদি বাক্য লক্ষণীয়।) রাধার অভিসারের প্রসঙ্গ বিবৃত হয়েছে। তবে বক্তব্য প্রকাশের ভঙ্গির মধ্যে স্থানবিশেষে নাটকীয়তা সত্ত্বেও কবিতার ভাববস্তু অখণ্ড ও একমুখিন্। পরিণামে ভাবের এই অখণ্ডতা সনেটের একটা বৈশিষ্ট্য, সন্দেহ নেই; কিন্তু পেত্রার্কীয় সনেটসুলভ দ্বিধাবিভক্ত কিংবা সেক্সপীয়ারের সনেটের মতো চতুরঙ্গ গঠনরীতি কবিতাটির মধ্যে নেই। মিল-বিন্যাসও বৈশিষ্ট্যহীন গতানুগতিক মিত্রাক্ষর মাত্র। সুতরাং এটিকে সনেট নামে অভিহিত করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই।

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চোদ্দ চরণের কবিতার অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে বলরাম দাসের নিম্নলিখিত পদটি—

> দুখিনীর বেথিত বন্ধু শুন দুঃখের কথা।
> কাহারে মরম কব কে জানিবে বেথা॥
> কান্দিতে না পাই পাপ ননদীর তাপে।
> আঁখির লোর দেখি কহে কান্দে বন্ধুর ভাবে॥
> বসনে মুছিয়া ধারা ঢাকি যদি গায়।
> আন ছল ধরি গুরুজনেরে দেখায়॥
> কালা নাম লৈতে না দেয় দারুণ শাশুড়ী।
> কাল হার কাড়িয়া লয় কাল পাটের শাড়ী॥
> দুখের উপরে বন্ধু অধিক আর দুখ।
> দেখিতে না পাই বন্ধু তোমার চাঁদ মুখ॥

২. এই আধুনিক গদ্য-টীকা বিমানবিহারী মজুমদার কৃত। তবে সাধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদকে চলিত সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছে।

দেখা দিয়া যাইতে বন্ধু কিবা ধন লাগে।
না যায় নিলজ প্রাণ দাঁড়াই তোমার আগে॥
বলরাম দাস বলে হউক খেয়াতি।
জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি॥

এই আক্ষেপানুরাগের পদটিতে রাধার মর্মদাহের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সেই মর্মদাহের কারণ দ্বিমুখী—একদিকে শাশুড়ী ও ননদিনীর গঞ্জনা, অন্য দিকে কৃষ্ণের অদর্শন। প্রথম আট চরণে আছে গঞ্জনার প্রসঙ্গটি, শেষের ছয় চরণে আছে অদর্শনের কথাটি। কৃষ্ণের অদর্শনের প্রসঙ্গে বলরাম দাসের চরম উক্তি হচ্ছে—'জিতে পাসরিতে নারি তোমার পিরিতি' এবং এই উক্তিটির মধ্যেই আক্ষেপানুরাগের ভাব-সুষমা নিটোল রূপ পরিগ্রহ করেছে। পদটির মধ্যে এই যে ভাবগত বিভাজন লক্ষ্য করা যায়, তা খুবই চমকপ্রদ ও সনেটসন্নিভ, সন্দেহ নেই। তবু এটিকে সনেট জাতীয় কবিতা বলা যায় না। তার কারণ এই যে, পদটিতে আট চরণের শেষে যে ভাবগত আবর্তন রয়েছে, তা কোনো পূর্ব-পরিকল্পনাসম্ভূত নয় এবং নিতান্তই আকস্মিক। বৈষ্ণব পদাবলীতে এই ধরনের ভাব-বিভাজনের প্রয়াস অত্যন্ত বিরল এবং যেখানে তা রয়েছে সেখানেও আট চরণের শেষে তা দেখানোর রীতি নির্দিষ্টভাবে অনুসৃত হয় নি। অন্য দিকে সনেটের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য পূর্বের পদটির মতো এই পদটিতেও অনুপস্থিত।

সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব-কবি রাধাবল্লভদাস প্রেমবৈচিত্ত্য নিয়ে যে সমস্ত পদ রচনা করেছেন, তার মধ্যে একটি হচ্ছে—

ধনি-কোরে বিনোদ নাগবর ভুলল।
রোয়ত নীর বয়ন বহি গেলা॥
কোরে আকুল ভই মুরছিত ভেল।
সহচরিগণ কর বয়নহি দেল॥
শ্বাস-হীন হেরি সবহুঁ বিভোর।
রোয়ত ধনি তব শ্যাম করি কোর॥
এক সখি যুগতি করল অনুপাম।
শ্রবণে কহই তব রাধা নাম॥
বহুখণে শ্রবণে পৈঠল সেই বোল।
রাই রাই করি উঠল তনু মোড়॥

রোই রোই সুবদনি পরিচয় দেল।
কোরে কয়ল সব দুখ দূর গেল॥
বৈঠল নাহ রাই বাম পাশ।
হেরি চমকিত রাধাবল্লভ দাস॥

মিত্রাক্ষর পয়ারে লিখিত এই পদটিতে চোদ্দচরণ আছে বটে, কিন্তু সনেটের আর কোনো লক্ষণ বিদ্যমান নেই। চতুর্দশপদী কবিতা হিসেবে এর কোনো রূপরসবিশিষ্টতা আছে বলে মনে হয় না। এক প্রকারের ভাবগত পরিবর্তন ষষ্ঠ চরণের পর ঘটেছে, কিন্তু কোনো সাংগঠনিক পরিকল্পনা অনুযায়ী সেই পরিবর্তন দেখা দেয় নি।

চোদ্দচরণের বৈষ্ণবপদ সম্বন্ধে যে সব কথা বলা হল, তা সমদৈর্ঘ্যের শাক্তপদ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। একথা সর্ববাদীসম্মত যে, পূর্ববর্তী বৈষ্ণবপদের আদর্শেই পরবর্তীকালের শাক্তপদের আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং সে-কারণেই শিল্প-কৌশলের দিক থেকে তার মধ্যে কোনো অভিনবত্ব নেই। উদাহরণ হিসাবে কমলাকান্তের একটি পদ উদ্ধৃত করছি—

বারে বারে কহ রাণি, গৌরী আনিবারে।
জান তো জামাতার রীত অশেষ প্রকারে॥
বরঞ্চ ত্যজিয়ে মণি ক্ষণেক বাঁচয়ে ফণী;
ততোধিক শূলপাণি ভাবে উমা-মারে।
তিলে না দেখিলে মরে, সদা রাখে হৃদি'-পরে।
সে কেন পাঠাবে তাঁরে সরল অন্তরে॥
রাখি অমরের মান হরের গরল-পান,
দারুণ বিষের জ্বালা না সহে শরীরে।
উমার অঙ্গের ছায়া শীতলে শঙ্কর-কায়া;
সে অবধি শিব-জায়া বিচ্ছেদ না করে।
অবলা অল্পমতি, না জান কার্যের গতি,
যাব, কিছু না কহিব দেব দিগম্বরে।
কমলাকান্তেরে কহ, তারে মোর সঙ্গে দেহ;
তার মা বটে, জানায়ে যদি আনিবারে পারে॥

কোনো কোনো চরণের দৈর্ঘ্য-বিস্তৃতি ছাড়া (তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম, একাদশ ও ত্রয়োদশ চরণ অন্যান্য চরণ অপেক্ষা দীর্ঘতর) এ-পদটির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য আর কিছু নেই। পেত্রার্কীয় বা সেক্সপীরীয় সনেটের কাব্যমণ্ডল থেকে এর অবস্থিতি অনেক দূরে।

সুতরাং একথা বলা অন্যায় হবে না যে, আধুনিক-পূর্ব বাঙলা কাব্যে চতুর্দশপদী কবিতা ছিল বটে, কিন্তু সেই কবিতাগুলির বিশেষ কোনো চারিত্র ছিল না এবং পাশ্চাত্ত্য সনেটের সঙ্গে তাদের দৈর্ঘ্য ছাড়া আর কোনো দিক থেকে মিলও নেই। চোদ্দ চরণের পরিসরের মধ্যে একটা ভাবকে মোটামুটিভাবে প্রকাশ করার যোগ্যতা আমাদের সেকালের কবিরা দেখাতে পারলেও এক আশ্চর্য শিল্প-কৌশলের সাহায্যে সেই কবিতাগুলিকে তাঁরা রূপ-রসবিশিষ্ট করে তুলতে পারেন নি। তাঁরা শিল্প-সচেতন কবি ছিলেন না বলে তাঁদের কাছে তা আশা করাও যায় না।

কিন্তু আধুনিক-পূর্ব বাঙলা কাব্যে চতুর্দশপদী কবিতার অস্তিত্ব থাকায় কোনো কোনো সমালোচক মধুসূদনকে চতুর্দশপদী কবিতার প্রবর্তক বলে স্বীকার করতে চান নি। এ-সম্বন্ধে 'চর্যাপদের' ভূমিকায় অধ্যাপক মণীন্দ্রমোহন বসু মন্তব্য করেছেন—'মাইকেল এদেশে সর্বপ্রথম চতুর্দশপদী কবিতা রচনার রীতি প্রবর্তন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি রহিয়াছে। একটু অনুধাবন করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই যুক্তিহীন। তাঁহার পূর্বে কি এদেশে কোন কবিতাই রচিত হয় নাই? বৈষ্ণব-পদাবলী সাহিত্যে চৌদ্দপদী কবিতার অভাব নাই, অতএব স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, এই জাতীয় কবিতার প্রবর্তক হিসাবে মাইকেলকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। · বাঙ্গালা ভাষাতেও অতি প্রাচীনকাল হইতে চতুর্দশ-পদে কবিতা-রচনার ধারা চলিয়া আসিতেছিল। ইহার প্রাচীনতম রূপের সন্ধান ১০ম ও ৫০শ চর্যায় পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব-কবিগণ এই জাতীয় বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার প্রধান বিশেষত্ব এই যে পয়ারের ন্যায় প্রতি দুই চরণে মিল থাকে। রবীন্দ্রনাথও অনেক চৌদ্দপদী কবিতা রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের অধিকাংশই আমাদের প্রাচীন প্রথায় রচিত হইয়াছে। অতএব আমাদের নিজস্ব চৌদ্দপদী কবিতা রচনার নিদর্শন আমরা চর্যাপদে পাইতেছি।' দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক বসুর মতে (১) আমাদের নিজস্ব চৌদ্দপদী কবিতা রচনার প্রাচীন নিদর্শন রয়েছে; (২) সেই সব প্রাচীন চৌদ্দপদী কবিতায় পয়ারের মতো প্রতি দুই চরণে মিল দেখা যায়; (৩) অতএব, মধুসূদনকে বাঙলা সাহিত্যে চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম প্রবর্তক বলা যায় না। আমার মনে হয়, পয়ার-

মিলের সাধারণ চোদ্দপদী কবিতা সম্বন্ধে অধ্যাপক বসুর এই মত সর্বতোভাবে গ্রহণযোগ্য।

কিন্তু চতুর্দশপদী কবিতার অর্থ সনেট ধরলে অধ্যাপক বসুর মত গ্রহণ-যোগ্য নয়। বস্তুতঃপক্ষে মধুসূদন ইংরেজী সনেট অর্থেই চতুর্দশপদী কবিতা কথাটি ব্যবহার করেছিলেন,[৩] পয়ার-মিলের সাধারণ চোদ্দপদী কবিতা অর্থে নয়। এবং সে কারণেই মধুসূদন সনেটার্থক চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম প্রবর্তক বলে স্বীকৃত। অধ্যাপক বসুও সে-কথা জানেন, তাই মন্তব্য করেছেন—'কেহ হয়ত বলিবেন যে, চতুর্দশপদী কবিতা অর্থে ইংরাজী সনেট, অর্থাৎ বিদেশী মাল, যাহা স্বদেশী পোষাকে চালান হইয়াছে। তাহা হইলে টেবিল, চেয়ার যেমন বাঙ্গালা ভাষায় চলিয়া যাইতেছে, সেইরূপ সনেট শব্দ দ্বারা মাইকেলী কবিতা-গুলিকে চিহ্নিত করিলেই ইহার মূল প্রকৃতি সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে পারে।' অর্থাৎ চতুর্দশপদী নামে মধুসূদন সনেট লিখেছেন, এ কথা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের প্রাচীন চোদ্দপদী কবিতার মূল প্রকৃতির সঙ্গে মধুসূদনের চতুর্দশপদী কবিতার মূল প্রকৃতির যে পার্থক্য আছে, তা তিনিও পরোক্ষভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

সুতরাং সকল প্রকারের বিভ্রান্তি এড়াবার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত করা উচিত—(ক) আধুনিক-পূর্ব বাঙলা কাব্যে চতুর্দশপদী কবিতা ছিল, কিন্তু সনেট বা সনেট-সন্নিভ কবিতা ছিল না। (খ) মধুসূদন বাঙলা চতুর্দশপদী কবিতার প্রথম প্রবর্তক নন, তিনি প্রথম প্রবর্তক বাঙলা সনেটের।

৩. মধুসূদন যে পাশ্চাত্ত্য আদর্শ অনুসরণ করে চতুর্দশপদী লিখেছেন, তা চিঠিপত্রে ও উপক্রম-ভাগের একটি সনেটে ('ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন') তিনি নিজেই বলে গেছেন। এ-সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা 'মধুসূদন' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৩। বাঙলা দেশে ইংরেজী সনেটের চর্চা

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নব্যশিক্ষিত সমাজের কোনো কোনো ব্যক্তির সাহিত্য-চর্চার মুখ্য মাধ্যম ছিল ইংরেজী ভাষা। তার কারণ এই যে, তাদের সাহিত্যবোধ জাগ্রত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে যে পাঠক্রম বা পাঠ-পরিধি তা ছিল ইংরেজীসর্বস্ব; তাদের সঞ্জীবিত মানস ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই নূতন বিদ্যা ও সংবিৎ লাভ করেছিল। আর তাই সাহিত্যসৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁদের অনেকে ইংরেজী ভাষার শরণাপন্ন হয়েছিলেন। সেই ইংরেজী-শিক্ষিত-সম্প্রদায় বিশ্বাস করতেন না যে, বাঙলা ভাষায় কোনো উচ্চ স্তরের ভাব সুন্দরভাবে প্রকাশ করা যায়।[১] সেকালের 'এজুরাজ' রামগোপাল ঘোষ তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'গম্ভীর ভাবের রচনা' প্রকাশিত হতে দেখে কেন সবিস্ময় উল্লাস বোধ করেছিলেন, তা তাদের এই সাধারণ মনোভাবের কথা মনে রাখলে বুঝতে কষ্ট হয় না।

সেকালে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যা ও আদর্শ, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার পীঠস্থান ছিল হিন্দু কলেজ। নব্যশিক্ষিতসম্প্রদায় সৃষ্টিতে এই প্রতিষ্ঠানটির দান সর্বাধিক। এখানে যারা সাহিত্যব্রতের দীক্ষা নিয়েছিলেন, তাদের গুরু ছিলেন সাহিত্যের দু'জন প্রখ্যাত অধ্যাপক—ডিরোজিও[২] ও ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন। এঁদের মধ্যে প্রথম জন ছিলেন ভারতীয় (অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান), দ্বিতীয় জন ইংরেজ; তবে দু'জনেরই মাতৃভাষা ছিল ইংরেজী। শুধু সাহিত্যের অধ্যাপক হিসেবে নয়, কবি ও সমালোচক হিসেবেও তাঁদের খ্যাতি ছিল। তাঁরা সেক্সপীয়র, মিল্টন, পোপ, স্পেন্সার, ড্রাইডেন, গ্রে ইত্যাদির কাব্য ছাত্রদের পড়াতেন এবং সেই অধ্যাপনার সূত্রে নিশ্চয়ই বিভিন্ন রীতির

১. 'যাঁহারা ইংরেজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ; তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত অনেকেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না,...'—সংবাদ-প্রভাকর, ১লা বৈশাখ, ১৮৪৮।

২. ডিরোজিও সম্পর্কে বলতে গিয়ে এডওয়ার্ডস্ বলেছেন '...he fostered their (students') taste in literature.'

য়ুরোপীয় সনেটের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন। আর সনেট-সম্পর্কিত সেই অব্যবহিত জ্ঞান নিয়ে তাঁরা কিছু চতুর্দশপদীও রচনা করেছিলেন।

ভারতীয় কবিদের মধ্যে ডিরোজিওই প্রথম সনেট রচনা করেন। তাঁর কাব্যচর্চার ভাষা ইংরেজী হলেও তার বিষয়বস্তু ছিল প্রধানতঃ ভারতীয়। 'To India, My Native Land' কবিতায় ডিরোজিও স্বদেশের অতীত ঐতিহ্যে যে শ্রদ্ধা ও ভারতের মর্মবাণী উদ্ধারের যে অভীপ্সা প্রকাশ করেছেন, তা এই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবক-কবির পক্ষে প্রশংসার কথা। তাঁর কাব্য-সংকলনে[৩] সংগৃহীত সনেটগুলির মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত সনেটটি পাঠকসমাজে কতকটা পরিচিত।

The Harp of India

Why hang'st thou lonely on your withered bough ?	ক
Unstrung for ever, must thou there remain ;	খ
Thy music once so sweet—who hears it now ?	ক
Why doth the breeze sigh over thee in vain ?—	খ
Silence hath bound thee with her fatal chain ;	খ
Neglected, mute, and desolate art thou,	ক
Like ruined monument on desert plain :—	খ
O ! many a hand more worthy far than mine	ঘ
Once thy harmonious chords to sweetness gave,	গ
And many a wreath for them did Fame entwine	ঘ
Of flowers still blooming on the minstrel's grave :	গ
Those hands are cold—but if thy notes divine	ঘ
May be by mortal wakened once again,	খ
Harp of my country, let me strike the strain !	খ

—March, 1827.

এই সনেটটিতে যে দেশপ্রীতি, ঐতিহ্যপ্রাণতা ও সহৃদয়তা প্রকাশ পেয়েছে তা যেমন লক্ষণীয়, তেমনি লক্ষণীয় এর গঠনকর্ম। এখানে ডিরোজিওর আদর্শ সেক্সপীরীয় সনেট। কারণ এর মধ্যে পয়ারপুচ্ছ আছে, প্রথম বারো চরণে তিনটি

৩. দ্রষ্টব্য: The Poetical Works of Henry Louis Vivian Derozio, Edited by B. B. Shah, Vol. I, First Edition (1907).

স্বতন্ত্র চতুষ্ক গঠনের প্রয়াস আছে। পেত্রার্কীয় সনেটের মতো এখানে অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ নেই, বরং তিনটি চতুষ্কের বক্তব্যকে পয়ারপুচ্ছের মধ্যে উজ্জ্বল পরিসমাপ্তি দিয়ে একটা সাংগঠনিক চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করার উদাহরণ আছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও ডিরোজিও চতুষ্ক-সজ্জা ও মিল-বিন্যাসের ক্ষেত্রে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেখিয়েছেন। সেক্সপীয়ারের সনেটে সাতটি মিল থাকে, কিন্তু বর্তমান সনেটটিতে চারটি মাত্র মিল আছে। ফলে তিনটি চতুষ্কে পৃথক পৃথক মিল যোজনার সেক্সপীরীয় রীতি এখানে অক্ষুণ্ণ থাকে নি। দ্বিতীয়তঃ, সেই চারটি মিলের মধ্যেও দুটি মিলে (remain-vain, chain-plain, again-strain-এর 'খ' মিল এবং mine-entwine-divine-এর 'ঘ' মিল) কিছুটা ধ্বনিগত সমতা আছে। অথচ আমরা জানি, সনেটের মিলগুলি যদি নামমাত্র হয় এবং এক ধরনের মিলের সঙ্গে আরেক ধরনের মিলের পার্থক্য যদি সুস্পষ্ট না হয়, তবে তা একঘেয়ে হয়ে পড়ে এবং সনেটের ছন্দ-সঙ্গীত ক্ষুণ্ণ হয়। তৃতীয়তঃ, দ্বিতীয় চতুষ্কের দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে চতুর্থ চরণের মিল বজায় রাখা হয় নি। চতুর্থতঃ, কোনো কোনো চতুষ্কের চতুর্থ চরণের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই। আর তারই ফলে সংশ্লিষ্ট চতুষ্কগুলি স্বতন্ত্র একক হিসেবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি।

অতএব এই সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নয় যে, ডিরোজিওর এই সনেটটির আদর্শ সেক্সপীরীয় সনেট হলেও এর মধ্যে যথেষ্ট স্বাধীনতা বা শৈথিল্যের পরিচয় আছে।

১৮২৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ডিরোজিও 'Poetry' শীর্ষক একটি সনেট লেখেন। সনেটটির প্রথম চরণ হচ্ছে—'Sweet madness !—When the youthful brain is seized'। এর মিলসূচক শব্দগুলি হচ্ছে—

প্রথম চতুষ্ক : seized-loves-pleased-roves :
দ্বিতীয় চতুষ্ক : sea-mounts-Araby-founts ;
তৃতীয় চতুষ্ক : now-brow-dove-love,
পয়ারপুচ্ছ : fire-lyre.—

লক্ষণীয় এই যে, প্রথম চতুষ্ক ও পয়ারপুচ্ছের মিল-সজ্জা সুসঙ্গত হলেও দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুষ্কের মিল-সজ্জার মধ্যে ত্রুটি আছে। দ্বিতীয় চতুষ্কে কবি sea-এর সঙ্গে Araby-এর মিল দেখিয়েছেন, কিন্তু এ-মিল শুধু স্বরধ্বনির (sea-by)। কিন্তু প্রথম সিলেব্‌ল্‌-এ ব্যঞ্জনধ্বনি হচ্ছে s, দ্বিতীয় সিলেব্‌ল্‌-এ ব্যঞ্জনধ্বনি হচ্ছে b। মনে রাখতে হবে, স্বরধ্বনিসমেত ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনিসমেত

ব্যঞ্জনধ্বনির মিলই হচ্ছে উৎকৃষ্ট মিল। অন্য দিকে তৃতীয় চতুষ্কে পর পর দুই চরণে পয়ার-মিল আছে, শেক্সপীরীয় সনেটসম্মত একান্তর মিল নেই। ফলে এই চতুষ্কের সঙ্গে অন্য চতুষ্কগুলির সাংগঠনিক সাদৃশ্য বজায় থাকে নি।

এই ধরনের বা অন্য জাতীয় গঠন-শৈথিল্যের পরিচয় ডিরোজিওর রচিত আরও কয়েকটি সনেটে পাওয়া যায়। যেমন—

To The Dog Star

(April, 1927)

প্রথম চতুষ্ক : star-heaven-afar-even,

দ্বিতীয় চতুষ্ক : fly-wings-I-brings,

তৃতীয় চতুষ্ক : light-mind-bright-refined,

পয়ারপুচ্ছ : love-above.

এখানে fly-এর সঙ্গে I-এর মিল খুবই দুর্বল। 'I' শব্দটিকে মিলের ক্ষেত্রে ব্যবহার করার চেষ্টা কবির কৃতিত্বের পরিচায়ক নয়।

Romeo and Juliet

(Aprit, 1827)

প্রথম চতুষ্ক : then-night-when-delight.

দ্বিতীয় চতুষ্ক : ear-Cavalier-nigh-why

তৃতীয় চতুষ্ক : same-flame-fire-higher.

পয়ারপুচ্ছ : above-love.

এখানে দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুষ্কে পয়ার-মিল দেওয়া হয়েছে এবং তা যে-কোনো প্রকারের সনেটেরই আদর্শ-বিরোধী। তিনটি চতুষ্কেই চতুর্থ চরণের শেষে পূর্ণচ্ছেদ বা উপচ্ছেদ নেই; ফলে চতুষ্কগুলির গঠন সুবলয়িত হয় নি।

Sappho

(May, 1827)

প্রথম চতুষ্ক : storm-song-warm-wrong ;

দ্বিতীয় চতুষ্ক : received-harm-grieved-flow !

তৃতীয় চতুষ্ক : woe-dew-weep-flew,

পয়ারপুচ্ছ : deep-sleep.

বর্তমান সনেটটিতে মিলের ক্ষেত্রে খুবই অনাচার লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় চতুষ্কে 'harm'-এর একান্তর শব্দ 'flow' হওয়ায় মিলের অভাব ঘটেছে। তৃতীয় চতুষ্কে 'woe' ও 'weep' শব্দ-বিন্যাস সম্বন্ধেও সেই কথাই বলা যায়।

উপরি-উক্ত সনেটগুলির চেয়েও নিম্নোক্ত সনেটের মধ্যে অধিকতর গঠন-শৈথিল্য ও নিয়মের ব্যভিচার আছে।

Phyle

(No date)

প্রথম চতুষ্ক : brow-fame-name-thou,
দ্বিতীয় চতুষ্ক : light-deed-fight-freed :—
তৃতীয় চতুষ্ক : might-bleed-fire-star
পয়ারপুচ্ছ : desire-war.

এই সনেটের আদলটি যে সেক্সপীরীয় সনেটের, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে নবম থেকে দ্বাদশ চরণ পর্যন্ত যে চতুষ্কটি রয়েছে তা একেবারেই মিলহীন। এই মিলহীন চরণ-সন্নিবেশের ফলে সনেটটির ছন্দ-সঙ্গীত বিপর্যস্ত হয়ে গেছে।

আবার দেখা যায়, ডিরোজিরও কোনো কোনো সনেট আগাগোড়া মিত্রাক্ষর পয়ারে লিখিত। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে রচিত 'Morning after a storm' শীর্ষক সনেট-পরম্পরার অন্তর্গত দ্বিতীয় সনেট ('now-brow, delight-sight' ইত্যাদি) এবং হেনরি মেরিডিথ পার্কারের উদ্দেশে লিখিত দ্বাদশ সনেটের অন্তর্গত ষষ্ঠ (প্রথম চরণ : 'Dreams to the care-warm soul are kindly given') সনেট এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'To The Moon' কবিতাও পয়ার-মিলে লিখিত। এ-সব ক্ষেত্রে কবি শুধু সনেটের চোদ্দ চরণের পরিসরটুকু বজায় রেখেছেন, উপেক্ষা করেছেন ছন্দ-মিলের অন্যান্য নিয়ম।

এবার এমন তিনটি সনেটের কথা উল্লেখ করতে চাই যেখানে ফরাসী সনেটের মিলের পদ্ধতি কতকটা অনুসৃত।

To the Rising Moon

Why art thou blushing lady! art thou shamed
To show thy full, fair face? Behind you screen
Of trees which Nature has enrobed with green
Thou stand'st as one whose hidden sins are named;

Peeping the leafy crevices between,
Like Memory looking through the chinks of years
For some fair island-spot unsoiled by tears,—
Now thou'rt ascending, melancholy queen !

But the red rose has sickened on thy cheek,
And there thou wander'st sorrowful, and weak,

And heedless where thou'rt straying, sad and pale,
Like grief-struck maiden, who has heard revealed
To all the world that which she wished concealed—
Her trusting Love's, and hapless Frailty's tale.

এখানে মিলের পদ্ধতি হচ্ছে—কখখক, গঘঘগ, চচ, পফফপ। লক্ষণীয় এই যে, কবি নবম ও দশম চরণে পয়ার-মিল (চচ) যোজনা করেছেন। এই মিত্রাক্ষর মিল-যোজনা অবশ্যই ফরাসী সনেটের অনুরূপ রীতি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। ডিরোজিও এই বিশেষ ক্ষেত্রে সচেতনভাবে ফরাসী পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন কিনা, সে-সম্বন্ধে অবশ্য নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কবিতাটির অষ্টকে কখখক মিল সঙ্গত হলেও দুই চতুষ্কে ভিন্নতর মিলের উপস্থাপনা ফরাসী রীতিসম্মত নয়। এই ধরনের আরও দুটি সনেট হচ্ছে—'Yorick's Scull' ও 'To the Students of the Hindu College'।

ফরাসী সনেট পেত্রার্কীয় সনেটের ঈষৎ-পরিবর্তিত রূপ মাত্র। সেদিক থেকে দেখলে উপরি-উক্ত তিনটি সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ থাকাটা প্রত্যাশিত। 'To the Rising moon' কবিতায় নবম চরণ থেকে ভাবের যে কিছুটা বক্রায়ণ ঘটেছে, এটা নিঃসন্দেহ (নবম চরণ শুরু হয়েছে যে But শব্দ দিয়ে, তাতেই ভাবের মোড় ফেরার ইঙ্গিত আছে)। কিন্তু 'To The Students of the Hindu College' শীর্ষক সনেটে ভাবের একটানা জোয়ার দেখা দিয়েছে, জোয়ারের পর ভাঁটার টানের কোনো পরিচয় নেই (সনেটটির অষ্টম চরণের শেষে কোনো প্রকারের ছেদ-চিহ্ন নেই, আর তাতেই প্রমাণ হয় যে অষ্টকের ভাব ষট্‌কেও প্রবাহিত হয়েছে)। ফলে এই কবিতায় অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে। তবে এই তিনটি সনেটেই নবম-দশম চরণের পয়ারবন্ধ কবিতাগুলির গড়নের মধ্যে এনে দিয়েছে কতকটা শক্ত বাঁধুনি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ছন্দ-মিলের দিক থেকে পেত্রার্কীয় সনেটের লক্ষণাক্রান্ত একটি মাত্র সনেট ডিরোজিও

লিখেছেন—হেনরি মেরিডিথ পার্কারের উদ্দেশে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল লিখিত দ্বিতীয় সনেটটি। এর প্রতি চরণের মিলসূচক শব্দগুলি হচ্ছে—

প্রথম চতুষ্ক : men-doom-bloom-when

দ্বিতীয় চতুষ্ক : keen-gloom-tomb-den

প্রথম ত্রিক : began-harmony-be

দ্বিতীয় ত্রিক : done-won-reality

লক্ষ্য করা দরকার, এই সনেটটিরও দুটি ত্রিকের মিল-বিন্যাসের মধ্যে ত্রুটি আছে।

বিচ্ছিন্ন সনেটগুলি ছাড়া কিছু সনেট-পরম্পরাও (Sonnet-sequence) ডিরোজিও লিখেছেন। আমরা পূর্বে দেখেছি, সনেট-পরম্পরা লেখার রেওয়াজ সনেটের আদিযুগ থেকে চলে আসছে। এই শ্রেণীর কবিতাগুচ্ছে মনের ভাবকে বিস্তৃতভাবে উপস্থাপিত করার সুযোগ থাকে, চোদ্দ চরণের সীমাবদ্ধতার দায় এড়িয়ে যাওয়া যায়। কবির সাধনায় সনেট-পরম্পরা একটা বড় কবিতার স্তবক-পরম্পরার তাৎপর্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ডিরোজিওর রচিত সনেট-পরম্পরা বিচার করার সময় এই সাধারণ কথাগুলি মনে রাখা দরকার। তিনি ১৮২৭ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে 'Morning after a storm' শিরোনামায় যেমন দুটি সনেট লিখেছেন, তেমনি ঐ সালেই 'Night' শিরোনামায় ছয়টি সনেটও লিখেছেন। তবে তাঁর লিখিত দীর্ঘতম সনেট-পরম্পরায় (পার্কারের উদ্দেশে লিখিত) আছে বারোটি সনেট। এ থেকে বোঝা যায়, ব্যাপকতর মনোভাব প্রকাশের ব্যাপারে সনেট-পরম্পরার উপযোগিতা সম্বন্ধে ডিরোজিও বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন।

পরিশেষে ডিরোজিওর সনেটে ভাব ও রূপের সঙ্গতি কতখানি আছে, তা বিচার করা যেতে পারে। তাঁর একটি রোমান্টিক কবি-মন ছিল। প্রকৃতির নিবিড় সৌন্দর্য, অরণ্য-জীবনের রহস্যরস, মানব-মনের প্রেমাকুলতা ও ব্যর্থপ্রেমের বিষণ্ন-মধুর সুর তাঁর কল্পনাপ্রবণ চিত্তকে প্রতিনিয়ত আকর্ষণ করত। স্বদেশের অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান দুর্গতি নিয়ে তাঁর হৃদয় ছিল বিমুগ্ধ ও উৎকণ্ঠিত। ফলে সব মিলিয়ে তাঁর মধ্যে এমন একটা লিরিক্যাল ভাবপ্রবণতা দেখা দিয়েছিল সনেটের রূপবন্ধে যার অত্যুত্তম প্রকাশ ঘটতে পারে। অন্য দিকে তাঁর সাহিত্য-শিক্ষায় ত্রুটি ছিল না, সনেটের সংযত ও সংহত অভিব্যক্তি সম্বন্ধে তিনি ছিলেন বেশ সচেতন। তাই নিজের রোমান্টিক মনের লিরিক্যাল ভাবানুভূতিকে তিনি যখন চোদ্দচরণের সীমায়িত পরিসরের মধ্যে উপস্থাপিত করলেন, তখন সনেট-

চারিত্রের কোনো বৈলক্ষণ্য ঘটল না। উদ্দীপিত মনের ভাবাবেগকে ডিরোজিও কেমন সার্থকতার সঙ্গে সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ কাঠামোর মধ্যে আশ্রয় দিতে পারতেন, তার উজ্জ্বল উদাহরণ আছে তাঁর এই বহুখ্যাত কবিতাটির মধ্যে—

To the students of the Hindu College

Expanding like the petals of young flowers
I watch the gentle opening of your minds
And the sweet loosening of the spell that binds
Your intellectual energies and powers
That stretch (like young birds in soft summer hours,)
Their wings to try their strength. O how the winds
Of circumstance, and freshing April showers
Of early knowledge, and unnumbered kinds
Of new perceptions shed their influence ;
And how you worship truth's omnipotence !
What joyance rains upon me, when I see
Fame in the mirror of Futurity,
Weaving the Chaplets you have yet to gain,
And then I feel I have not lived in vain.

এখানে দেখতে পাই, হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনোবিকাশ কবির মনে ঘনিয়ে এনেছে ফুলের প্রস্ফুটনের ছবি। কিন্তু সেই ছবি ফুটে উঠতে না উঠতেই কবি দৃষ্টি দিলেন আরেকটি ছবির দিকে। তিনি তরুণদের মানসিক শক্তির জাগরণের প্রতীক খুঁজলেন উড্ডীয়মান নববিহঙ্গের পক্ষ-সঞ্চালনের মধ্যে। তিনি আরও দেখলেন, এপ্রিলের সঞ্জীবনী বায়ুবৃষ্টিধারা যেমন করে পৃথিবীর বুকে নূতন স্পন্দন জাগিয়ে তোলে, তেমনি করেই কৈশোর-যৌবনের বিদ্যাচর্চা ও অসংখ্য নব নব অনুভূতি ছাত্রদের মন ও জীবনের ওপর কী প্রভাবই না বিস্তার করছে! তিনি ভাবীকালের দর্পণে মনশ্চক্ষুতে দেখলেন, হিন্দু কলেজের তরুণ ছাত্রদের জন্য খ্যাতির মণিমাল্য রচিত হচ্ছে। তাতে কবির মন আনন্দধারায় ভরে উঠল, তিনি নিজের জীবনকে সার্থক বলে মনে করলেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে, চিত্রময় ও বর্ণবিভূষিত এই কবিতার মধ্যে ডিরোজিওর মনোভাব যেন পুষ্পিত হয়ে আছে। কবি ভাবাতিরেকের কলকল্লোলকে আলঙ্কারিক বচন-বিন্যাসের শক্ত খাতে

ক্রমশঃ বইয়ে এনে শেষ পর্যন্ত এক সরল ও নিরাভরণ স্বগতোক্তির গুঞ্জনের মধ্যে তার মধুর পরিসমাপ্তি দিয়েছেন—'I feel I have not lived in vain.' কবিতাটি নিঃসন্দেহে সুরচিত ও রসোত্তীর্ণ।

এ-পর্যন্ত যে আলোচনা হল তা থেকে বোঝা যায় যে, ডিরোজিওর রচিত সনেটগুলি নিম্নোক্ত ভাগে বিভক্ত—(১) সেক্সপীরীয় রীতির সনেট (২) অনিয়মিত সনেট (অর্থাৎ শিথিল বা ভঙ্গ সেক্সপীরীয় বা পেত্রার্কীয় রীতির সনেট) (৩) পেত্রার্কীয় রীতির সনেট (৪) ফরাসী যুগ্মকের লক্ষণযুক্ত পেত্রার্কীয় সনেট (৫) পয়ার-মিলে রচিত সনেট। এদের মধ্যে পঞ্চম শ্রেণীর কবিতাগুলিকে সনেট না বলে চতুর্দশপদী বলাই উচিত। তিনি সেক্সপীরীয় ও পেত্রার্কীয় রীতির সনেট লিখেছেন বটে, তবে সেগুলিকে বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ লক্ষণের দিক থেকে নিখুঁত বলা যায় না। সংখ্যার দিক থেকে সেক্সপীরীয় আদর্শে রচিত সনেটই বেশী,[৪] তবে তাদের মধ্যে অনেকগুলিতেই মূল আদর্শের বিশ্বস্ত অনুসরণ ঘটে নি। কোথায়ও নিয়মের অল্পস্বল্প ব্যতিক্রম, কোথায়ও বা নিয়মের বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। আসল কথা, ইংরেজী ভাষার এই ভারতীয় কবি একটা পাশ্চাত্ত্য কাব্যরূপ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রেই কম-বেশী পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করতে চেয়েছেন।

কিন্তু উল্লিখিত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও সনেটগুলির মধ্যে ডিরোজিওর কবিপ্রাণতা ও শৈল্পিক যোগ্যতার পরিচয় পাওয়া যায় এবং সেটা একজন ভারতীয় কবির পক্ষে প্রশংসার কথা। মনে হয়, তিনি সনেটের ভাব ও রূপের যথার্থ সন্ধান পেয়েছিলেন। অন্য দিকে তিনি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছিলেন, সনেটের বহিরঙ্গ রূপে যত নির্দিষ্টতা ও কাঠিন্যই থাকুক না কেন, তার অন্তরঙ্গ স্বভাবে আছে এক আশ্চর্য নমনীয়তা। আর সে-কারণেই সনেটের রূপ ও রীতিতে কোনো দুঃসাহসিক পরিবর্তন না ঘটিয়েও তিনি তার মধ্যে বিচিত্র ভাব ও বিষয় উত্থাপন করতে পেরেছেন। বস্তুতঃপক্ষে তাঁর কবিকৃতি উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেও কতটা সমাদৃত হত, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ডিরোজিওর 'To India, My Native Land' নামক সনেটটির নিম্নোক্ত সরস অনুবাদে—

৪. এর একটা কারণ বোধহয় এই যে, হিন্দু কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রদের কাছে সেক্সপীয়ার ছিলেন প্রিয় কবি ও নাট্যকার।

স্বদেশ আমার, কিবা জ্যোতির মণ্ডলী।
ভূষিত ললাট তব ; অস্ত গেছে চলি
সেদিন তোমার ; হায় সেইদিন যবে
দেবতা সমান পূজ্য ছিলে এই ভবে !
কোথায় সেই বন্দ্যপদ ! মহিমা কোথায় !
গগনবিহারী পক্ষী ভূমিতে লুটায়।
বন্দীগণ বিরচিত গীত উপহার
দুঃখের কাহিনী বিনা কিবা আছে আর ?
দেখি দেখি কালার্ণবে হইয়া মগন
অন্বেষিয়া পাই যদি বিলুপ্ত রতন।
কিছু যদি পাই তার ভগ্ন অবশেষ
আর কিছু পরে যার না রহিবে লেশ।
এই শ্রমের এ মাত্র পুরস্কার গণি ;
তব শুভ ধ্যায় লোকে, অভাগা জননি !

—অনুবাদক : দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বাঙলা দেশে ইংরেজ কবি রিচার্ডসনও কিছু ইংরেজী সনেট লিখেছেন।[৫]

৫. রিচার্ডসনের রচিত নানা জাতীয় কবিতার মধ্যে কিছু সনেটও আছে। প্রিয় কবি স্পেন্সার, সেক্সপীয়ার, মিল্টন ইত্যাদির কাব্যধারায় সনেটের রূপ ও রীতির যে ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা, তা-ই হয়ত সনেট রচনায় রিচার্ডসনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। তিনি এই জাতীয় কবিতার মধ্যে আপন মনের ভাব ও চিন্তার সার্থক রূপায়ণে যেমন সচেষ্ট ছিলেন, তেমনি সচেষ্ট ছিলেন তার কঠিন গঠনকর্মকে আয়ত্ত করতে। রিচার্ডসনের এই প্রয়াসের প্রশংসা করতে গিয়ে ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে 'ক্যালকাটা রিভিউ' পত্রের পঞ্চদশ খণ্ডে বলা হয়েছিল— 'The sonnet is a favourite vehicle of poetic thought and language with our author, and he is fastidiously careful in the construction of this difficult form of verse.'

ডিরোজিও ও রিচার্ডসনের মাতৃভাষা ছিল ইংরেজী, সুতরাং ইংরেজী ভাষায় কাব্য লেখা তাঁদের পক্ষে দুঃসাহসিক কবিকর্ম ছিল না। কিন্তু কাশীপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন বাঙালী হিন্দু, বাঙলা ছিল তাঁর মাতৃভাষা। তাই বাঙলাভাষী হিন্দু হয়েও তিনি যে ইংরেজী ভাষায় কাব্যচর্চা করেছিলেন, এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য ঘটনা। তিনি অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান স্কুলে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ করেছিলেন, ইংরেজীর সঙ্গে আরও কিছু য়ুরোপীয় ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। ফলে পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় পারদর্শী এই বঙ্গ-ভাষাভাষী ব্যক্তি ইংরেজী ভাষায় কাব্যচর্চা করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। আর ইংরেজী ভাষার আদিতম হিন্দু-কবি হিসেবে কাশীপ্রসাদের যে একটা ঐতিহাসিক ভূমিকা রয়েছে, তা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। তাঁর কাব্য-সংগ্রহের ভূমিকায় কবি-পরিচয়ে যথার্থই বলা হয়েছে—'First Hindu who has ventured to publish a volume of English Poems, having received his education in English only, among the other languages of Europe which are taught along with it as essential for the acquirement of the recondite learning of the west.'[১]

কাশীপ্রসাদ বায়রণ ও স্কটের আদর্শে যেমন 'The Shair'-এর মতো মেট্রিক্যাল রোমান্স লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন বিচিত্র বিষয়ক গীতিকবিতা। তাঁর কবিতার বিষয়বস্তুও নানাবিধ—প্রকৃতি, অন্তর্দর্শন, বাঙালীর সংস্কৃতি, হিন্দুর পূজাপার্বণ। য়ুরোপীয় গীতিকবিতার রূপভেদগুলির অনুশীলনও তিনি করেছেন—সনেট, ওড, এলিজি ইত্যাদি নানা জাতীয় কবিতা তাঁর কাব্য-সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, য়ুরোপীয় সাহিত্যের পাঠ-গ্রহণে কাশীপ্রসাদের চেষ্টার কোনো অন্ত ছিল না—বিদেশী হয়েও সেই ইংরেজী শিক্ষার প্রথম যুগেই তিনি পাশ্চাত্ত্য কাব্য-সাহিত্যের রূপ ও রীতি আয়ত্ত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

১. The Shair and other Poems by Kasiprasad Ghosh, Calcutta, 1830. Printed by Scott and Company at the Indian Gazette Press, No. 3, Durrumtollah.

কবির রচিত যে দুটি সনেট আমাদের হাতে এসে পৌঁছেচে, তার মধ্যে একটি উদ্ধৃত করছি—

To the Moon

How in the mirrored pavement of the sky, ক
Thou, like a stately lady robed in white, খ
Walkest and seem'st as shedding from on high, ক
In constant showers, thy soul-subduing light ! খ
But now withdrawest thou from mortal sight, খ
And, with thy veil of silver-fringed cloud, গ
Thy fair and modest mien thou dost enshroud, গ
As if ashamed to show it. But its bright খ
And soft and lovely beauty leaves behind প
Its image stamped within the bosom's core, ফ
And brings the long-departed days to mind ; প
When love beneath thee, oped his pleasure-store ; ফ
The happy past then blazes high and bright, খ
As if thy beams have kindled memory's light ! খ

—January 15, 1829,

এ-কবিতার আদর্শ যে সেক্সপীরীয় সনেট, এটা স্পষ্ট। তবে কাশীপ্রসাদ সেক্সপীরীয় রীতির অনেক রদ-বদল করেছেন—(১) কখখক, গঘগঘ, পফপফ, চচ-এর বদলে কখকখ, খগগখ, পফপফ, খখ মিলের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। প্রথম ও তৃতীয় চতুষ্কে একান্তর ও বিভিন্ন মিল (alternate & different rhymes) বজায় থাকলেও দ্বিতীয় চতুষ্কে একান্তর মিল নেই এবং প্রথম চতুষ্কের 'খ'-মিলের পুনরাবৃত্তিও এখানে হয়েছে। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য যে, পয়ারপুচ্ছে পূর্ববর্তী একটি মিলের পুনরাগমন হওয়ায় এর ছন্দ-মিলের উজ্জ্বলতা কতকটা নষ্ট হয়ে গেছে। (২) প্রথম চতুষ্কটির গঠন রীতিসম্মত ও সুন্দর, কিন্তু দ্বিতীয় চতুষ্কের ভাব তৃতীয় চতুষ্কে প্রবাহিত হওয়ায় (অষ্টম চরণের শেষে কোনো ছেদ-চিহ্ন নেই, এটা বর্তমান প্রসঙ্গে লক্ষণীয়) চতুষ্ক দুটি একাকার হয়ে গিয়েছে। রীতিগত এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও কবিতাটি ভাবের গভীরতায় ও প্রসাধনকলার চমৎকারিত্বে কাব্যরসিকের চিত্তাকর্ষণে সম্পূর্ণ সমর্থ। কাশীপ্রসাদের যে একটি রসপ্রবণ কবিমন ছিল, এতে তার

সুস্পষ্ট স্বাক্ষর আছে। কবিতাটির প্রথমাংশে চাঁদের ঐশ্বর্য-বিলসিত রাজসিক মূর্তি এবং মেঘাবগুণ্ঠিত লজ্জানম্ররূপের ছবি আঁকার মধ্যে কবির বহিরাশ্রয়ী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় থাকলেও দ্বিতীয়াংশে কবির মন নির্বস্তুক স্মৃতির জগতে ডুব দিয়েছে—অতীতের নানা রঙের দিনগুলি থেকে আনন্দরস আহরণ করতে চেয়েছে। এখানে কাশীপ্রসাদ আশ্চর্য কৌশলে চাঁদের আলো থেকে স্মৃতির প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়েছেন, তন্ময় সাধনা থেকে পৌঁছেচেন মন্ময় সাধনায়। কংক্রীট ও অ্যাব্‌স্ট্রাক্টের এই সুন্দর সহাবস্থান কবিত্বগুণোপেত ও গীতিব্যঞ্জনাময়।

একই নামে ('To the Moon') কাশীপ্রসাদ যে দ্বিতীয় সনেটটি (প্রথম চরণ: 'Isles of the blest! Enchantress of the soul') লিখেছেন, তাতে নিম্নোক্ত মিলের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে—

প্রথম চতুষ্ক: Soul-beams-controul-dreams,
দ্বিতীয় চতুষ্ক: reign-joy-again-destroy.—
তৃতীয় চতুষ্ক: high-balm-sky-calm,—
পয়ারপুচ্ছ: night-light!

ছন্দ-মিলের দিক থেকে এই সনেট পূর্ববর্তী সনেটের চেয়ে উৎকৃষ্টতর। এখানে প্রতিটি চতুষ্কে একান্তর ও ভিন্নতর মিল সংযোজিত হয়েছে। শেষ দুই ছত্রের পয়ার-মিলও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফলে একথা বলা অন্যায় হবে না যে, সুস্পষ্ট ও স্বতন্ত্র সাতটি মিল যোজনার সেক্সপীরীয় রীতি এখানে বিশ্বস্তভাবে অনুসৃত হয়েছে। প্রত্যেকটি চতুষ্কের শেষে যে উপচ্ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ আছে, তাতে চতুষ্ক-এককগুলি পূর্ণাবয়ব নিয়ে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। নিয়মিত রীতির সনেট রচনায় কাশীপ্রসাদের নৈপুণ্যের এটি একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

৩.

কাশীপ্রসাদের পরে ইংরেজী কাব্য লিখে যে সমস্ত বাঙালী কবি অল্প-বিস্তর খ্যাতি লাভ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে মধুসূদনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কৈশোরে, হিন্দুকলেজে পাঠকালে, তিনি যেমন ইংরেজী সাহিত্যের শীর্ষস্থানীয় ছাত্র ছিলেন, তেমনি ইংরেজী কাব্যচর্চায়ও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন। বস্তুতঃ প্রথম বয়স থেকেই তিনি ইংরেজী

ভাষায় মহাকবি হবার স্বপ্ন দেখতেন।[১] তাঁর এই সাহিত্যপ্রেমের মূলে যেমন ছিল আপন মনের তাগিদ, তেমনি ছিল ক্যাপ্টেন রিচার্ডসনের উৎসাহ।[২] এইভাবে উৎসাহিত হয়ে মধুসূদন সতের আঠার বছর বয়সে নানা ধরনের কবিতা লিখেছেন—আখ্যায়িকা কবিতা, সাধারণ গীতিকবিতা, সনেট, ইপিস্‌ল্ ইত্যাদি। এ থেকে বোঝা যায়, অল্প বয়স থেকে বিচিত্র-বিষয়ক নানাজাতীয় কবিতা রচনা করতে তিনি আনন্দবোধ করতেন।[৩]

রচনার সন-তারিখসহ মধুসূদনের রচিত আদি সনেট দুটির শিরোনাম হচ্ছে—'Sonnet to Futurity'। এই সনেট-পরম্পরার প্রথমটি উদ্ধৃত করছি—

Oh ! how my heart dath shrink,—while on thy sky, ক
Futurity ! I mark the gathering gloom, খ
Nursing the dreadful tempest in its womb,— খ
The tempest rude of woe and misery ! ক
Though Fancy, with her ever-pleasing hue, গ
Lends a sweet charm to thy dim, distant scene ;— ঘ
Yet oh ! when the dark mists, that lie between ঘ
There and the Present,—vanish from the view, গ

১. তাঁর এই সময়কার একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য—'Oh ! how should I like to see you write my "Life", if I happen to be a great poet, which I am almost sure I shall be, if I can go to England.' —মধু-স্মৃতি, পৃঃ ১৫

২. মধুসূদনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ সোম লিখেছেন—'কাপ্তেন রিচার্ডসন মধুসূদনের ইংরাজী কবিতা-রচনা-নৈপুণ্যে এতদূর বিমোহিত হন যে, তাঁহার সম্পাদিত পত্রিকা-সমূহে অতি সমাদরে মধুসূদনের কবিতাবলী প্রকাশ করিতেন। কাপ্তেন রিচার্ডসনের গুণে আকৃষ্ট হইয়া প্রথমতঃ মধুসূদন অনেক বিষয়ে তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়েন।' তাঁর এক বন্ধু শ্রীরাম চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন—'(মধুসূদন) সময়ে-সময়ে কবিতা লিখিয়া কাপ্তেন সাহেবকে দেখাইতেন। সাহেব তাঁহাকে যথোচিত উৎসাহ প্রদান করিতেন।'—মধু-স্মৃতি, পৃঃ ১৩-১৪।

৩. 'জ্ঞানান্বেষণ', 'ক্যালকাটা লিটারারি গেজেট', প্রীনব, 'ব্লসম', 'কমেট', 'বেঙ্গল স্পেক্টেটর' ইত্যাদি পত্র-পত্রিকায় সেই সব কৈশোর রচনা প্রকাশিত হত।

And sober Reason,—like the vivid light, চ
That bursting from,—the storm fiend's angry eye, ছ
Paints to the mariner's affrighted sight, চ
The yawning waves,—their dreadful revelry— ছ
Divests thee or thy fairy colours bright,— চ
What scenes appaling in thee I desirery ! ছ

—19th August, 1842.

মনে হয়, এই কবিতায় মধুসূদন ছন্দ-মিলের দিক থেকে পেত্রার্কীয় সনেটের আদর্শ অনুসরণ করতে চেয়েছেন। তবে তাতেও ক্রটি থেকে গেছে। পেত্রার্কীয় আদর্শ অনুযায়ী কবিতাটির মোট চার বা পাঁচটি মিল থাকা উচিত ছিল, কিন্তু আছে ছয়টি মিল। 'eye'-এর 'revelry' ও 'desirery'-এর মিলও সন্তোষজনক নয়। অন্য দিকে অষ্টক ও ষট্‌ক বিভাগ মিলের ক্ষেত্রে থাকলেও দ্বিতীয় চতুষ্কে (অর্থাৎ পঞ্চম থেকে অষ্টম চরণে) প্রথম চতুষ্কের মিলের পুনরাবর্তন না হয়ে ভিন্নতর মিলের সমাবেশ হয়েছে। সবচেয়ে বড়ো কথা, কবির মনোভাব মোড় ফিরেছে ষষ্ঠ চরণের পরে[৪], অষ্টম চরণের পরে নয় এবং সেই কারণে আট-ছয় ধরে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ করার অসুবিধা আছে। আর যদি ছয়-আট ভাগ ধরা যায়, তবে পেত্রার্কীয় রীতি-লঙ্ঘন স্বীকার করে নিতে হয়।

তবে রীতিগত বিচারে মধুসূদনের এই সনেটটি উত্তীর্ণ না হলেও অন্য কয়েকটি কারণে এটিকে উপেক্ষা করা যায় না। কবিতাটি পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায়, চোদ্দ চরণের ছোট পরিসরের মধ্যে একটা গভীর আইডিয়াকে সুবিন্যস্ত করার নৈপুণ্য কিশোর বয়েসেই কবি অর্জন করেছিলেন। ভাষা, ছন্দ ও মিলের ওপর তাঁর অধিকারও কম ছিল না। শব্দ-বাক্যের রঙ-রেখায় ছবি ফলিয়ে তোলার কৌশল যে তিনি আয়ত্ত করে ফেলেছিলেন, তার প্রমাণও কবিতাটির মধ্যে আছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বক্তব্য প্রকাশ করতে গিয়ে মধুসূদন আলঙ্কারিক বচন-

৪. কবিতাটিতে আগাগোড়াই ভবিষ্যতের ঝঞ্ঝাগর্ভ অন্ধকারাচ্ছন্ন রূপ অঙ্কিত হয়েছে—পঞ্চম-ষষ্ঠ চরণের কল্পনা-নির্ভর আলোকচ্ছটা সেই অন্ধকারকে গাঢ়তর করেছে মাত্র। তবু সেই ক্ষণিক আলোকচ্ছটার ওপর নির্ভর করে এবং সপ্তম চরণের 'yet' শব্দটির দিকে লক্ষ্য রেখে সপ্তম চরণ থেকে ভাবের মোড় ফেরার কথা উল্লেখ করলাম। তবে গভীরতর বিচারে এ-বিভাগ স্বীকৃত না হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

বিন্যাসের ওপর অনেকটা নির্ভর করেছেন। বক্তব্য প্রকাশের এই আলঙ্কারিক ক্রম বা ঢঙ ডিরোজিও ও কাশীপ্রসাদের কবিতায় দেখা গেছে এবং তা নিজের রচিত বাঙলা সনেটেও তিনি অনেক ক্ষেত্রে অনুসরণ করেছেন। সুতরাং এর যে একটা ঐতিহাসিক তাৎপর্য আছে, তা স্বীকার করতে হবে।

একই বিষয়ে রচিত দ্বিতীয় সনেটটি কাব্য হিসেবে অধিকতর সার্থক। এর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবেই কবি প্রকৃতির মনোরম চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন (পূর্বের কবিতাটির মধ্যে প্রকৃতি এসেছে পরোক্ষভাবে—ভাবীকালের রূপক-ভাবনার সূত্রে)। কবির নিজের এই বসুন্ধরা—সবুজ তৃণভূমি, ফুল্লকুসুমরাশি, নির্মল আকাশ ইত্যাদি সত্ত্বেও—আর মনোহরণ করতে পারছে না, তিনি বিষণ্ণ বন্দী বিহঙ্গের মতোই স্বপ্ন দেখেছেন সেই দেশের—'Where virtue dwells and heaven-born liberty Makes even the lowest happy ;—where the eye Doth sicken not to see man bend the knee To sordid interest :...... Where man in all his truest glory lives, And nature's face is exquisitely sweet :' সুতরাং এটা স্বীকার করতে হবে যে, কবিতাটির ভাবানুভূতির মধ্যে একটা গীতিকাব্যসুলভ স্বপ্নের ব্যঞ্জনা ও কল্পনার সুষমা আছে। অন্য দিকে এর মিলসূচক শব্দসমষ্টি হচ্ছে—

প্রথম চতুষ্ক : sigh-be-sky-me.

দ্বিতীয় চতুষ্ক : free-liberty-eye-knee

তৃতীয় চতুষ্ক : thrives-meet-lives-sweet :

পয়ারপুচ্ছ : sigh-die.

সেক্সপীরীয় রীতির এই সনেটটির মধ্যে দ্বিতীয় চতুষ্কের মিলের দুর্বলতা ছাড়া আর কোনো ত্রুটি নেই। পয়ারপুচ্ছের বক্তব্য পূর্ববর্তী বারোটি চরণের বক্তব্যেরই সংহত ও উজ্জ্বল রূপ মাত্র।

১৮৪২ খৃষ্টাব্দে খিদিরপুরে লিখিত মধুসূদনের আরেকটি সনেট হচ্ছে 'On the Ochterlony Monument'. কলকাতার উচ্চতম স্মৃতিস্তম্ভের উপরিভাগে দাঁড়িয়ে কিশোর-কবির যে মনোভাব তা-ই একটা সনেটের রূপাধারে প্রকাশের চেষ্টা এখানে আছে। নিচের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীটা কতই না দীন ও অকিঞ্চিৎকর বলে মধুসূদনের মনে হয়েছে! কবির চোখে অদৃষ্টপ্রায় বস্তুগুলি 'poor things of mortal clay'; জাগতিক আড়ম্বর, ক্ষমতা আর যশের জ্যোতি মেঘাচ্ছন্ন আকাশে উজ্জ্বল ধূমকেতুর জ্যোতির মতো

বিলীয়মান। অন্য দিকে— Round me now
The boundless sea of air, in calm profound
Is sleeping gently :—and the silent queen
Of swarth complexioned night, pale and serene,
Is rising brightly ! oh ! how sweetly round
Falls the bright silver light of her calm brow.

সনেটটির সাংগঠনিক আদর্শ হচ্ছে পেত্রার্কীয় সনেট। এতে নিম্নোক্ত মিলের পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে—কখখক, গঘঘগ, চছজ, জছচ। স্পষ্টতঃই দ্বিতীয় চতুষ্কে প্রথম চতুষ্কের মিল পুনরাবর্তিত না হয়ে ভিন্নতর মিল সন্নিবেশিত হয়েছে। ভাবের দিক থেকে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ নেই—অবশ্য নবম চরণের দ্বিতীয়াংশ থেকে ভাব নূতন দিকে কতকটা মোড় ফিরেছে।

সেই কৈশোরক-পর্বেই মধুসূদন একটি বিস্ময়কর সনেট লিখেছিলেন। সনেটটি অমিত্রাক্ষরে রচিত এবং তার নাম হচ্ছে—'Evening in Saturn'.[৫] প্রথম প্রকাশের কালে কবি একটি ভূমিকা যোজনা করে বলেছিলেন—'Behold ! I have written **a Sonnet in Blank-verse.** What a rare experiment ! Believe me, Reader, the Muse appeared not to resent this "breach of etiquette" towards her. O Joy ! O Glory ! O Happiness ! that I have done successfully what none dared do before me.' অল্প বয়সের ভাবাতিরেক ও দুর্দমনীয় উল্লাস এই উক্তির মধ্যে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, (ক) কাব্যসাধনায় নূতন পথ অবলম্বন করতে মধুসূদন কৈশোর থেকেই ভালবাসতেন ; (খ) নূতন সাহিত্যকীর্তি স্থাপন করতে গিয়ে আত্মবিশ্বাসের অভাব কবির মধ্যে দেখা যায় নি ; (গ) তিনি মনে করতেন না যে, নিয়মের ব্যতিক্রমে কাব্যলক্ষ্মীর মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। এই ধরনের বিদ্রোহের মনোভাব এবং অপরিসীম সাহস ও আত্মবিশ্বাস নিয়ে কবিতাটি লেখা হয়েছে বলে স্বভাবতঃই এর মধ্যে ভাব-চিন্তা সংহত ও সাকার হয়ে

৫. সাম্প্রতিক কালে কোনো কোনো কবি মিলহীন সনেট লিখছেন। কিন্তু এই ব্যাপারেও যে তাঁরা নূতনত্ব দাবি করতে পারেন না, তার প্রমাণ হচ্ছে এই সনেটটি (যদিও ইংরেজী ভাষায় লিখিত)। প্রথম অধ্যায়ে আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, মিলহীন কবিতা নানা কারণে সনেটপদবাচ্য হতে পারে না।

ওঠে নি।[৬] তবে কবিতাটিতে মধুসূদনের চিত্রাঙ্কন-ক্ষমতা ও রসাকর্ষণ-শক্তির পরিচয় আছে—

Now from the west rose six moons hand in hand—
Like a soft band of beauties—blushing—fair—
Oh ! how their beams did brighten all the scene ;
Their lights fell on the lakes and murmuring rivers,
Like silver mantles.

চিত্রগীতময়ী মধু-প্রতিভার দৃষ্টান্তস্থল হিসেবে তাঁর তিনটি সনেটের কথা এক সঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে—(১) Composed during a morning walk (২) To a Star during a cloudy night (৩) Composed during an evening walk. এই তিনটিতে প্রকৃতির ত্রিবিধ রূপ-রচনায় কবির কাঁচা মনের রঙ একটু বেশী করেই ছড়িয়ে পড়েছে। এদের বুকে কান পাতলে মধুসূদনের সৌন্দর্য-তৃষ্ণার ধ্বনি স্পষ্টভাবেই শোনা যায়। গঠনের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, এই তিনটির মধ্যে দুটি শেক্সপীরীয় রীতির সনেট। তবে তাদের মিল-বিন্যাসের মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য আছে— (১) কখকখ, গঘগঘ, পফপফ, চচ (২) কখখক, গঘগঘ, পফপফ, চচ (৩) কখকখ, গঘগঘ, চছছচচছ। আমরা এখানে প্রথম সনেটটি উদ্ধৃত করছি—

Composed during a morning walk

I love the beauteous infancy of day, ক
The garlands that around its temple shine ; খ
I love to hear the tuneful matin lay. ক
Of the sweet Kokil perched upon the pine : খ
I love to see yon streamlet gaily run গ
And blush like maiden Beauty meek and fair, ঘ
When the bright beams of yon refulgent sun গ
Crowd on her trembling bosom pure and clear ; ঘ
I have to see the bee from flow'r to flow'r, প
Sucking the sweets, to him they smiling yield ; ফ
I love to hear the breezes in the bower প
Singing melodious, or along the field ; ফ
All these I love, and oh ! in these I find চ
A balm to soothe the fever of my mind. চ

৬. কবিতাটির স্থানপটভূমি হচ্ছে শনিগ্রহ—কারণ কবি 'despise everything earthly.' কবির আসল মনোভাবটি যে গভীর নয়, এই কারণ-নির্দেশের মধ্যেই তার প্রমাণ আছে।

এছাড়া আরও কতকগুলি সনেট মধুসূদন জীবনের কৈশোরক-পর্বে লিখেছিলেন। তাদের বৈশিষ্ট্য নিচে ছকের-আকারে উপস্থাপিত করা হল—

সনেটের প্রথম চরণ বা নাম	মিল	রীতি	বিষয়
১। I wandered forth alone, I knew not where	কখখক, গঘঘগ,[৭] চছচছচছ	পেত্রার্কীয়। অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ও অষ্টম চরণের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই।	গভীর রজনীতে কবির বিষাদ-চেতনা ও শান্তির সন্ধান-লাভ।
২। I saw young Zephyr pass from flower to flower	কখখক, কখখক চছচছচছ	পেত্রার্কীয়। অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ নেই।	দিনের জন্ম ও অভিষেক।
৩। Love, I have bask'd me in thy summer-ray	কখখক, গঘগঘ, পফপফ, চচ	সেক্সপীরীয়। পয়ারপুচ্ছ আছে; প্রতি চতুষ্কের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই।	জীবনের উজ্জ্বলতম দিনের শেষে অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির আবির্ভাব।
৪। Beloved Lake, how oft I think of thee	কখখক, কগকগ, চছচজছজ	পেত্রার্কীয়। অষ্টম চরণের শেষে ছেদ-চিহ্ন এবং অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ নেই।	সরোবরের সৌন্দর্য ও কবির আনন্দপূর্ণ দিন-যাপন।
৫। I am not rich, nay, nor the future heir	কখখক, কখখক চকচকচক	পেত্রার্কীয়। অষ্টম চরণের শেষে উপচ্ছেদ আছে, কিন্তু অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ নেই।	নির্ধন ও ঐশ্বর্যহীনের আত্মভাষণ।

সনেটের প্রথম চরণ বা নাম	মিল	রীতি	বিষয়
। But oh ! I grieve not, for the azure sky	কথখক, **কথকখ,** চছচছচছ	পেত্রার্কীয়। অষ্টম চরণের শেষে পূর্ণচ্ছেদ আছে, কিন্তু অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ নেই।	প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবির ভাবোল্লাস।
। Oh ! how my heart exulteth while I see	কথকখ, **গঘঘগ** পফপফ, চচ	সেক্সপীরীয়। পয়ারপুচ্ছ আছে, দ্বিতীয় চতুষ্কের শেষে কোনো ছেদ-চিহ্ন নেই।	হিন্দু কলেজের ছাত্রদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সানন্দ উক্তি।
। Night-শীর্ষক সনেট-পরম্পরা	(ক) কথকথ, **গঘঘগ,** পফপফ, চচ	সেক্সপীরীয়। পয়ারপুচ্ছ আছে। তিনটি চতুষ্কের শেষে ছেদ-চিহ্ন আছে।	রাত্রির মহিমা
	(খ) কথকথ, গঘগঘ, পফপফ, চচ	সেক্সপীরীয়। পয়ারপুচ্ছ আছে। দ্বিতীয় চতুষ্কের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই।	রাত্রির মহিমা ও অতীতের স্মৃতিচিন্তা।
	(গ) কথকথ, গঘগঘ, **পফফপ,** চচ	সেক্সপীরীয়। পয়ারপুচ্ছ আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুষ্কের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই।	রাত্রির পটভূমিকায় বাল্য ও যৌবনের স্মৃতি রোমন্থন।

৭. স্থূল অক্ষরে লিখিত মিলগুলি আদর্শসম্মত নয়।

এ-পর্যন্ত মধুসূদনের যে সমস্ত ইংরেজী সনেট বিশ্লেষিত হল তা হিন্দু-কলেজ-পর্বে রচিত। মাদ্রাজ প্রবাসকালেও তিনি তিনটি সনেটপদবাচ্য ইংরেজী কবিতা লিখেছিলেন। তার মধ্যে একটি হচ্ছে Visions of the Past-এর Introductory Sonnet. এটি সেক্সপীরীয় সনেটের লক্ষণাক্রান্ত—তবে মিলের পদ্ধতির মধ্যে ত্রুটি আছে (কখখক, কখকখ, গঘগঘ, চচ)। Timothy Penpoem ছদ্মনামে তিনি আর যে দুটি কবিতা নিয়ে সনেট-পরম্পরা লিখেছিলেন (প্রথম চরণ যথাক্রমে 'Richard ! there is a grief which few can feel' ; এবং 'And such dark grief is his, whose sleepless soul') তার মধ্যে একটি উদ্ধৃত করছি—

Richard ! there is a grief, which few can feel ; ক
It cuts into the bosom's deepest core, খ
And with unwearied fingers aye doth steal ক
Its summer gladness, and its faery store খ
Of hopes and aspirations. All the lore খ
The sternest stoic-Pride, can bring to heal, ক
Or uncomplaining Patience e'er reveal ক
From wisdom's holiest oracle, may pour খ
No balm that soothes. Each eagle-winged thought চ
Droops powerless to soar with airy aim, ছ
Fetter'd by cold and Sullen Apathy ; জ
Life's varied scenes with joy and music fraught, চ
Visions of laurell'd Glory and of Fame, ছ
Stir not. The heart is as a tideless sea. জ

—1849

এখানে পেত্রার্কীয় মিলের রীতি কতকটা অনুসৃত হয়েছে। প্রথম আট চরণে কখখক, কখখক-এর বদলে আছে কখকখ, খককখ। অষ্টম চরণের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই এবং ভাবগত অষ্টক-ষটক বিভাগ অনুপস্থিত। অপর সনেটটিরও মিলে (কখকখ, কখখক, চছজ, ছচজ) কতকটা স্বাধীনতা কবি ভোগ করেছেন। অষ্টম চরণের শেষে এখানেও ছেদ-চিহ্ন নেই, ফলে প্রথম আট চরণের ভাব পরবর্তী চরণগুলিতে প্রবাহিত হয়ে যাওয়ায় পেত্রার্কীয় সনেট-সম্মত অষ্টক-ষটক আত্ম-প্রকাশ করতে পারে নি।

সুতরাং মধুসূদনের রচিত ইংরেজী সনেটগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(১) তিনি পেত্রার্কীয়, সেক্সপীরীয়, শিথিল ও ভঙ্গ পেত্রার্কীয়, শিথিল ও ভঙ্গ সেক্সপীরীয় এবং মিণ্টনীয় এই কয়েক প্রকারের সনেটই লিখেছেন; (২) নিখুঁত সেক্সপীরীয় ও পেত্রার্কীয় রীতির সনেট সংখ্যায় অল্প, অধিকাংশই হচ্ছে মিণ্টনীয় এবং ভঙ্গ বা শিথিল পেত্রার্কীয় বা সেক্সপীরীয়; (৩) পেত্রার্কীয় রীতির সনেটগুলির চেয়ে সেক্সপীরীয় রীতির সনেটে কবির দক্ষতা বেশী প্রকাশ পেয়েছে, কারণ প্রথমোক্ত সনেটগুলির মধ্যে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ নেই বললেই চলে; (৪) তবে চোদ্দ চরণের মধ্যে একটা ভাবকে মোটামুটিভাবে গুছিয়ে বলার দক্ষতা তিনি দেখাতে পেরেছেন; (৫) ইংরেজী সনেটে সার্থকভাবে প্রযুক্ত দ্ব্যক্ষর পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিক ছন্দে তার লক্ষণীয় অধিকার দেখা গেছে। (৬) সনেটগুলিতে বিষয়গত বৈচিত্র্য আছে।

৪। বাঙলা সনেটের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠা ঃ মধুসূদন

মধুসূদনের মতো প্রচণ্ড ও সম্ভাবনাময় প্রতিভা নিয়ে খুব কম কবিই জন্মগ্রহণ করেছেন। স্বল্পস্থায়ী সৃষ্টি-মহোৎসবে তিনি শুধু অভিনব ও বিচিত্রকেই খুঁজে বেড়িয়েছেন। তাঁর হাত থেকেই বাঙলা সাহিত্য প্রথম পেয়েছে এপিক অব আর্ট, ওড, ইপিস্‌ল্‌, রোমান্টিক ট্র্যাজেডি, ব্ল্যাঙ্ক ভার্স ইত্যাদি। তিনি এক দিকে যেমন সৃষ্টি করেছেন তন্ময় মহাকাব্য, অন্য দিকে তেমনি সৃষ্টি করেছেন মন্ময় গীতিকাব্য। তাঁর কণ্ঠে কখনও ধ্বনিত হয়েছে অমিত্রাক্ষরের জলদমন্দ্র, কখনও ছন্দ-মালিনীর বংশী-ধ্বনি। এমন কর্মোচ্ছল ও প্রাণবন্ত কবি-পুরুষেরই শেষ মহৎ দান হচ্ছে বাঙলা সনেট।

সনেট মধুসূদনের শেষ দান হলেও এর ভাবনা তাঁর মনে অনেক আগেই দেখা দিয়েছিল। আমরা পূর্বে দেখেছি, হিন্দু কলেজে ছাত্রাবস্থায় ও মাদ্রাজ-প্রবাস-কালে (যখন তিনি ইংরেজী ভাষার খ্যাতনামা কবি হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন) তিনি ইংরেজী ভাষায় বেশ কয়েকটি সনেট লিখেছিলেন। এর ফলে তাঁর মানস-বেদীতে সনেট-প্রতিমার আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা যে হয়ে গিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সেই ইংরেজী অধ্যায়ের শেষে এবং বাঙলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রবেশের অনতিকাল পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে তিনি 'কবি-মাতৃভাষা' নামে প্রথম বাঙলা সনেট রচনা করেন। কবি তখন 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা সমাপ্ত করেছেন এবং 'মেঘনাদবধের' তৃতীয় সর্গ রচনায় ব্যাপৃত আছেন। তারপর অনেক দিন সনেট লেখার কোনো চেষ্টা তিনি করেছিলেন বলে মনে হয় না। এর বেশ কিছু কাল পরে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী তারিখে ফরাসী দেশের ভার্সাই সহর থেকে গৌরদাস বসাককে মধুসূদন চারটি সনেট পাঠিয়েছিলেন। সেই চারটি সনেট হচ্ছে—'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি', 'জয়দেব', 'সায়ংকাল' ও 'কবতক্ষ নদ'। এর পর কয়েক মাসের মধ্যেই কবি সনেট রচনা সমাপ্ত করেন এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ১লা অগাষ্ট ১০২টি সনেট (অন্যান্য কিছু কবিতা সহ) 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এইভাবে মধুসূদনের হাতে বাঙলা সনেটের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠা ঘটে।

বাঙলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন করতে গিয়ে মধুসূদন অবশ্যই কতকগুলি সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। কারণ এক ভাষা ও সাহিত্যের কোনো রূপ-প্রতিমাকে অন্য ভাষা ও সাহিত্যে যথার্থভাবে উপস্থাপনার কাজটা কখনও সহজ হয় না। য়ুরোপে, বিশেষতঃ ইতালীতে, সনেটের উদ্ভবের পেছনে যে সামাজিক ও সাহিত্যিক পটভূমি ছিল, বাঙালী কবির সনেট-চর্চার পেছনে সেই পটভূমি ছিল না ; উপরন্তু জাতীয় মানসপ্রবণতা, ভাষার ধাতুপ্রকৃতি ও সাহিত্যের ঐতিহ্যের ভেদ ছিল। এমনি অবস্থায় বাঙলা ভাষায় সনেটের অনুশীলন করতে গিয়ে মধুসূদনের মনে নিশ্চয়ই কতকগুলি মূল প্রশ্ন জেগেছিল—

(ক) বাঙলা সনেটের আয়তন বা পরিসর কি হবে ? তা কি পাশ্চাত্ত্য সনেটের মতো চোদ্দ চরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে ? যদি তার আয়তন চোদ্দ চরণ হয়, তবে সেই নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে বাঙলা ভাষা সনেটের উজ্জ্বল রূপবন্ধটি ফুটিয়ে তুলতে পারবে কি ?

(খ) বাঙলা সনেটের ছন্দ কি হবে ? প্রচলিত পয়ার-ত্রিপদী-একাবলী এবং লৌকিক (স্বরবৃত্ত) ছন্দের মধ্যে কোন্‌টি সনেটের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হবে ? প্রতি চরণের দৈর্ঘ্য কি হওয়া উচিত ?

(গ) মিল সনেটের পক্ষে অপরিহার্য কি ? মিলহীন সনেট বাঙলা ভাষায় রচনা করা কি উচিত হবে ?

(ঘ) পয়ার-মিলে (অর্থাৎ পর পর দুই চরণের অন্ত্যমিল) বাঙলা সনেট রচনা করা সঙ্গত হবে কি ? পাশ্চাত্ত্য সনেটে যে ধরনের একান্তর বা বিবৃত (কখকখ) এবং দূরান্তর বা সংবৃত (কখখক) মিল ব্যবহৃত হয়েছে, বাঙলা সনেটে তা সার্থকভাবে প্রবর্তন করা কি অসম্ভব হবে ? ইতালীয় সনেটে মিলের ক্ষেত্রে যে শ্রুতিমাধুর্য রয়েছে, বাঙলা সনেটের মিলের ক্ষেত্রে সেই ধরনের শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি করা যাবে কি ?

(চ) কত অক্ষর বা মাত্রার শব্দ বাঙলা সনেটের মিলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উপযোগী ও শ্রুতিসুখকর বলে গৃহীত হবে ?

বস্তুতঃপক্ষে এই প্রশ্নগুলির সদুত্তর সন্ধানের ওপরই মধুসূদনের সনেটের সার্থকতা নির্ভর করছিল। মনে রাখা দরকার যে, কোনো ইতালীয় বা ইংরেজ কবিকেই এককভাবে এতগুলি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় নি এবং প্রশ্নোক্ত সমস্যাগুলি সমাধানের দায়িত্বও গ্রহণ করতে হয় নি। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, ত্রুবাদুরদের প্রেমসঙ্গীত সিসিলীয় কবি-গোষ্ঠী ও ইতালীর মূল ভূভাগের বিভিন্ন

কবির সাধনার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে সনেটের আকার ধারণ করে এবং সর্বশেষে পেত্রার্কার হাতে সেই সনেট সুষ্ঠু পরিণতি লাভ করে। অর্থাৎ কালানুক্রমে গঠিত একটা organic form হিসেবে ইতালীয় সনেটের প্রতিষ্ঠা হয়। ইংরেজ কাব্যে সনেট organic form নয়, abstract form মাত্র। তবু ওয়াট-সারের আমল থেকে ইংরেজ জাতির মানসপ্রবণতা এবং তাদের সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ঐতিহ্য অনুযায়ী ইংরেজী সনেট একটু একটু করে গড়ে উঠে শেষ পর্যন্ত সেক্সপীয়ারের হাতে পূর্ণ প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ফলে কোনো ইতালীয় বা ইংরেজ কবিকেই সনেট রচনা করতে গিয়ে সর্বাঙ্গীণ দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় নি। কিন্তু মধুসূদনের ছিল অসীম সাহস ও অতুলনীয় আত্মবিশ্বাস—তাই তিনি সনেটের শিথিল সূচনা মাত্র করতে চান নি, সনেটের সকল অঙ্গের দিকে লক্ষ্য রেখে তার পূর্ণরূপটিকে উদ্ঘাটিত করতে চেয়েছিলেন। উপরি-উক্ত সমস্যাগুলির কি সমাধান মধুসূদন করে গেছেন, সেটা বিচার বিশ্লেষণ করলেই মধুসূদনের কৃতিত্বের পরিমাণ ধরা পড়বে।

প্রথমতঃ, লক্ষ্য করা দরকার যে, মধুসূদন সনেটের আয়তন যে চোদ্দ চরণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা উচিত, এই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন। তাঁর অল্প বয়সে রচিত ইংরেজী সনেট ও প্রৌঢ় বয়সে রচিত বাঙলা সনেট কোনো ক্ষেত্রেই চোদ্দ চরণের সীমা অতিক্রম করে নি।[৭] যদি এই সীমা-বন্ধনে তাঁর বিশ্বাস না থাকত তবে কোনো-না-কোনো সনেটে তার অন্ততঃ পরীক্ষামূলক নিদর্শন পাওয়া যেত। এই নির্দিষ্ট আয়তনের তত্ত্বে বিশ্বাস ছিল না বলেই তো জর্জ মেরিডিথ ষোল চরণের সনেট লিখে গেছেন। কিন্তু মধুসূদন এই বিষয়ে কোনো ব্যতিক্রমের চিন্তাকে আমল না দিয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশের বিশিষ্ট পূর্বসূরীদের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছিলেন।[*] অন্য দিকে চোদ্দ চরণের ছোট আয়তনের মধ্যে একটা ভাবকে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলার কোনো অসুবিধাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বলে মনে হয় না।[৮] হিন্দু-কলেজ-পর্বে লিখিত তাঁর ইংরেজী কবিতাগুলি নানা দৈর্ঘ্যের, কিন্তু সেই অপরিণত প্রতিভার সৃষ্টিগুলির মধ্যেও আয়তনের জন্য ভাবকে ছাঁটাই করার দৃষ্টান্ত নেই বলে আমার বিশ্বাস। আর সনেটগুলির মধ্যে অন্য ত্রুটি থাকলেও ভাবের ওপর রূপের নিপীড়নের ত্রুটি নেই। বস্তুতঃপক্ষে ইংরেজী সনেটগুলি প্রথমে লিখেছিলেন বলে এই নির্দিষ্ট আয়তনের রূপবন্ধটি আগেই তাঁর আয়ত্তে এসে গিয়েছিল। তাছাড়া প্রাচীন বাঙালী কবিদের লেখা চোদ্দ চরণের

কবিতার কথা নিশ্চয়ই তিনি জানতেন। এমতাবস্থায় কোনো ভাব প্রকাশের পক্ষে চোদ্দ চরণের আয়তনকে তিনি অনুপযুক্ত বলে মনে করতে পারেন নি। বরং প্রতিভাবান্ ব্যক্তির হাতে পড়লে বাঙলা সনেট যে উজ্জ্বল কাব্যরূপ লাভ করতে পারবে, এই গভীর বিশ্বাস থেকেই তিনি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করেছিলেন। তিনি এক চিঠিতে লিখেছিলেন—'In my humble opinion, if cultivated by men of genius, our sonnet in time would rival the Italian.'[১] তাঁর পরবর্তীকালের সুচিন্তিত অভিমতও ছিল অভিন্ন—'I dare say the sonnet চতুর্দশপদী will do wonderfully in our language.'[২]

দ্বিতীয়তঃ, বাঙলা সনেটের ছন্দ হিসেবে মধুসূদন যে পয়ার ছন্দকে (১৪ মাত্রার চরণ-ভিত্তিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ) নির্বাচন করেছিলেন, তাতেও তাঁর রসজ্ঞান ও ছন্দোবোধের বিশেষ পরিচয় পাওয়া গেছে। মনে রাখতে হবে যে, এক ভাষার ছন্দকে অন্য ভাষায় স্থানান্তরিত করা সম্ভব নয়, কারণ প্রত্যেক ভাষার ছন্দই সেই ভাষার শব্দ-যোজনা ও পদান্বয়ের রীতি এবং ধ্বনি-প্রকৃতি ও যতিপাতের নিয়মের সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত। তাই বাঙলা সনেটে মধুসূদন এমন একটা ছন্দ ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন, যা ধ্বনিপ্রকৃতি ও ছন্দঃস্পন্দের দিক থেকে যতটা সম্ভব ইতালীয় ছন্দের বিকল্প বলে গৃহীত হতে পারে।[৩] ইতালীয় সনেটের ছন্দের মধ্যে একটা সঙ্গীতগুণ ও গাম্ভীর্যের ব্যঞ্জনা মধুসূদন নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছিলেন। সেদিক থেকে পয়ার ছাড়া বাঙলা কাব্যের আর কোনো ছন্দ কবির মনঃপূত না হওয়াই স্বাভাবিক। ত্রিপদী (লঘু বা দীর্ঘ), একাবলী ও স্বরবৃত্তে একাদশ অক্ষরের চরণবিশিষ্ট ইতালীয়

১. ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত তারিখহীন পত্র। দ্র° ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত 'মধুসূদনের রচনাবলী' (১৯৬৫), পৃঃ ৩৯।

২. ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারী গৌরদাস বসাককে লিখিত পত্র। দ্র° ঐ, পৃঃ ৩৯।

৩. ইতালীয় একাদশাক্ষর ছন্দের বিকল্প সন্ধান করতে গিয়েই ফরাসীরা দ্বাদশাক্ষর আলেকজান্দ্রাইন ও ইংরেজরা দশাক্ষর আয়াম্বিক পেণ্টামিটার ছন্দ সনেটের ছন্দ হিসেবে নির্বাচন করেছেন।

সনেটের ছন্দ-ব্যঞ্জনায় যে কোনো প্রতিধ্বনি পাওয়া যাবে না, এটা নিশ্চয়ই তাঁর সজাগ কান ধরতে পেরেছিল; কারণ এই বাঙলা ছন্দগুলিতে কোথায়ও একটা লঘু স্বর, কোথায়ও বা একটা চটুল গতি রয়েছে। ইংরেজী ভাষায় ওয়াটও প্রথমে সনেট চর্চা করতে গিয়ে কত বিচিত্র ছন্দ-প্রবণতাই না দেখিয়েছিলেন।[৪] কিন্তু কালক্রমে এটা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, এক দিকে যেমন ইংরেজী সনেটের ক্ষেত্রে ইতালীয় ছন্দের স্থানান্তরণ বাস্তবে অসম্ভব, অন্য দিকে তেমনি পঞ্চপর্বিক ছন্দ-পংক্তির অবতারণা অপরিহার্য।[৫] এই শেষোক্ত উপলব্ধি থেকেই কালক্রমে সারে, সিডনি, স্পেন্সার, সেক্সপীয়ার ইত্যাদির অনুশীলনের মধ্য দিয়ে দ্ব্যক্ষরভিত্তিক পঞ্চপর্বিক আয়াম্বিক ছন্দ (decasyllabled Iambic Pentameter) ইংরেজী সনেটে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মধুসূদনের কৃতিত্ব এই যে, তিনি একাই বাঙলা সনেটের বিশিষ্ট ছন্দ হিসেবে চতুর্দশমাত্রক পয়ারকে আবিষ্কার ও প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। তাছাড়া এটা দেখা গেছে যে, প্রত্যেক দেশেই কোনো জাতীয় বা প্রধান ছন্দে সনেট লেখা হয়েছে—'The metre...is usually the dominant[৬] metre of the language: in Italian, the hendecasyllable; in French, the alexandrine, in English, the decasyllable[৭]. অস্বীকার করার উপায় নেই, পয়ার ছন্দই বাঙালীর জাতীয় ও প্রধান ছন্দ—এর নমনীয়তা,

---

৪. 'Here (the opening four lines of sonnet no. XXXIII) are two lines of ten syllables each, almost without any stresses, and resembling in this the courtly kind of sixteenth century French verse; followed by a six-stress line that perhaps imitates the French alexandrine; followed by a line of eleven syllables based, it would seem, on the Italian pattern.'—The Elizabethan Love Sonnet, p. 17.

৫. ...he (Wyatt) felt, rightly enough, that there should generally be five feet—or at any rate five stresses in the line.'—The Italian influence in English Poetry, p. 72.

৬. সেণ্টস্‌বারি 'national' কথাটি ব্যবহার করেছেন।

৭. দ্র° Cassell's Encyclopaedia of Literature (vol. I), p. 512.

স্থিতিস্থাপকতা ও সর্বপ্রকারের ভাবপ্রকাশের ক্ষমতা অপরিসীম। সুতরাং মধুসূদন সঙ্গত কারণেই বাঙলা সনেটের ছন্দ হিসেবে পয়ারকে নির্বাচন করেছিলেন।

তৃতীয়তঃ, মধুসূদন নিশ্চয়ই অবহিত ছিলেন যে, সনেট হচ্ছে সমিল ছন্দের কবিতা। বাঙলা সনেটের ছন্দও যে সমিল হওয়া উচিত, এ-সম্বন্ধে শিল্প-সচেতন কবি মধুসূদনের সন্দেহ থাকার কোনো কারণ ছিল না। তৃতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, তিনি একটি মিলহীন ইংরেজী সনেট লিখেছিলেন। কিন্তু সেই কবিতাটির ভূমিকায় তিনি স্বীকার করেছিলেন যে, এ ধরনের চেষ্টা পূর্বে আর কেউ করেন নি। সুতরাং একটা দুঃসাহসিক কিছু করবার লোভেই তিনি যে মিলহীন কবিতাটি লিখেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। কবির 'impassioned exclamation' থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কবিতাটির জন্মমূলে কোনো শৈল্পিক প্রেরণা ছিল না, ছিল একটা কিশোরসুলভ কৌতুকপ্রবণতা ও গর্ববোধ। আর সে-কারণেই কবি-জীবনের পরিণত স্তরে তিনি যে মিলহীন সনেট রচনার আদর্শ অঙ্গীকার করে নেবেন না, তা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মনে রাখতে হবে, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' কোনো মিলহীন কবিতা নেই।

চতুর্থতঃ, মধুসূদন জানতেন যে, ইতালীয়, ইংরেজী ও ফরাসী ভাষায় আগাগোড়া দুই চরণের অন্ত্যমিলের সাহায্যে সনেট রচনার কোনো উল্লেখ-যোগ্য চেষ্টা হয় নি। পাশ্চাত্ত্য দেশের কবিরা সনেটের আদি ইতালীয় পর্ব থেকে একান্তর বা দূরান্তর মিল নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন এবং নানা রকমের মিলের ছক তৈরি করতে প্রয়াস পেয়েছেন; কিন্তু পূর্বাপর দুই চরণে মিল যোজনার রীতি তাঁরা পরিহার করে চলেছেন। অন্য দিকে আদি যুগ থেকে বাঙলা কাব্যে পয়ার-মিলের আধিপত্য[৮] চলতে থাকায় পাশ্চাত্ত্য সনেটের একান্তর বা দূরান্তর মিল বাঙলা সনেটে সার্থকভাবে প্রয়োগ করা মধুসূদনের পক্ষে সহজ ছিল না। অথচ সনেটের ক্ষেত্রে একান্তর বা দূরান্তর মিলের যে একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, তাতে যে এক

৮. আধুনিক-পূর্ব বাঙলা কাব্যে যে সমস্ত চতুর্দশপদীর নিদর্শন মেলে, তাতে একমাত্র পয়ার-মিলই দেখা যায়। দ্র° দ্বিতীয় অধ্যায়।

বিশেষ ধরনের ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টিতে সহায়তা হয়,[৯] একথা তিনি জানতেন। আর সেই কারণে প্রয়োজন মত একান্তর বা দূরান্তর মিল নিজের সনেটে প্রবর্তন করাই মধুসূদন সঙ্গত -বলে মনে করেছিলেন। পূর্বে স্বরচিত ইংরেজী সনেটেও তিনি পয়ার-মিল পরিহার করে সনেটের পক্ষে উপযোগী একান্তর বা দূরান্তর মিল প্রয়োগের চেষ্টা করেছিলেন। বাঙলায় সমধ্বনিসম্পন্ন শব্দের প্রাচুর্য আছে বলে ও প্রয়োজন মতো সংস্কৃত শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দ আহরণের সুযোগ থাকায় চার-পাঁচ মিলের পেত্রার্কীয় রীতি ও সাত মিলের সেক্সপীরীয় রীতি প্রবর্তনে তাঁর বিশেষ কোনো অসুবিধা হয় নি। বাঙলায় দ্বিমাত্রিক শব্দের বহুলতাও সুসঙ্গত মিল-যোজনায় তাঁর বিশেষ কাজে লেগেছিল। সুতরাং একথা বলা অন্যায় হবে না যে, পাশ্চাত্ত্য সনেটের অনুসরণে একান্তর বা দূরান্তর মিল মধুসূদন কৃতিত্বের সঙ্গেই যোজনা করতে পেরেছিলেন।[১০]

তাছাড়া বাঙলা সনেটে ইতালীয় সনেটের মিলগত ধ্বনিগুণ ও শ্রুতি-মাধুর্য বজায় রাখার বিষয়টিও নিশ্চয়ই মধুসূদন চিন্তা করেছিলেন। আমরা জানি, ইতালীয় সনেটে স্বরান্ত শব্দ বা অক্ষরের সাহায্যে মিল-যোজনার ফলে যে জাতীয় ধ্বনিমাধুর্য ও সঙ্গীতগুণ দেখা দিয়েছে, ইংরেজী ভাষায় স্বরান্ত শব্দ বা অক্ষরের অভাব থাকায় (সেখানে হলন্ত শব্দ ও অক্ষরেরই প্রাচুর্য) সে জাতীয় ধ্বনিমাধুর্য ও সঙ্গীতগুণ সৃষ্টি অসুবিধাজনক বলে ইংরেজ কবিদের কাছে মনে হয়েছিল। এবং ভিন্নতর রীতির সনেট ইংরেজী ভাষায় প্রবর্তনের তা ছিল অন্যতম কারণ। মধুসূদন সেই অসুবিধার কথা মনে রেখেই তাঁর সনেটের ছন্দে যুক্তবর্ণের সাহায্যে অক্ষরের ধ্বনিবৃদ্ধি, কাব্যপাঠের সময় হলন্ত অক্ষরের স্বরান্ত উচ্চারণের বাঙালীর স্বাভাবিক

৯. এ-সম্পর্কে আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

১০. ইংরেজী কাব্যের অনুসরণেই ('Then, pilgrim, turn, thy cares forgo: / All earth-born cares are wrong; / Man wants but little here below, / Nor wants that little long.') প্রথম বাঙলা কাব্যে একান্তর মিল দেখা দেয় (ফেরো তবে, ত্যজ তব ভাবনা পথিক, / লৌকিক ভাবনাচয় অলীক নিশ্চয়; / মহীজ অভাব মনুজের অনধিক, / যে কিঞ্চিৎ, তাও নাহি বহুদিন রয়। দ্র০ সংবাদ-প্রভাকর ১১ই বৈশাখ, ১২৬৫ বঙ্গাব্দ)।

প্রবণতা ও স্বরান্ত অক্ষরের পূর্ণ ধ্বনি-বিস্তারের সাহায্যে বাক্যগত ছন্দকে তরঙ্গিত করার সুযোগ দেখতে পেয়েছিলেন। কিন্তু মিলসূচক শব্দের ক্ষেত্রে সেই সম্ভাবনা নেই বলে তিনি ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন। তিনি স্থির করেছিলেন, যথাসম্ভব (ক) স্বরান্ত শব্দ বা অক্ষর ব্যবহার করবেন ; (খ) হলন্ত শব্দ বা অক্ষরকে বিভক্তিযোগে স্বরান্ত শব্দ বা অক্ষরে পরিণত করে নেবেন ; (গ) অসমাপিকা ক্রিয়াপদের দ্বারা চরণপ্রান্তিক মিল সম্পাদন করবেন। তৎসত্ত্বেও মিলের ক্ষেত্রে হয়ত কিছু হলন্ত শব্দ বা অক্ষর ব্যবহৃত হবে, কিন্তু তাতে মিলগত ধ্বনিগুণ ও শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টিতে তেমন ব্যাঘাত হবে না। সুতরাং এক্ষেত্রেও মধুসূদনের চিন্তা যে ঠিক পথেই এগিয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রসঙ্গক্রমে স্মরণ করা যেতে পারে যে, মধুসূদন 'মেঘনাদবধের' প্রথম সংস্করণে অনেক চরণের শেষে হলন্ত শব্দ বা অক্ষর ব্যবহার করে বুঝতে পেরেছিলেন যে তাতে প্রবহমাণ কাব্যচ্ছন্দ কতকটা পরিমাণে ব্যাহত হয়েছে। তাই তিনি পরবর্তীকালের সংস্করণে হলন্ত শব্দ বা অক্ষরের বদলে স্বরান্ত শব্দ বা অক্ষর ব্যবহার করে চরণ-প্রান্তিক ধ্বনিমাধুর্য ও কাব্যচ্ছন্দের প্রবহমাণতার উন্নতি বিধানের চেষ্টা করেছিলেন[১১]। কারণ তিনি জানতেন, ধ্বনিমাধুর্য বৃদ্ধির এটাই প্রকৃষ্ট উপায়।

পঞ্চমতঃ, মধুসূদন তাঁর সজাগ কানের সাক্ষ্য থেকে এই সিদ্ধান্তে পৌঁচেছিলেন যে, দুই মাত্রার স্বরান্ত শব্দই হচ্ছে বাঙলা কবিতার মিলের পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী। বাঙালীর উচ্চারণে একটা দ্বিমাত্রিকতার প্রবণতা আছে বলে উচ্চারণ-সৌকর্যের দিক থেকে অন্ত্যমিলে দুই মাত্রার শব্দের ব্যবহারই অধিকতর কাম্য। দুই মাত্রার শব্দের পরেই তিন মাত্রার শব্দের বসতি বাঙালীর রসনায় বেশী, কিন্তু সেই তিন মাত্রার শব্দকেও বাঙালী মৌখিক ভাষায় অনেক সময় দুই মাত্রার শব্দে পরিণত করে নেয়। কিন্তু কবিতায় শব্দের পূর্ণ উচ্চারণ প্রত্যাশিত এবং সেক্ষেত্রে বিজোড়ে বিজোড়ে শব্দের মালা গেঁথে অর্থাৎ তিনমাত্রার শব্দের পাশে তিনমাত্রার শব্দ যোজনা

১১. 'শারদীয় ঐকতানে' (১৩৭৪) এ-সম্বন্ধে অধ্যাপক গিরীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন, প্রথম সংস্করণের ৭৩টি সংবৃত অক্ষরান্ত চরণ ষষ্ঠ সংস্করণে বিবৃত অক্ষরান্ত চরণে পরিবর্তিত হয়েছে। ফলে কাব্যটির ৩০৯১টি চরণের মধ্যে ২৯২৫টি হয়েছে বিবৃত অক্ষরান্ত।

করে তিনি বাঙালীর দ্বিমাত্রিকতার প্রবণতাকেই অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেছিলেন (৩+৩=৬=২×২×২); কারণ ছয় মাত্রা দুই মাত্রার গুণিতক (multiple) মাত্র। মিলসূচক তিনমাত্রার শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে বাঙালীর স্বাভাবিক দ্বিমাত্রিকতার সমস্যাকে মধুসূদন এইভাবে সমাধান করতে চেয়েছিলেন। অন্য দিকে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, বাঙালীর মুখে স্বাভাবিকভাবে চার মাত্রার শব্দ বেশী আসে না, সুতরাং মিলের ক্ষেত্রেও এই ধরনের শব্দ যথাসম্ভব কম ব্যবহার করাই উচিত। তবে তিনি জানতেন, চার মাত্রার শব্দে বাঙালীর দ্বিমাত্রিকতার প্রবণতা ক্ষুণ্ণ হয় না, কারণ চার দুয়েরই দ্বিগুণ মাত্র। কিন্তু এই দ্বিমাত্রিকতার প্রবণতা ও উচ্চারণ-সৌকর্যের দিক থেকে পাঁচ মাত্রার শব্দ অবাঞ্ছিত বলে সনেটের মিলের ক্ষেত্রে তা একেবারে ব্যবহার না করারই সিদ্ধান্ত মধুসূদন গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়।

২.

বাঙলা ভাষায় সনেট প্রবর্তন করতে গিয়ে মধুসূদন যে সব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সেগুলিকে বলতে পারি বাঙলা সনেটের সূত্র-নির্ধারণের সমস্যা। সনেট মাত্রেই কতকগুলি কাব্যোপকরণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে এবং সেই উপকরণগুলি ব্যবহৃত করার ফলে কতকগুলি সাধারণ শিল্প-সূত্রও গড়ে ওঠে। মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য সনেট-সম্পর্কিত অব্যবহিত জ্ঞান নিয়ে এবং বাঙলা ভাষা ও ছন্দের ধাতু-প্রকৃতির প্রতি সচেতন থেকে বাঙলা সনেটের সেই সাধারণ শিল্প-সূত্রগুলি আগে নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন বলে মনে হয়। তা না হলে তাঁর সনেটগুলি প্রথম জন্মলগ্নেই এমন পূর্ণাঙ্গ ও পরিমার্জিত রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করত না, প্রথমে তার নানা অঙ্গে ত্রুটি থাকত এবং পরবর্তী সনেটগুলিতে সযত্ন সাধনার ফলে সেই ত্রুটি দূরীভূত হত। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, তাঁর সনেটের কোনো ক্রমবিকাশের ইতিহাস নেই, তাঁর রচিত প্রথম সনেটের যা দোষ-গুণ তা শেষ সনেটের মধ্যেও সমভাবে বিদ্যমান। এ থেকে আরও সিদ্ধান্ত করতে হয় যে, মধুসূদন একটা abstract form হিসেবেই বাঙলা ভাষায় সনেটের চর্চা করেছিলেন।

আমরা পূর্বে দেখেছি, মধুসূদন যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পবোধের সঙ্গে সনেটের উপকরণ নির্বাচন ও তার সাধারণ শিল্প-সূত্র নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। কিন্তু

উপকরণ সংগ্রহ ও সাধারণ শিল্প-সূত্র নির্ধারণ করার পরও একটা প্রশ্ন থেকে যায়। একতাল মাটি নিয়ে যেমন শিব আর পুতুল দুইই গড়া যায়, তেমনি একই উপকরণ নিয়ে পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় দুই রকমের সনেটই রচনা করা যায়। শিল্পী কোন্ মূর্তি গড়বেন বা কবি কোন্ জাতীয় সনেট রচনা করবেন সেটা নির্ভর করে কতক-গুলি বিশেষ শিল্প-সূত্র অনুসরণের ওপর। সনেটের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দুই জাতীয় বিশেষ শিল্প-সূত্র আছে—পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয়। এর মধ্যে কোন্‌টি তিনি অনুসরণ করবেন বলে ঠিক করে নিয়েছিলেন, সেটা বিচার করে দেখা দরকার।

আমরা পূর্বে দেখেছি, ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন যখন 'কবি-মাতৃভাষা' শীর্ষক প্রথম সনেট রচনা করেন, তখন রাজনারায়ণ বসুকে চিঠিতে লিখেছিলেন যে, প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা চর্চা করলে আমাদের সনেট ইতালীয় সনেটের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারবে। এ থেকে বোঝা যায়, প্রথম থেকেই মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল ইতালীয় সনেটের দিকে। তারও আগে কবি যে সমস্ত ইংরেজী সনেট লিখেছিলেন, তাতে সংখ্যার দিক থেকে পেত্রার্কীয় আদর্শাশ্রিত কবিতাই বেশী ছিল (অবশ্য সংখ্যায় কম হলেও সেক্সপীরীয় রীতির সনেটগুলিতে দক্ষতা বেশী প্রকাশ পেয়েছে)।[১] তাছাড়া 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' প্রথম সংস্করণে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত উপক্রম ভাগের দ্বিতীয় কবিতাটিতে তিনি স্পষ্টভাবেই পেত্রার্কীয় আদর্শ অনুসরণের কথা জানিয়েছেন—

ইতালী, বিখ্যাত দেশ, কাব্যের কানন,
....
সে দেশে জনম পূর্বে করিলা গ্রহণ
ফ্রাঞ্চিস্কো পেতরার্কা কবি ;............
কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি,
স্বমন্দিরে প্রদানিলা বাণীর চরণে
কবীন্দ্র ;.........
ভারতে ভারতী-পদ উপযুক্ত গণি,
উপহার রূপে আজি অরপি রতনে॥

এখানে পাশ্চাত্য সনেটের কবিগুরুকে তিনি বাঙলা সনেটের কবিগুরু রূপে বরণ করে নিয়েছেন।

---

১. এ-সম্পর্কে আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন উঠতে পারে, মধুসূদনের মূল ইতালীয় সনেটের সঙ্গে কতখানি পরিচয় ছিল? তিনি কি মূল ইতালীয় সনেট থেকে সরাসরি পেত্রার্কীয় সনেট-আদর্শ গ্রহণ করেছেন, না কি ইংরেজী ভাষায় লিখিত সনেট থেকে পেত্রার্কীয় আদর্শ গ্রহণ করেছেন? কবি যখন হিন্দু-কলেজ ও মাদ্রাজ-প্রবাস পর্বে ইংরেজী সনেট লিখেছিলেন তখন তিনি ইতালীয় ভাষা জানতেন না। তবে মাঝখানে বিশপ্‌স কলেজে থাকাকালীন ল্যাটিন শিখেছিলেন। সুতরাং ইংরেজী সনেট লেখার সময়ে মধুসূদন ইংরেজ কবিদের লিখিত বা অনূদিত সনেট থেকেই পেত্রার্কীয় আদর্শ পেয়েছিলেন। কিন্তু ফ্রান্সে ভার্সাই সহরে বসে তিনি যখন চতুর্দশপদী কবিতাগুলি লিখেছিলেন তখন তিনি ইতালিয়ান্ জানতেন। ১৮৬৪ সালের ১১ই জুলাই ভার্সাই থেকে লেখা এক চিঠিতে আছে—'I am getting on well with French and Italian. I must commence German soon. Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian. I wrote a long letter in Italian to Satyendra the other day…."[২] তাছাড়া দান্তের ষষ্ঠ-শতবার্ষিকী জন্মোৎসব উপলক্ষে তিনি ইতালীর রাজার কাছে 'কবিগুরু দান্তে' শীর্ষক যে বাঙলা সনেটটি পাঠিয়েছিলেন, তার সঙ্গে স্বকৃত ইতালীয় অনুবাদও দিয়েছিলেন। তাই অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' লেখার সময়ে মূল ইতালীয় সনেটের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন এবং সেদিকে লক্ষ্য রেখেই বাঙলা সনেটগুলি লিখেছিলেন।

তবে এই সবই বাহ্য প্রমাণ মাত্র। এবং কেবলমাত্র তার ওপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্তে পৌছোনো ঠিক নয়। প্রমথ চৌধুরী 'সনেট-পঞ্চাশৎ'-এর প্রথম কবিতায় লিখেছিলেন—'পেত্রার্কা-চরণে ধরি করি ছন্দোবন্ধ' এবং 'ইতালীর ছাঁচে ঢেলে বাঙালীর ছন্দ,/গড়িয়া তুলিতে চাই স্বরূপ সনেট।' কিন্তু কাব্য-গ্রন্থটির অধিকাংশ সনেটই ফরাসী রীতিতে লিখিত। তিনি নিজেও একথা স্বীকার করেছেন—'পেত্রার্কা এবং সনেট এ দুটি পরস্পর আপেক্ষিক (correlative) শব্দ হয়ে উঠেছে বললেও অত্যুক্তি হয় না। সেই কারণেই আমি যদিচ তাঁর

২ মধুস্মৃতি, পৃঃ ৭৭৭-৭৮।

পদানুসরণ করি নি, তবুও পেত্রার্কার চরণ বন্দনা করে আসরে নামি।[৩] এই কারণেই চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুসূদনের সনেট-আদর্শ নির্ধারণ করতে গিয়ে শুধু বাহ্য-প্রমাণের ওপর নির্ভর না করে আভ্যন্তর প্রমাণও সংগ্রহ করা দরকার।

সেই আভ্যন্তর প্রমাণ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে মধুসূদনের রচিত ১০৮টি[৪] সনেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তার মধ্যে ১০৩টি সনেট পেত্রার্কীয় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। মিলের পদ্ধতি, অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ এবং প্রথম চতুষ্ক ও অষ্টকের শেষে ছেদ ব্যবহার[৫]—মোটামুটিভাবে এই সূত্রগুলি প্রয়োগ করে সেই ১০৩টি সনেট নিচে বিশ্লেষণ করছি—

৩. সনেট-পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা (১৮৭৩ শকাব্দ), পৃঃ ১৫৪।

৪. 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' প্রথম সংস্করণে ১০২টি সনেট প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি আরও ৬টি সনেট লিখেছিলেন। সুতরাং মধুসূদনের রচিত সনেটের মোট সংখ্যা হচ্ছে ১০২+৬=১০৮টি।

৫. ত্রিকের শেষে ছেদের প্রশ্নটি আমরা তুলি নি। কারণ মধুসূদন সনেটের ষট্‌কে ত্রিক রচনার দিকে দৃষ্টি রেখেছিলেন বলে মনে হয় না।

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	॥ অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ॥ ॥ প্রথম চতুষ্ক-শেষে ছেদ ॥ ॥ অষ্টকের শেষে ছেদ ॥	রীতি
[ক-বিভাগ]			
কমলে কামিনী	কখখক কখখক চছজ চছজ	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয়
[খ-বিভাগ]			
সায়ংকালের তারা	কখখক কখখক চছচছচছ	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	বিঃ পেত্রার্কীয়
মহাভারত	,,	নেই ॥ আছে ॥ উপ° আছে ॥	মিল্টনীয়
ঈশ্বরী পাটনী	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	বিঃ পেত্রার্কীয়
শ্মশান	,,	আছে ॥ উপ° আছে ॥ আছে ॥	,,
সংস্কৃত	,,	নেই ॥ উপ° আছে ॥ উপ° আছে ॥	মিল্টনীয়
রামায়ণ	,,	আছে ॥ উপ° আছে ॥ আছে ॥	বিঃ পেত্রার্কীয়
কোন এক পুস্তকের ভূমিকা পড়িয়া	,,	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	,,
[গ-বিভাগ]			
উপক্রম (১)	কখকখ কখকখ চছচছচছ	॥ নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	মিল্টনীয়
উপক্রম (২)	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ নেই ॥	শিথিল পেত্রার্কীয়
অন্নপূর্ণার ঝাঁপি	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	,,

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	॥ অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ॥ ॥ প্রথম চতুষ্ক-শেষে ছেদ ॥ ॥ অষ্টকের শেষে ছেদ ॥	রীতি
[গ] পরিচয় (১)	কখকখ কখকখ চছচছচছ	॥ নেই ॥ নেই ॥ আছে ॥	মিল্টনীয়
কবি	,,	॥ নেই[১] ॥ আছে ॥ নেই ॥	,,
দেবদোল	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	,,
কুসুমে কীট	,,	॥ নেই ॥ নেই ॥ আছে ॥	,,
সরস্বতী	,,	॥ নেই ॥ নেই ॥ নেই ॥	,,
কল্পনা	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ উপ° আছে ॥	,,
মধুকর	,,	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ উপ°আছে ॥	,,
গঙ্গাতীরে প্রাচীন দ্বাদশ শিবমন্দির	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
কিরাত-আর্জুনীয়ম্	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	মিল্টনীয়
সীতা-বনবাসে (২)	,,	॥ নেই ॥ নেই ॥ নেই ॥	,,
বিজয়া-দশমী	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা	,,	॥ আছে ॥ উপ° আছে ॥ আছে ॥	,,
বীর-রস	,,	॥ নেই ॥ উপ° আছে ॥ আছে ॥	মিল্টনীয়

১. ভাবের দিক থেকে ৪+১০=১৪ এই বিভাগ আছে ॥

৩ ১ সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	॥ অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ॥ ॥ প্রথম চতুষ্ক-শেষে ছেদ ॥ ॥ অষ্টকের শেষে ছেদ ॥	রীতি
[গ] গোগৃহ-রণে	কখকখ কখকখ চছচছচছ	॥ নেই ॥ আছে ॥ নেই ॥	মিল্টনীয়
দুঃশাসন	,,	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ উপ°আছে ॥	,,
দ্বেষ (২)	,,	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	,,	॥ নেই ॥ নেই ॥ আছে ॥	মিল্টনীয়
সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর	,,	॥ নেই ॥ উপ° আছে ॥ নেই ॥	,,
শিশুপাল	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ নেই ॥	,,
অর্থ	,,	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	,,
হরিপর্বতে দ্রৌপদীর মৃত্যু	,,	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	,,
আমরা	,,	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ আছে ॥	মিল্টনীয়
শকুন্তলা	,,	॥ আছে ॥ উপ°আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
ব্রজ-বৃত্তান্ত	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	মিল্টনীয়
পঞ্চকোট-গিরি	,,	॥ নেই ॥ নেই ॥ নেই ॥	•

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	॥ অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ॥ ॥ প্রথম চতুষ্ক-শেষে ছেদ ॥ ॥ অষ্টকের শেষ ছেদ ॥	রীতি
[ঘ-বিভাগ]			
কালিদাস	কখকখ খকখক চছচছচছ	॥ আছে ॥ উপ°আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
'বউ কথা কও'	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	,,
কবিতা	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	মিণ্টনীয়
নিশা	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
বটবৃক্ষ-তলে শিব-মন্দির	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ নেই ॥	মিণ্টনীয়
বটবৃক্ষ	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	,,
রাশিচক্র	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ নেই ॥	,,
সুভদ্রা	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
দ্বেষ (১)	,,	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ নেই ॥	মিণ্টনীয়
তারা	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	,,
কবিগুরু দান্তে	,,	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
ভারতভূমি	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	,,
ভূতকাল	,,	॥ আছে ॥ উপ°আছে ॥ আছে ॥	,,
কবির ধর্মপুত্র	,,	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ আছে ॥	মিণ্টনীয়

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	‖ অষ্টক-ষট্ক বিভাগ ‖ ‖ প্রথম চতুষ্ক-শেষে ছেদ ‖ ‖ অষ্টকের শেষে ছেদ ‖	রীতি
[ঙ-বিভাগ]			
পরিচয় (২)	কখকখ কখখক চছচছচছ	‖ আছে ‖ নেই ‖ আছে ‖	শিঃ পেত্রার্কীয়
কপোতাক্ষ নদ	,,	‖ আছে ‖ নেই ‖ আছে ‖	,,
সীতা-বনবাসে (১)	,,	‖ নেই ‖ নেই ‖ নেই ‖	মিল্টনীয়
শৃঙ্গার-রস (২)	,,	‖ আছে ‖ আছে ‖ আছে ‖	শিঃ পেত্রার্কীয়
উর্বশী	,,	‖ নেই ‖ নেই ‖ আছে ‖	মিল্টনীয়
হিড়িম্বা (১)	,,	‖ আছে ‖ নেই ‖ আছে ‖	শিঃ পেত্রার্কীয়
হিড়িম্বা (২)	,,	‖ আছে ‖ নেই ‖ আছে ‖	,,
নূতন বৎসর	,,	‖ আছে ‖ উপ°আছে ‖ আছে ‖	,,
কেউটিয়া সাপ	,,	‖ আছে ‖ আছে ‖ আছে ‖	,,
শনি	,,	‖ আছে ‖ নেই ‖ আছে ‖	,,
…গোল্ডষ্টুকর	,,	‖ আছে ‖ আছে ‖ আছে ‖	,,
পৃথিবী	,,	‖ নেই ‖ উপ° আছে ‖ উপ°আছে ‖	মিল্টনীয়
সমাপ্তে	,,	‖ নেই ‖ আছে ‖ নেই ‖	,,
.. অভিনন্দনের উত্তরে	,,	‖ নেই ‖ আছে ‖ নেই ‖	,,

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	॥ অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ॥ ॥ প্রথম চতুষ্ক-শেষে ছেদ ॥ ॥ অষ্টকের শেষে ছেদ ॥	রীতি
পরেশনাথ গিরি	কখকখ কখখক চছচছচছ	॥ নেই ॥ আছে ॥ নেই ॥	মিণ্টনীয়
[চ-বিভাগ]			
সূর্য	কখকখ খককখ চছচছচছ	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ আছে ॥	মিণ্টনীয়
...এক মান্যবন্ধুর উপলক্ষে	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
কুরুক্ষেত্রে	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ উপ°আছে ॥	মিণ্টনীয়
শৃঙ্গার-রস (১)	,,	॥ নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	,,
[ছ-বিভাগ]			
সায়ংকাল	কখখক খকখক চছচছচছ	॥ নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	,,
ছায়াপথ	,,	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
সৃষ্টিকর্তা	,,	॥ নেই ॥ নেই ॥ নেই ॥	মিণ্টনীয়
নন্দনকানন	,,	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ আছে ॥	,,
...একটি পাখির প্রতি	,,	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
ভরেসলস্ নগরে রাজপুরী...	,,	॥ নেই ॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥	মিণ্টনীয়
পরলোক	,,	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ নেই ॥	,,

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	॥ অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ॥ ॥ প্রথম চতুষ্ক-শেষে ছেদ ॥ ॥ অষ্টকের শেষে ছেদ ॥	রীতি
[জ] ...ভিকৃতর হ্যগো	কখখক কখকখ চছচছচছ	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
শ্রীমন্তের টোপর	,,	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ উপ°আছে ॥	মিণ্টনীয়
[ঝ-বিভাগ]			
শ্রীপঞ্চমী	কখখক খককখ চছচছচছ	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
আশ্বিন মাস	,,	॥ নেই ॥ নেই ॥ নেই ॥	মিণ্টনীয়
করুণ-রস	,,	॥ নেই ॥ উপ°আছে ॥ উপ°আছে ॥	,,
[ঞ-বিভাগ]			
কবি-মাতৃভাষা	কখকখ খকখক চছছচছচ	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়
[ট-বিভাগ]			
কৃত্তিবাস	কখকখ কখকখ চছজচছজ	॥ আছে ॥ উপ°আছে ॥ উপ°আছে ॥	,,
[ঠ-বিভাগ]			
মেঘদূত (১)	কখকখ খকখক চছছচছচ	॥ আছে ॥ আছে ॥ উপ°আছে[১] ॥	শি : পেত্রার্কীয়

১. অষ্টম চরণের পর উপচ্ছেদ আছে বটে, তবু অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ সুস্পষ্ট।

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	॥ অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ ॥ ॥ প্রথম চতুষ্ক-শেষে ছেদ ॥ ॥ অষ্টকের শেষ ছেদ ॥	রীতি
[ঙ-বিভাগ] পুরুরবা	কখকখ খকখক চখচখচখ[1]	॥ নেই ॥ আছে ॥ উপ°আছে ॥	মিল্টনীয়
[চ-বিভাগ] বাল্মীকি	কখখক ককখক[2] চছচছচছ	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	ভঙ্গ পেত্রার্কীয়
[ণ-বিভাগ] পঙ্কোটস্য রাজশ্রী	কখখক খকখক চখখচখচ[3]	॥ আছে ॥ নেই ॥ আছে ॥	,,
[ত-বিভাগ] যশের মন্দির	কখখক খকখক চছছচছচ	॥ আছে ॥ আছে ॥ আছে ॥	শিঃ পেত্রার্কীয়

১. ষট্‌কে অষ্টকের খ-মিলের পুনরাবৃত্তি লক্ষণীয়।

২. দ্বিতীয় চতুষ্কের মিল-যোজনা অদ্ভুত।

৩ ষট্‌কে অষ্টকের খ-মিলের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

উপরি-উক্ত বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যায়, সাধারণভাবে পেত্রার্কীয় মণ্ডলের অন্তর্গত ১০৩টি সনেট আবার চার শ্রেণীতে বিভাজ্য : বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয়, শিথিল পেত্রার্কীয়, ভঙ্গ পেত্রার্কীয় ও মিল্টনীয়। বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় সনেট হিসেবে সেগুলিকেই গ্রহণ করা হয়েছে যাতে (ক) মিলের পদ্ধতি হচ্ছে কখখক কখখক চছজ চছজ/চছচছচছ ; (খ) অষ্টক-ষট্ক বিভাগ অক্ষুণ্ণ আছে। এই শ্রেণীর সনেটের সংখ্যা হচ্ছে ৬টি। এই ৬টির মধ্যে একটির ষট্‌কে মাত্র ('কমলে কামিনী') চছজ চছজ মিল অনুসৃত হয়েছে[৬]। এছাড়া ৪৫টি সনেট আছে যাদের বলেছি শিথিল পেত্রার্কীয় সনেট। এই শ্রেণীর সনেটগুলিতে অষ্টকে বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় আদর্শসম্মত কখখক কখখক মিল-বিন্যাস নেই, তার বদলে আছে আট রকমের মিল-বৈচিত্র্য—(১) কখকখ কখকখ, (২) কখকখ খকখক, (৩) কখকখ কখখক, (৪) কখকখ খককখ (৫) কখখক খকখক, (৬) কখখক কখকখ, (৭) কখখক খককখ, (৮) কখখক ককখক। এবং ষট্‌কে আছে পাঁচ রকমের মিল-বৈচিত্র্য—(১) চছচছচছ, (২) চছছচছচ (৩) চছজচছজ (৪) চথচথচথ (৫) চথখচখচ। অষ্টকে ও ষট্‌কে এই মিলগত বৈচিত্র্য যেমন আছে তেমনি আবার অষ্টকের শেষে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহারেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখা যায়। তবে অষ্টক-ষট্ক বিভাগ আছে। আর সেই কারণেই এদের শিথিল পেত্রার্কীয় সনেট বলা হয়েছে। যে দুটি কবিতা ভঙ্গ পেত্রার্কীয় সনেট হিসেবে নির্দেশিত হয়েছে তাদের মধ্যে শিথিল পেত্রার্কীয় সনেটের ত্রুটিগুলি তো আছেই, তার অতিরিক্ত আছে দু'ধরনের গুরুতর ত্রুটি—(১) ষট্‌কে অষ্টকের মিলের পুনরাবর্তন ('পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী') ; (২) অষ্টকে দ্বিপদীর সংযোজন ('বাল্মীকি')। এই গুরুতর ত্রুটির জন্য সনেটগুলির মধ্যে পেত্রার্কীয় সনেট-লক্ষণের যে বিপর্যয় ঘটেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এদের ভেতরেও অষ্টক-ষট্ক বিভাগ অক্ষুণ্ণ আছে। অবশিষ্ট ৫০টি মিল্টনীয় সনেট।

৬ অবশ্য এই ত্রিক-ভিত্তিক ষট্‌কেও (এই জাতীয় ষট্‌কের কৌলীন্য পেত্রার্কীয় সনেটের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশী) প্রথম ত্রিকের শেষে কোনো প্রকারের ছেদ ব্যবহার করা হয় নি বলে ত্রিক দুইটি বিযুক্ত থাকে নি। অন্য দিকে এই ছয়টি সনেটের মধ্যে দুইটিতে প্রথম চতুষ্কের শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই। এ সবই বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় সনেট-লক্ষণের ব্যতিক্রম, তবু ত্রুটিগুলি গুরুতর নয় বলে ছয়টিকেই মোটামুটিভাবে বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় সনেটের মর্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

এদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগের অনুপস্থিতি এবং ভাবের একটানা প্রবাহ ('uninterrupted train of thought')। এদিক থেকে মিল্টনের সনেটের সঙ্গে[৭] এই ৫০টি সনেটের মিল আছে। অবশ্য সনেটগুলির মধ্যে যে মিল-বৈচিত্র্য দেখা যায় তা মিল্টনীয় সনেটের আদর্শসম্মত নয়।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, এই ১০৩টি সনেটকে একই পেত্রার্কীয় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করার যৌক্তিকতা আছে কি? এর উত্তরে এই ১০৩টি সনেটেরই তিনটি সাধারণ লক্ষণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে—(১) এই সব সনেটে অষ্টকে পেত্রার্কীয় সনেটের মতো দুইটি মাত্র মিল ব্যবহৃত হয়েছে; (২) পেত্রার্কীয় আদর্শ অনুসরণে সবগুলির ষট্‌কেই দুই বা তিন মিলের প্রয়োগ ঘটেছে (১০১টিতে দুই মিল, ২টিতে তিন মিল)[৮]; (৩) পেত্রার্কীয় সনেটে যেমন, তেমনি এই ১০৩টি সনেটেই স্বরান্ত মিলের সুপ্রচুর ব্যবহার হয়েছে; (৪) ত্রুটি-বিচ্যুতি, শিথিলতা ও অভিনবত্ব সত্ত্বেও বহিরঙ্গ লক্ষণ ও একটা কেন্দ্রীয় ভাবের রূপায়ণের দিক থেকে এদের মধ্যে পেত্রার্কীয় সনেটের আদল যে রয়েছে, তা ধরা যায়। তাছাড়া বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয়, শিথিল পেত্রার্কীয় ও ভঙ্গ পেত্রার্কীয় সনেট-গুলিতে পেত্রার্কীয় আদর্শসম্মত অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ আছে; আর মিল্টনীয় সনেটকে পাশ্চাত্ত্য দেশেও পেত্রার্কীয় সনেট হিসেবেই গ্রহণ করা হয়। এইসব কারণেই উল্লিখিত ১০৩টি সনেটকে পেত্রার্কীয় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা অসঙ্গত নয়।

এই ১০৩টি সনেট ছাড়া মধুসূদন আরও ৫টি সনেট লিখেছেন। সেই ৫টি-র শেষে পয়ারপুচ্ছ বা দ্বিপদী আছে বলে (পেত্রার্কা-রচিত কোনো কোনো সনেটের শেষে দ্বিপদী থাকলেও তাকে সেক্সপীরীয় বৈশিষ্ট্য হিসেবেই ধরা হয়), সেগুলিকে সেক্সপীরীয় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করে বিভিন্ন দিক থেকে বিচার করছি—

৭. মিল্টনীয় সনেট সম্পর্কে আলোচনা প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। মিল্টনের সনেটকে সেণ্টস্‌বারি ভাবের একটানা প্রবাহ ও অষ্টক-বিহীনতার জন্য 'verse-paragraph' বলেছেন।

৮. 'পুরুরবা' ও 'পঙ্কোটস্থ রাজশ্রী'-তে ষট্‌কে অষ্টকের একটি মিলের পুনরাবর্তন অসাবধানতার পরিচায়ক বলে আমরা মনে করি। সমগ্র কবিতার দিক থেকে এটা দোষাবহ হলেও পৃথকভাবে বিচার করলে এদের ষট্‌কেও দুটি মিল আছে।

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	॥ বিভিন্ন চতুষ্কে বিভিন্ন মিল ॥ ॥ প্রতি চতুষ্কে একান্তর মিল ॥ ॥ অন্তিম দ্বিপদীতে পৃথক মিল ॥	মিলের সংখ্যা
বঙ্গভাষা	কখকখ খকখক গঘঘগ চচ	॥ দ্বিতীয়ে নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	৫
কাশীরাম দাস	কখকখ কখকখ গঘগঘ চচ	॥ দ্বিতীয়ে নেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	৫
জয়দেব	কখখক খকখক গঘঘগ কক	॥ দ্বিতীয় নেই ॥ প্রথম ও তৃতীয়ে নেই ॥ নেই ॥	৪
মেঘদূত (২)	কখখক কখকখ কগকগ কক	॥ নেই ॥ প্রথমে নেই ॥ নেই ॥	৩
পুরুলিয়া	কখকখ কখখক গঘগঘ চচ	॥ দ্বিতীয়েনেই ॥ আছে ॥ আছে ॥	৫

এই বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাবে যে, (১) বিভিন্ন ও একান্তর মিলের দ্বারা গঠিত চতুষ্কত্রয় কোনো কবিতাতেই নেই ; (২) সব কয়টিতেই অন্তিম দ্বিপদী সংযোজিত হয়েছে বটে, তবে কোনো কোনোটির ('জয়দেব' ও 'মেঘদূত—২') দ্বিপদীতে চতুষ্কের 'ক'-মিলের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে ; (৩) সাতটি মিলের দ্বারা সেক্সপীরীয় সনেট রচনার যে রীতি আছে তা কোনো সনেটেই অনুসৃত হয় নি। এই সনেটগুলিতে সর্বোচ্চ ৫টি ও সর্বনিম্ন ৩টি মিল মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে, মধুসূদন একটিও বিশুদ্ধ সেক্সপীরীয় সনেট রচনা করেন নি ; সব কয়টিই ভঙ্গ সেক্সপীরীয় রীতির সনেটের উদাহরণ মাত্র। তাছাড়া লক্ষণীয় এই যে,এই উদাহরণগুলির প্রত্যেকটিতে অষ্টকে দুইটি মিল আছে এবং সেই দুইটি মিলে পেত্রার্কীয় অষ্টকসম্মত দুই মিলের প্রভাব থাকা খুবই স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে (এই সনেটগুলির অষ্টকে পেত্রার্কীয় রীতি এবং শেষে সেক্সপীরীয় দ্বিপদী থাকায়) সনেটগুলিকে মিশ্ররীতির রচনা হিসাবেও নির্দেশ করা যায়। অতএব দেখা গেল, মধুসূদনের রচিত ১০৮টি সনেটের পরিচয় হচ্ছে—

বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয়—	৬	পেত্রার্কীয় মণ্ডল
শিথিল পেত্রার্কীয়—	৪৫	
ভঙ্গ পেত্রার্কীয়—	২	
মিল্টনীয়—	৫০	
ভঙ্গ সেক্সপীরীয়—	৫	সেক্সপীরীয় মণ্ডল
	১০৮	

পূর্বে দেখিয়েছি যে, পেত্রার্কীয় সনেট-আদর্শ অনুসরণ করে বাঙলা সনেটগুলি যে মধুসূদন লিখেছিলেন, তার সপক্ষে অনেক বাহ্য-প্রমাণ আছে। এখন আভ্যন্তর প্রমাণেও দেখা গেল, তাঁর রচিত ১০৮টি সনেটের মধ্যে ১০৩টিই পেত্রার্কীয় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। তবে তিনি বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় সনেট খুব কম লিখেছেন। সংখ্যার দিক থেকে শিথিল পেত্রার্কীয় ও মিল্টনীয় রীতির সনেটই বেশী। মিল্টনের ভক্ত-শিষ্য কবি-পুরুষের পক্ষে এটা অস্বাভাবিক নয়।[৯] অন্য দিকে লক্ষণীয় এই যে, মধুসূদন তখন ফরাসী দেশে অবস্থান করলেও এবং ফরাসী ভাষায় বিশেষ অধিকার অর্জন করলেও সনেটের ফরাসী রীতির দিকে কিছুমাত্র আকৃষ্ট হন নি।

৯. মধুসূদনের সনেটগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দসুলভ ভাবের প্রবহমাণতা ও ছেদ-ব্যবহারে স্বাধীনতাও মিল্টনের প্রভাব স্মরণ করিয়ে দেয়।

আমরা দেখেছি, মধুসূদন কতকগুলি সাধারণ শিল্প-সূত্র নির্ধারণ করে নিয়ে বং পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেটের বিশেষ শিল্প-সূত্রগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে ঙলা সনেট রচনা করেছিলেন। তবে পাশ্চাত্ত্য পূর্বসূরীদের আদর্শ তিনি বিকল অনুসরণ করতে চান নি, কোনো কোনো দিক থেকে স্বাধীন পন্থা বলম্বন করতে চেয়েছিলেন। যারা নিয়মের ভক্ত তারা মধুসূদনের সনেটে ই নিয়মের ব্যতিক্রম বা স্বাধীন পন্থাকে শৈথিল্য বা ত্রুটি হিসেবেই গণ্য রবেন। তবে সেই স্বাধীনতা বা শৈথিল্য (বা ত্রুটি) দেখা দিয়েছে পুঙ্খানুপুঙ্খ য়মের ক্ষেত্রে, স্থূল নিয়মগুলি কম-বেশী অক্ষুণ্ণই আছে।[১] আর সেজন্য য়মের ব্যতিক্রম থাকা সত্ত্বেও তাঁর কবিতাগুলি তাদের বিশেষ পরিচয় হারিয়ে েলে নি এবং তাদের সনেট বলে চিনে নিতেও আমাদের কষ্ট হয় না।

সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত, মধুসূদনের হাতে বাঙলা সনেটের স্বাভাবিক ত্রপাত ঘটেছিল। কিন্তু তার সূত্রপাত যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, তা ল্পসৃষ্টি হিসেবে কতখানি সার্থকতা লাভ করেছে সেটা আমাদের বিচার করে খতে হবে। ছন্দ, মিল, ভাষা, প্রকাশভঙ্গি, কবিত্ব, ভাব ও রূপের সামঞ্জস্য— ই সব দিক থেকে আমরা সেই বিচারে প্রবৃত্ত হচ্ছি।

পূর্বে বলেছি, মধুসূদন বাঙলা সনেটের ছন্দ হিসেবে চতুর্দশমাত্রক পয়ারকে অক্ষরবৃত্ত) গ্রহণ করেছিলেন, কারণ ধ্বনিগুণ ও ছন্দঃস্পন্দের দিক থেকে কমাত্র পয়ারই ইতালীয় সনেটের ছন্দের বিকল্প হিসেবে গৃহীত হতে পারে বলে তাঁর মনে হয়েছিল।[২] তাছাড়া পয়ারে লিখিত সনেটগুলির প্রতি চরণের পরিমাপ যাতে চোদ্দ মাত্রার কম বা বেশী না হয়, সেদিকেও তিনি কঠোর দৃষ্টি রেখেছিলেন। তার একটি ব্যতিক্রম হচ্ছে এই চরণটি—

যথায় শিশিরের বিন্দু ফুল্ল ফুল-দলে ('নন্দন-কানন')

১. ৫০টি পেত্রার্কীয় সনেটে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ না-থাকাটা স্থূল নিয়মের বিরোধী, সন্দেহ নেই, তবে সে অপরাধে মিল্টন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ প্রমুখ অনেক কবিই অপরাধী। তৎসত্ত্বেও তাঁদের সনেট পেত্রার্কীয় সনেট নামেই অভিহিত।

২. পয়ারের ধ্বনিগুণ সম্বন্ধে মধুসূদনের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য—'if well-recited, sounds as much like prose as English Blank-verse sounds like English prose—retaining at the same time a sweet musical impression.'—মধু-স্মৃতি।

এখানে স্পষ্টতঃই ১৫ মাত্রা আছে। তবে এটা অনবধানতা বশতঃ ঘটেছে বলে মনে হয়।[৩] খুব সম্ভব পাণ্ডুলিপিতে 'যথা' ছিল, কিন্তু মুদ্রণের সময় সেটা যে 'যথায়' হয়ে গিয়ে এক মাত্রা বাড়িয়ে দিয়েছে সেটা কবি এমন কি দ্বিতীয় সংস্করণেও খেয়াল করেন নি। কিংবা হয়ত 'শিশিরবিন্দু' ছিল, কিন্তু প্রথম দুই সংস্করণেই তা 'শিশিরের বিন্দু' মুদ্রিত হয়েছে। অন্য দিকে নিচের ছত্রে চোদ্দ মাত্রার জায়গায় বারো মাত্রার সংস্থান লক্ষণীয়—

ভাসে শিশু যবে, কে সান্ত্বনে তারে ?

মনে হয়, এখানে মুদ্রাকর-প্রমাদ বশতঃ একটি দুই মাত্রার শব্দ বাদ পড়ে গিয়েছে। সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের সম্পাদকদ্বয়ের মতে, মূল পাঠ বোধ হয় ছিল—'ভাসে শিশু যবে, কহ, কে সান্ত্বনে তারে ?' মধুসূদনের কাব্য-প্রকরণের সঙ্গে যারা পরিচিত, তাদের কাছে সম্পাদকদ্বয়ের এ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বলেই মনে হবে।

এছাড়া 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' কোনো কোনো ক্ষেত্রে মাত্রা গণনায়ও একটা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

১. দেবীর প্রসাদে তোমা রাজপদে বরি,
রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে
রাজলক্ষ্মী ; —অন্নপূর্ণার ঝাঁপি।

২. না দেয় শোভিতে কভু ফুলরত্নে কেশে,
—বসন্তে একটি পাখীর প্রতি।

৩. ভবিষ্যদ্‌বক্তা কবি সতত এ ভবে,
—কবিবর ভিক্তর হ্যূগো।

৪. পাখা-রূপ ঘোমটায় ঢেকেছে বদনে ?
—'বউ কথা কও।'

এই উদ্ধৃতি চারটিতে কবি 'রাজপদ', 'রাজছত্র', 'রাজলক্ষ্মী', 'ফুলরত্নে' ও 'ঘোমটায়' চার মাত্রা এবং 'ভবিষ্যদ্‌বক্তা' শব্দে ছয় মাত্রা হিসেব করেছেন। এ থেকে বোঝা যায়, তিনি ঐ যৌগিক শব্দগুলির 'রাজ্', 'ফুল্', 'ঘোম্' এই কয়টি আদি-হলন্ত অক্ষরে এবং 'ষ্যদ্' এই মধ্য-হলন্ত অক্ষরে দুই মাত্রা করে

৩. কবির অনবধানতায় 'মেঘনাদবধের' ষষ্ঠ সর্গে একটি চরণে এক মাত্রা কম থেকে গেছে—'ডরে সে ত্রিভুবনে ? দেবকুলপতি'।

হিসেব করেছেন। অথচ আমরা জানি, অন্ত্য-হলন্ত অক্ষর ছাড়া অন্ত হলন্ত অক্ষরে দুই মাত্রা ধরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দের সাধারণ নিয়ম নয়। তবে স্পষ্ট বোঝা যায়, কবি সেকালের পাঠ-রীতি অনুযায়ী আদি ও মধ্য হলন্ত অক্ষরগুলিকে স্বরান্ত উচ্চারণে পড়েছেন এবং সেকারণেই এক মাত্রার বদলে দুই মাত্রা নির্দেশ করতে দ্বিধা করেন নি।[৪] তাছাড়া উল্লিখিত অক্ষরগুলিতে দুই মাত্রা ধরার অন্ত একটি কারণও থাকতে পারে। যে হলন্ত অক্ষর একটা গোটা শব্দ মাত্র (যেমন 'রাজ' ও 'কুল'), তা যৌগিক শব্দের আদিতে থাকলেও মধুসূদন তাকে পৃথক একাক্ষর-হলন্ত শব্দ রূপে বিবেচনা করে অক্ষরবৃত্তের রীতি অনুসারে দ্বিমাত্রিক বলে ধরেছেন।[৫] আর 'ভবিষ্যদ্‌বক্তা' পাঠের সময় অঙ্গীয় শব্দ দুইটি (ভবিষ্যদ্+বক্তা) পৃথক পৃথক ভাবে উচ্চারিত হয় বলে 'ষ্যদ্'-কে 'ভবিষ্যদ্' শব্দের অন্ত্য-হলন্ত-অক্ষর রূপে বিবেচনা করা যায় এবং সেক্ষেত্রে তাতে দুই মাত্রা গণনা করা অন্যায় নয়। অবশ্য এ-যুক্তি 'ষোম্' সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। সে যাই হোক, উদাহরণগুলির মাত্রা-গণনায় যে একটা বিশিষ্টতা আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মনে রাখতে হবে, এই ধরনের মাত্রা-নির্ধারণের দৃষ্টান্ত 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধেও' পাওয়া যায়।

'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদবধে' ৩+২+৩ মাত্রার শব্দ-বিন্যাসের ফলে ('রাক্ষস-কুল-রক্ষণ ? হায়, শূর্পনখা' চরণে 'রাক্ষস-কুল-রক্ষণ' দ্রষ্টব্য) যে ধরনের ছন্দোগত ত্রুটি ছিল (৩+৩+২ অর্থাৎ বিজোড় মাত্রার শব্দের পর বিজোড় মাত্রা শব্দ বিন্যাস করাই বাঙলা ছন্দের স্বাভাবিক রীতি) তা চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে নেই সত্য, তবে ২+৪+২ মাত্রার শব্দ-বিন্যাসের যথেষ্ট উদাহরণ আছে।

(১) **ঢালি সংস্কৃত-হ্রদে** রাখিলা তেমতি, ('কাশীরাম দাস')
(২) **রশ্মি মাণিকের ছেছে**। আপনি ভারতী, ('কৃত্তিবাস')
(৩) **শত-পত্রময় মঞ্চে**, তোমার সদনে, ('বটবৃক্ষ')

৪. একালে আমাদের মনে হয়, 'ষোম্'-কে স্বরান্ত উচ্চারণে পড়া একটু অস্বাভাবিক।

৫. 'বৎসর, কালের ঢেউ, ঢেউর গমনে' ('নূতন বৎসর')—এই ছত্রে আদি হলন্ত অক্ষর 'বৎ'-এ একমাত্রাই ধরা হয়েছে, কারণ 'বৎ' অক্ষর কোনো শব্দের নামান্তর নয়।

(৪) পাট-মহিষীর ঘাটে, শয়ন-সদনে। ('উদ্যানে পুষ্করিণী')

(৫) কহে সাংসারিক জ্ঞান—ভবে বৃহস্পতি। ('সাংসারিক জ্ঞান')

মনে রাখতে হবে, চিহ্নিত অংশগুলিতে যে ২+৪+২ মাত্রার শব্দ সন্নিবেশিত হয়েছে, তার চেয়ে ২+২+৪ বা ৪+২+২ মাত্রার শব্দগ্রন্থন অধিকতর শ্রুতিসুখকর হত।

মধুসূদন পূর্ববর্তী কাব্যগুলিতে অমিল প্রবহমান ছন্দে ছেদ-ব্যবহারে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেছেন। আসলে চরণের যে-কোনো স্থানে ছেদ প্রয়োগ করতে তাঁর কোনো দ্বিধা ছিল না। এতে ছন্দঃস্পন্দ ও শ্রুতিমাধুর্যের যে ক্ষতি হয় নি এমন নয়। বিশেষ করে বিজোড় মাত্রার পর ছেদ-স্থাপন বাঙলা ছন্দের প্রকৃতিবিরুদ্ধ হওয়ায় পাঠের সময় শ্রুতিবোধ অনিবার্যভাবেই ক্ষুণ্ণ হয়। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—**তিন মাত্রার পরে ছেদ-প্রয়োগ :**

(১) কাব্যের খনিতে পেয়ে এই ক্ষুদ্র মণি
কবীন্দ্র ; প্রসন্নভাবে গ্রহিলা জননী ('উপক্রম-২')

(২) অমর করিলা তোমা অমরকারিণী
বাগ্দেবী ! ভোগিলা দুখ জীবনে, ব্রাহ্মণ, ('কমলে কামিনী')

(৩) অনুক্ষণ মনে পড়ে তব কথা,
বৈদেহি ! কখন দেখি, মুদিত নয়নে, ('সীতা দেবী')

সাত মাত্রার পরে ছেদ-প্রয়োগ :

(১) মনঃ তোর ? **বুঝা রে,** যা বুঝিতে না পারি ! ('শ্যামা-পক্ষী')

এগারো মাত্রার পরে ছেদ-প্রয়োগ :

(১) ধৈরয-কবচ তুমি উড়ায়ে, **রমণি,** ('শৃঙ্গার-রস-২')

(২) বহিতে তোমার ভার। **শোভিবে,** হে প্রভু, ('মেঘদূত-২')

লক্ষণীয় এই যে, সাত বা এগারো মাত্রার পর উপচ্ছেদ মাত্র আছে। কিন্তু তিন মাত্রার পরে পূর্ণচ্ছেদ আছে বলে তার গুরুত্ব সমধিক।

সর্বশেষে সমিল প্রবহমান ছন্দে সনেট রচনার যে আদর্শ মধুসূদন অনুসরণ করেছেন, তার যুক্তিযুক্ততার বিষয় উত্থাপন করা যেতে পারে। আমরা জানি, এই সমিল প্রবহমান ছন্দে সনেট রচনার রীতিটি তিনি প্রধানতঃ মিল্টনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কিন্তু প্রবহমান ছন্দে সনেট রচনা করলে বিশেষ মিল-বিন্যাসের সাহায্যে যে ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করা সনেটকারের উদ্দেশ্য তা ব্যাহত হয় বলে আমি মনে করি। সনেটে প্রতি চরণের ছন্দ-স্রোতকে অন্তিম মিলের

দিকে প্রবাহিত করে মিলের ধ্বনিগুণকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলতে পারলে প্রত্যাশিত ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি সহজ ও সুন্দর হয়। কিন্তু যেখানে চরণের মধ্যে একাধিক ছেদ থাকে সেখানে বিরামস্থলগুলি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে রাখে, ধ্বনিপর্বের চেয়ে ভাবপর্বের ওপর বেশী জোর পড়ে। ফলতঃ চরণান্তিক মিলের গুরুত্ব কমে যায় এবং সেটা মিলপ্রধান সনেটের পক্ষে যে ক্ষতির কারণ হয়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। উদাহরণ দিয়ে বক্তব্যটা বোঝানো যেতে পারে—

(১) থাক বঙ্গ-গৃহে, যথা মানসে, মা, হাসে
চিররুচি কোকনদ ; বাসে কোকনদে
সুগন্ধ ; সুরত্নে জ্যোৎস্না ; সুতারা আকাশে ;
শুক্তির উদরে মুক্তা ; মুক্তি গঙ্গা-হ্রদে !
—কোজাগর-লক্ষ্মীপূজা।

(২) কে বলে বসন্ত অন্ত, তব কাব্য-বনে,
শ্বেতদ্বীপ ? ওই শুন, বহে বায়ু-ভরে
সঙ্গীত-তরঙ্গ রঙ্গে ! গায় পঞ্চ স্বরে
পিকেশ্বর, তুমি মনঃ সুধা বরিষণে।
—কবিবর আল্‌ফ্রেড্‌ টেনিসন্‌।

(৩) রাণী তুমি ; নীচ আমি ; তেঁই ভয় করে,
অনুচিত বিবেচনা পার করিবারে
আলাপ আমার সাথে ; পবন-কিঙ্করে,—
ফুল-কুল সহ কথা কহ দিয়া যারে,
দেও কয়ে ; কহিবে সে কানে, মৃদুস্বরে,
যা কিছু ইচ্ছহ, দেবি, কহিতে আমারে ! —ছায়াপথ।

ভাব-পর্ব অনুযায়ী কাব্যাংশগুলি পড়তে গেলে স্বভাবতঃই মিলের ওপর জোর কমে যায় এবং সনেটে মিলের গুরুত্ব সমধিক বলে তা কিছুটা ক্ষতিরও কারণ হয়। এই ক্ষতির কথাটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যদি আমরা নিচের উদ্ধৃতিগুলির সঙ্গে উপরের উদ্ধৃতিগুলি তুলনা করি—

(১) কোথায় রাখাল-রাজ পীতধড়া গলে ?
কোথায় সে বিরহিণী প্যারী চারুশীলা ?—
ডুবাতে কি ব্রজধামে বিস্মৃতির জলে,
কাল-রূপে পুনঃ ইন্দ্র বৃষ্টি বরষিলা ! —ব্রজবৃত্তান্ত।

(২) কি কাজ পবিত্রি মন্ত্রে জাহ্নবীর জলে ?
কি কাজ সুগন্ধ ঢালি পারিজাত-বাসে ?
প্রকৃত কবিতা-রূপী প্রকৃতির বলে,—
চীনা-নারী-সম পদ কেন লৌহ-ফাঁসে ?
—মিত্রাক্ষর।

এই দুটি উদ্ধৃতিতে কোনো চরণের মধ্যেই উপচ্ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদ নেই। তাই চরণগুলি পড়বার সময় বাগ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া স্তব্ধ করে দিয়ে উচ্চারণ বিরতি ঘটাতে হয় না। ফলে সমগ্র চরণের ধ্বনিপ্রবাহ চরণশেষের বিরতির দিকে অব্যাহতভাবে এগিয়ে গিয়ে অন্তিম মিলকে সুস্পষ্টভাবে ধ্বনিত করে। অর্থাৎ উদাহরণ দুটিতে ছেদের স্বাধীনতা না থাকায় মিলের ধ্বনিগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় না।

তবে পূর্বেই বলেছি, প্রবহমান ছন্দে সনেট রচনার আদর্শ মধুসূদন মুখ্যতঃ মিল্টনের কাছ থেকে পেয়েছিলেন এবং সে-কারণে এ-ত্রুটি মধুসূদনের একার নয়।

৪.

সনেটে মিল একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ এবং সেই উপকরণটির সুষ্ঠু প্রয়োগে মধুসূদনের দক্ষতা তর্কাতীত। মুখ্যতঃ মিলের শব্দগুলিকে সুন্দরভাবে বাজিয়ে নিয়েই যে সনেটকারকে কবিতার ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করতে হয়, একথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তিনি আরও জানতেন, হলন্ত (সংবৃত) অক্ষরের চেয়ে স্বরান্ত (বিবৃত) অক্ষরের মিল ছন্দ-মাধুর্য সৃষ্টিতে অধিকতর সহায়ক এবং তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ তিনি দেখেছিলেন ইতালীয় সনেটে। বাঙলায় যদি স্বরের হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ থাকত, তবে চরণের মধ্যে বা চরণের অন্তে মিলের ক্ষেত্রে দীর্ঘ স্বর ব্যবহার করে তিনি ছন্দের সঙ্গীতগুণ বৃদ্ধি করতে পারতেন। কিন্তু সেই সুযোগ না থাকায় মধুসূদন চরণের মধ্যে সংবৃত ও বিবৃত অক্ষরের সুকৌশল প্রয়োগে একদিকে যেমন 'music of the line', অন্য দিকে তেমনি অন্ত্য-মিলে স্বরান্ত অক্ষরকে প্রাধান্য দিয়ে মিলের মেলোডি বাড়াতে চেয়েছেন। মনে রাখতে হবে, সংবৃত অক্ষরের চেয়ে স্বরান্ত অক্ষরের স্বর বা ধ্বনির বিস্তারের

সম্ভাবনা বেশী থাকে, কারণ স্বর বাধাহীনভাবে উচ্চরিত হয়ে অন্ত্যযতির বিরামকে কতকটা অতিক্রম করে যেতে পারে। কিন্তু সংবৃত অক্ষরের সেই বিস্তারপ্রবণতা থাকে না ; কারণ তার শেষ ব্যঞ্জনটির উচ্চারিত ধ্বনি মুখবিবর সংবৃত হওয়ার ফলে যে বাধার সম্মুখীন হয়, চরণের অন্ত্যযতির বিরাম-বাধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা একেবারে 'complete closure'-এর সৃষ্টি করে। আর সে-ক্ষেত্রে মিলের ধ্বনিগুণ বৃদ্ধির কোনো সুযোগও থাকে না। এইভাবে সংবৃত অক্ষরঘটিত মিলে একদিকে যেমন সাঙ্গীতিকতা সীমায়িত হয়ে পড়ে, অন্য দিকে তেমনি বিভিন্ন চরণের সূক্ষ্ম ধ্বনিযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। প্রমথ চৌধুরীর অনেক সনেটে তার উদাহরণ আছে। যেমন—

নয়ন-গোলাপ তব করিতে উজ্জ্বল,
বুল্‌বুলের সুরে আজি বেঁধেছি সেতার।
গাহিব প্রেমের গান পারসী কেতার,
ফুলের মতন লঘু রঙিলা গজল!
যে সুর পশিয়া কানে চোখে আনে জল,
সে সুর বিবাদী জেনো মোর কবিতার।
মম গীতে নত্ত তব চোখের পাতার
সীমান্তে রচিয়া দিব দু ছত্র কাজল।
বাজিয়ে দেখেছি ঢের বীণ ও রবাব,
পাইনি সে সুরে তব প্রাণের জবাব॥
আজ তাই ছাড়ি যত ধ্রুপদ ধামার
চুটকিতে রাখি সব আশা ভালোবাসা।
দরদ ঈষৎ আছে এ গীতে আমার—
সুরে ভাবে মিল আছে, দুই ভাসা-ভাসা।

—গজল।

যাদের সঙ্গীতের কান আছে, তারাই বুঝতে পারবেন, এ সনেটে সাঙ্গীতিকতার যথেষ্ট অভাব আছে। তার কারণ প্রমথ চৌধুরী ছত্রগুলির মধ্যে অনেকগুলি সংবৃত অক্ষর ব্যবহার করেছেন এবং একটি ছাড়া সব ক্ষেত্রেই সংবৃত অক্ষরঘটিত মিল যোজনা করেছেন। মিলের সেই সব সংবৃত অক্ষরে যে সমস্ত ব্যঞ্জন আছে, তার মধ্যে 'র', 'ল' এই দুটি continuants

অনেকবার ব্যবহৃত না হয়ে যদি শুধু stops ব্যবহৃত হত তবে সনেটটির সঙ্গীতগুণ আরও হ্রাস পেত।[১]

আর এই কারণেই মধুসূদন সনেটের মিলের ক্ষেত্রে সংবৃত অক্ষরের চেয়ে বিবৃত অক্ষর ব্যবহারের দিকেই অত্যধিক মনোযোগ দিয়েছেন। নিচের বিস্তৃত হিসেবে থেকে জানা যাবে যে, তিনি ১০৮টি সনেটে মোট ৪৩৫টি মিল ব্যবহার করেছেন এবং সেই ৪৩৫টি মিলের মধ্যে মাত্র ১৫টি হচ্ছে সংবৃত অক্ষরের মিল, বাকি ৪২০টিই বিবৃত অক্ষরের মিল। মিলের সঙ্গীতগুণ সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন বলেই প্রথম জাতীয় মিলের সংখ্যা এত কম এবং দ্বিতীয় ধরনের মিলের সংখ্যা এত বেশী হয়েছে। তা না হলে বাঙালীর মুখের ভাষায় সংবৃত অক্ষরের যে প্রাধান্য দেখা যায়, মধুসূদনের সনেটেও তার নিদর্শন থাকত। অন্য দিকে কবির ব্যবহৃত ৪২০টি বিবৃত অক্ষরের মধ্যে ১২৯টি মাত্র স্বতোবিবৃত অক্ষর, বাকি ২৯১টি হচ্ছে সপ্তমী বিভক্তিযোগে বিবৃত অক্ষর। সনেটগুলি রচনার সময় কবি লক্ষ্য রেখেছেন যাতে বিবৃত অক্ষরান্ত শব্দ চরণের শেষে থাকে; তা না হলে ক্রিয়াপদের মিল নিকৃষ্ট জেনেও তিনি 'রাজসূয়-যজ্ঞে যথা রাজাদল চলে' লিখতেন না, লিখতেন 'রাজসূয়-যজ্ঞে যথা চলে রাজাদল'। কিন্তু সেক্ষেত্রে মিলের অক্ষরটি ('দল্') সংবৃত হয়ে যায় বলে তিনি ক্রিয়াপদের নিকৃষ্ট মিলেরই দ্বারস্থ হয়েছেন। তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে এই যে, বাক্যের অন্বয়রীতি ও বাচ্যার্থ অনুযায়ী অনেক পদ যেমন সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত হয়ে দেখা দিয়েছে, তেমনি অনেক পদ কোনো অত্যাবশ্যক ব্যাকরণগত কারণে নয়—শুধু মিলের খাতিরে ও বিবৃত অক্ষর সম্বন্ধে কবির দুর্বলতার জন্য সপ্তমী বিভক্তিযুক্ত হয়েছে। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে—

('জয়দেব')

(২) মুছিতে তুচ্ছেতে ত্বরা এ মোর লিখনে?

('যশঃ')

---

১. '...a major distinction must be made between those consonants whose sounds can be prolonged or continued (hence called continuants) and those whose sound stops the instant the consonant is pronounced (called stops).'—James R. Kreuzer, Elements of Poetry (1955), p. 58.

(৩) নিন্দাছলে বন্দ, ভক্ত, রাজীব চরণে।

('শিশুপাল')

(৪) ভুলাতে তোমারে দিল এ কুচ্ছ ভূষণে ?

('মিত্রাক্ষর')

(৫) ···নিবাইল, দেখ, হোমানলে

('সমাপ্তে')

উদাহরণগুলিতে পিকগণে, লিখনে, চরণে, ভূষণে ও হোমানলে-র স্থলে পিকগণ, লিখন, চরণ, ভূষণ ও হোমানল লেখা হলে অর্থ ও ব্যাকরণের দিক দিয়ে কোনো ক্ষতি হত না। এ থেকে বোঝা যায়, শুধু বিবৃত অক্ষরের খাতিরে বিভক্তির বোঝা শব্দের উপর চাপিয়ে দিতেও তিনি দ্বিধা করতেন না। আর সপ্তমী বিভক্তি যোগে পদ ও বিবৃত অক্ষর রচনার স্পৃহা কবির মধ্যে এত প্রবল হয়ে উঠেছিল যে, তিনি অনেক সনেটের মিল শুধু এই জাতীয় বিবৃত অক্ষর দ্বারা রচনা করেছেন (১৮, ৩৪, ৪২, ৪৬, ৪৯, ৭১, ৭৫, ৮১, ৮৫, ৯২, ৯৬ ও ৯৭ সংখ্যক সনেট)। সুতরাং একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টি ও কিছুটা পরিমাণে চরণে চরণে ধ্বনিযোগ রাখার উদ্দেশ্যে বিবৃত অক্ষরের মিল রচনার দিকে কবি যে দৃষ্টি রেখেছিলেন, সনেটমালায় তা একটা মুদ্রাদোষে পরিণত হয়েছে। ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টির প্রাথমিক উদ্দেশ্যটা ছিল ভাল, কিন্তু তা শেষ পর্যন্ত মুদ্রাদোষে পরিণত হওয়ায় সনেটগুলির সঙ্গীতগুণও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে। তাছাড়া বিশেষ উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিবৃত অক্ষরঘটিত মিলের প্রাধান্য যতই প্রশংসনীয় হোক, তার অতিরেক পাঠকের কাছে একটা কৃত্রিম কলাকৌশল বলে মনে হতে পারে। এ প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে, ধ্বনিমাধুর্যের লোভে মধুসূদন ১০৮টি সনেটের ১৫১২টি (১০৮ × ১৪) মিলসূচক শব্দের মধ্যে ৬১৪টি[২] দ্বিমাত্রিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। তার কারণ বাঙালীর উচ্চারণে একটা দ্বিমাত্রিকতা-প্রবণতা থাকায় দ্বিমাত্রিক শব্দ ব্যবহারে স্বাভাবিকভাবেই একটা উচ্চারণ-সৌকর্যজনিত শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টি হয়।

২. মিলসূচক যৌগিক পদগুলির দ্বিতীয় পদটি দ্বিমাত্রিক পদ হলে এবং সেই পদটিকে হাইফেনযোগে দেখানো হলে তাকে এই হিসেবের মধ্যে ধরেছি। যেগুলিকে হাইফেনযোগে দেখানো হয় নি তাদের ধরলে এই হিসেব বেড়ে যাবে।

সংবৃত ও বিবৃত অক্ষরের তালিকা

সনেটের ক্রমিক সংখ্যা	বিবৃত (স্বরান্ত) অক্ষরের মিল			সংবৃত (হলন্ত) অক্ষরের মিল
	স্বতোবিবৃত অক্ষরের মিল	সপ্তমী বিভক্তি যোগে বিবৃত অক্ষরের মিল	মোট	
১	১	৩	৪	×
২	১	২	৩	১
৩	২	২	৪	১
৪	১	৩	৪	১
৫	১	২	৩	১
৬	২	১	৩	২
৭	২	৩	৫	×
৮	২	২	৪	×
৯	১	৩	৪	×
১০	৩	১	৪	×
১১	২	১	৩	×
১২	১	৩	৪	×
১৩	১	৩	৪	×
১৪	১	৩	৪	×
১৫	১	৩	৪	×
১৬	১	২	৩	১
১৭	১	৩	৪	×
১৮	×	৪	৪	×
১৯	১	২	৩	১
২০	২	২	৪	×
২১	১	৩	৪	×
২২	১	৩	৪	×
২৩	১	৩	৪	×
২৪	১	৩	৪	×
২৫	১	৩	৪	×
২৬	১	৩	৪	×
২৭	২	২	৪	×
২৮	১	৩	৪	×
২৯	২	২	৪	×
৩০	১	৩	৪	×

সনেটের ক্রমিক সংখ্যা	বিবৃত (স্বরান্ত) অক্ষরের মিল			সংবৃত (হলন্ত) অক্ষরের মিল
	স্বতোবিবৃত অক্ষরের মিল	সপ্তমী বিভক্তি যোগে বিবৃত অক্ষরের মিল	মোট	
৩১	১	২	৩	১
৩২	১	৩	৪	×
৩৩	১	৩	৪	×
৩৪	×	৪	৪	×
৩৫	২	২	৪	×
৩৬	১	৩	৪	×
৩৭	১	২	৩	১
৩৮	২	২	৪	×
৩৯	১	২	৩	১
৪০	১	৩	৪	×
৪১	১	৩	৪	×
৪২	×	৪	৪	×
৪৩	১	৩	৪	×
৪৪	১	১	২	২
৪৫	২	২	৪	×
৪৬	×	৪	৪	×
৪৭	১	৩	৪	×
৪৮	৩	১	৪	×
৪৯	×	৪	৪	×
৫০	২	২	৪	×
৫১	১	৩	৪	×
৫২	১	৩	৪	×
৫৩	১	৩	৪	×
৫৪	২	২	৪	×
৫৫	২	২	৪	×
৫৬	১	৩	৪	×
৫৭	২	২	৪	×
৫৮	২	২	৪	×
৫৯	১	৩	৪	×
৬০	২	২	৪	×

সনেটের ক্রমিক সংখ্যা	বিবৃত (স্বরান্ত) অক্ষরের মিল			সংবৃত (হলন্ত অক্ষরের মিল)
	স্বতোবিবৃত অক্ষরের মিল	সপ্তমী বিভক্তি যোগে বিবৃত অক্ষরের মিল	মোট	
৬১	১	৩	৪	×
৬২	১	৩	৪	×
৬৩	১	৩	৪	×
৬৪	১	৩	৪	×
৬৫	২	২	৪	×
৬৬	২	২	৪	×
৬৭	১	৩	৪	×
৬৮	১	৩	৪	×
৬৯	×	৩	৩	১
৭০	২	২	৪	×
৭১	×	৪	৪	×
৭২	৩	১	৪	×
৭৩	১	৩	৪	×
৭৪	১	৩	৪	×
৭৫	×	৪	৪	×
৭৬	১	৩	৪	×
৭৭	২	২	৪	×
৭৮	২	২	৪	×
৭৯	২	২	৪	×
৮০	১	৩	৪	×
৮১	×	৪	৪	×
৮২	১	৩	৪	×
৮৩	১	৩	৪	×
৮৪	১	৩	৪	×
৮৫	×	৪	৪	×
৮৬	১	৩	৪	×
৮৭	১	৩	৪	×
৮৮	১	৩	৪	×

সনেটের ক্রমিক সংখ্যা	বিবৃত (স্বরান্ত) অক্ষরের মিল			সংবৃত (হলন্ত) অক্ষরের মিল
	স্বতোবিবৃত[৩] অক্ষরের মিল	সপ্তমী বিভক্তি যোগে বিবৃত অক্ষরের মিল[৪]	মোট	
৮৯	×	৪	৫	×
৯০	৩	১	৪	×
৯১	১	৩	৪	×
৯২	×	৪	[illegible]	×
৯৩	১	৩	৪	×
৯৪	১	২	৩	১
৯৫	১	৩	৪	×
৯৬	×	৪		×
৯৭	×	৪	৪	×
৯৮	৩	১	৪	×
৯৯	১	৩	৪	×
১০০	১	৩	৪	×
১০১	১	৩	৪	×
১০২	১	৩	৪	×
১০৩[৫]	২	২	৪	×
১০৪	১	৪	৫	×
১০৫	১	৩	৪	×
১০৬	২	২	৪	×
১০৭	১	৩	৪	×
১০৮	১	২	৩	×
	১২৯	২৯১	৪২০	১৫

৩. স্বতোবিবৃত অক্ষর বলতে প্রথমা বা শূন্য বিভক্তিযুক্ত পদের অন্ত্য-বিবৃত অক্ষরকে ধরতে হবে। যেহেতু প্রথমা বিভক্তিযুক্ত নামপদের সঙ্গে বিভক্তিযুক্ত ক্রিয়াপদের (সমাপিকা ও অসমাপিকা দুই-ই) মিল দেখানো হয়েছে, সেই হেতু ক্রিয়াপদের মিলসূচক অন্ত্য-বিবৃত অক্ষরগুলিকে স্বতোবিবৃত অক্ষরমালারই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই ক্রিয়াপদভুক্ত মিলসূচক অক্ষরগুলিকে পৃথক ভাবে নির্দেশ করতে গেলে সংশ্লিষ্ট সনেটগুলির মোট মিলের সংখ্যা বেড়ে যাবে।

৪. সপ্তমী বিভক্তি যোগে যে সমস্ত সংবৃত অক্ষরকে বিবৃত করা হয়েছে

৫.

মধুসূদনের রচিত সনেটগুলির মধ্যে অধিকাংশই অলঙ্কারাশ্রিত কবিতার পর্যায়ে পড়ে। ক্লাসিক্‌স্‌-চর্চা ও এপিক-রচনার সময় তিনি শ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে যে কাব্যালঙ্কারে পাঠ গ্রহণ ও অধিকার অর্জন করেছিলেন, তা যেন তাঁর কবিমনের নিত্যকার সংস্কার ও ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল। তা না হলে তিনি সনেটের 'ছোট দেহ ছোট প্রাণের' ওপর অলঙ্কারের এমন বোঝা চাপিয়ে দিতেন না। তাছাড়া 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার সময় যে অবসাদগ্রস্ত ও দুঃখাতুর মনের সঙ্গে তিনি কারবার করেছিলেন, তার ডানায় ভর করে অত্যুচ্চ কল্পনা ও সৌন্দর্যের মায়ামণ্ডলে পৌঁছোনোর প্রতিশ্রুতি ছিল না। তাই অলঙ্কারের সীমা-স্বর্গে প্রথানুগত পরিক্রমায় মধুসূদন কতকটা সহজ সিদ্ধি সন্ধান করেছিলেন। তাছাড়া তিনি বোধহয় বিশ্বাস করতেন, উপমা-রূপকের আলোকসজ্জায় কবিতায় স্ফূর্তি ও দ্যুতি আসে—তার ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য বেড়ে যায়। আর সে-কারণেই সনেটের সীমায়িত আয়তনেও অলঙ্কারের প্রসাধনকলায় তাঁর নিরবচ্ছিন্ন মনোনিবেশ আমরা লক্ষ্য করি।

(যেমন 'দল হয়েছে 'দলে') সেগুলিই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সপ্তমী বিভক্তিযোগে যে সমস্ত সংবৃত অক্ষরকে বিবৃত করা হয়েছে বলে ধরেছি তার মধ্যে অনেকগুলিতে মূলতঃ বিবৃত অক্ষরকে সপ্তমী বিভক্তিযোগে অন্যভাবে বিবৃত করা হয়েছে—যেমন ছলনে—ছলনা, তাড়নে—তাড়না, কুন্তলে—কুন্তলা, সঘনে—সঘন, ঘোষণে—ঘোষণা ইত্যাদি। আর এগুলির সঙ্গে মিল দেওয়া হয়েছে এমন অক্ষরের যা মূলে সংবৃত হলেও সপ্তমী বিভক্তিযোগেই বিবৃত করা হয়েছে। যেহেতু এখানে আমরা বিবৃত অক্ষরঘটিত মিলের হিসেব দিয়েছি, সেইকারণে এই সব পুনর্বিবৃত অক্ষরগুলির পৃথক হিসেব দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি নি।

৫. ১০৩. ঢাকাবাসীদের অভিনন্দনের উত্তরে; ১০৪. পুরুলিয়া; ১০৫. পরেশনাথ গিরি; ১০৬. কবির ধর্মপুত্র; ১০৭. পঞ্চকোট গিরি; ১০৮. পঞ্চকোটস্থ রাজশ্রী।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে, অলঙ্কার-প্রকরণ সনেটের বিশেষ গঠনবিধির মধ্যে পড়ে না। কাব্যকলার সঙ্গে অলঙ্কারের সাধারণ সম্বন্ধের সূত্রেই সনেটে অলঙ্কারের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ভাবোপযোগিতা ও সৌন্দর্যকরতার পরিমাণ অনুযায়ী তার আপেক্ষিক উৎকর্ষ বা অপকর্ষ সূচিত হয়। অতএব মধুসূদনের সনেটে অলঙ্কার-চর্চাকেও কাব্যের সঙ্গে অলঙ্কারের সাধারণ সম্বন্ধের নিরিখেই বিচার করা কর্তব্য।

সনেটে মধুসূদনের অলঙ্কার-চর্চাকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এক শ্রেণীর কবিতা তিনি লিখেছেন যাতে ভাব, চিন্তা ও কল্পনা একান্তই অলঙ্কার-নির্ভর এবং তা থেকে অলঙ্কার খসিয়ে নিলে কবির কবিত্ব বলতে আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। কাজেই সেই অলঙ্কারসর্বস্ব কাব্য-সাধনার মূল্যও অলঙ্কারের ভাববহনক্ষমতা ও চিত্রকল্পের সৌন্দর্যধর্মিতার মধ্যে নিহিত। দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা অলঙ্কারপ্রধান এবং তাতে কবিত্ব অলঙ্কারের ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হলেও তার অতিরিক্ত কিছুও বটে। এ সমস্ত সনেটে অলঙ্কারের শক্ত খুঁটির ওপর দাঁড়িয়ে কবিত্বের সৌন্দর্য ও রস বিকীর্ণ হতে চেয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই কবি তেমন কিছু সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। তৃতীয় শ্রেণীর কবিতার প্রধান আকর্ষণ হচ্ছে তার আন্তরিক ভাবকল্পনা ও মধুর রসব্যঞ্জনা। এখানে ওখানে অলঙ্কারের একআধটুকু কারুকার্য সেই কল্পনামাধুর্য ও রসসৌন্দর্যের মর্মে পৌঁছোতে আমাদের সাহায্য করে। বিচারে দেখা যায়, এই তৃতীয় শ্রেণীর সনেট সংখ্যায় খুবই কম।

অলঙ্কারসর্বস্ব সনেটগুলি মর্মবস্তু প্রায়শঃই অকিঞ্চিৎকর, মূলীভূত অভিজ্ঞা-প্রেরণা চমকহীন, সৃষ্টি-প্রক্রিয়া অনুভূতির বেগ ও মননের সজীবতার অভাবে নিঃস্পন্দ। মধুসূদন যেন এদের মধ্যে এক একটা নিশ্চল উপমানের আশ্রয়ে এক একটা নিঃসাড় ভাবকে দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন, সচল ভাবকে আপন প্রাণের তাগিদে বিকশিত হয়ে ওঠার সুযোগ দেন নি। এদের অধিকাংশের মধ্যে মূল উপমেয় ও উপমানের উপস্থাপনা এবং সমান্তরালভাবে তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বিন্যাসই একমাত্র কবিকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে কবির বক্তব্যের কাব্যগত অভিব্যক্তি প্রাণহীন আলঙ্কারিকতায় নিস্তব্ধ হয়ে আছে, কবিমানসের সচল অভিজ্ঞতার টানে কবিতার রূপবিগ্রহ জীবন্ত হয়ে ওঠে নি। অলঙ্কারসর্বস্ব সনেটগুলির এই দেহপ্রাণের নিস্তব্ধতা কোনোক্রমেই সেই রূপলোকের সামগ্রী নয়, আপন সত্তার বন্ধ-সংকোচ আনন্দ-বেদনার

অস্থিরতাকে অতিক্রম করে যেখানে পৌঁছানোর চেষ্টা সনেটকারেরা করে থাকেন। 'যশের মন্দির' কবিতার নামকরণে যে রূপককল্পনার সঙ্কেত আছে— তারই ওপর সমগ্র কবিতাটির একান্ত স্থিতি ও নির্ভরতা। এখানে কবির বক্তব্য—যশমাত্রই বহুকষ্টার্জিত ও দৈবানুগ্রহজাত। কিন্তু এই বক্তব্যটুকুকে কবি বলিষ্ঠ কল্পনা, উদ্দীপিত মানসাভিজ্ঞতা ও সাবলীল মননক্রিয়ার সাহায্যে, কোনো সৃষ্টিশীল প্রবর্তনায় পূর্ণায়ত ও রূপরসবিশিষ্ট করে তুলতে পারেন নি। তাঁর মনের ভাবকল্পনা যেন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকে পর্বতশীর্ষে দুর্গম মন্দিরারোহণের সঙ্গে যশার্জনকে তুলনা করেই ক্ষান্ত হতে চেয়েছে; কোন নিগূঢ় অর্থসঙ্কেতে ও সূক্ষ্ম সৌন্দর্য-চেতনায় উদ্বোধিত হতে পারে নি। 'ভারতভূমি', 'যশঃ', 'নূতন বৎসর' 'উপক্রম—২', 'কাশীরাম দাস', ইত্যাদি অনেকগুলি সনেট সম্বন্ধেই একথা বলা চলে। তবে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই 'করুণ রস' নামে যে সনেটটি আছে, তা অলঙ্কারসর্বস্ব হলেও কল্পনাসুন্দর ও শিল্পরূপময়। কোনো সূক্ষ্ম আলোচনায় প্রবেশ না করেও বলা যায়, রস মাত্রই সহৃদয়হৃদয়সংবাদী এবং রসাবেশ একটা বিশেষ মানসিক অবস্থা মাত্র। এই রসস্বরূপের নির্বস্তুক আইডিয়াকে চিত্রকল্পের সাহায্য ছাড়া পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষীভূত করা সম্ভব নয়। তাই কাব্যসংসারে করুণ রসকে উপস্থাপিত করতে গিয়ে মধুসূদন সঙ্গতভাবেই কল্পনা করেছেন এক রাহুগ্রস্তা মলিনমুখী সুন্দরী নারীর রূপ যিনি সুন্দর নদের তীরে বিরলে বসে অশ্রু বিসর্জন করে চলেছেন। সেই বিগলিত অশ্রুধারাই নদের স্রোতে 'ফুল্ল কমলের স্বর্ণকান্তির' মতো ফুটে উঠছে। শোকদগ্ধা নারীর অশ্রুপাতে আভাসিত হয়েছে করুণরসের মূলভাব শোকাবেগ, সেই অশ্রুরূপ শোকাবেগই যে রসপর্যায়ে আনন্দঘন হয়ে উঠল তারই সুন্দর অভিব্যক্তি তাছে অশ্রুবিন্দুর ফুল্ল কমলের রূপ পরিগ্রহ করার রূপক-কল্পনার মধ্যে। ফুল যখন ফোটে তখন ভ্রমরের দল মধুর আস্বাদ লাভ করে—বাতাস সুগন্ধ লুণ্ঠন করার সুযোগ পায়। তেমনি করুণ রসের আনন্দমূর্তিও রসিকজনের চিত্তবিনোদনের কারণ হয়। শেষ দুই ছত্রের এই বক্তব্যে করুণ রসের গভীর আবেদনের কথা সুন্দরভাবে নিবেদিত হয়েছে। সুতরাং এখানে কবির সর্বাশ্রয়ী রূপক-কল্পনা যে করুণ রসের প্রাণপ্রতিমা রসিকচিত্তে প্রতিষ্ঠিত করতে সহায়তা করেছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অলঙ্কারপ্রধান সনেটের সংখ্যাই 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' সর্বাধিক।

তাদের অধিকাংশই কল্পনাস্পর্শবর্জিত, সূক্ষ্ম অনুভূতি ও ব্যঞ্জনাবিরহিত বক্তব্যের নীরস বিবৃতি মাত্র। ফলে কবি রচনাগুলিকে কাব্যের পর্যায়ে উন্নীত করতে গিয়ে ব্যাপকভাবে উপমা-রূপকের কষ্টকৃত কৌশল এবং বাগাড়ম্বরের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। 'কৃত্তিবাস', 'বটবৃক্ষ', 'মহাভারত', 'প্রাণ', 'রাশিচক্র', 'পরলোক', 'শ্মশান', 'কুরুক্ষেত্র', হিড়িম্বা (২), 'কেউটিয়া সাপ', 'দ্বেষ', 'শনি' ইত্যাদি অনেক সনেট স্পষ্টতঃই দাঁড়িয়ে আছে আলঙ্কারিক মারপ্যাঁচের ওপর। উদাহরণ স্বরূপ 'আমরা' কবিতাটি উদ্ধৃত করছি—

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে ;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে ?
আমরা,—দুর্বল, ক্ষীণ, কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—
কি হেতু নিবিল জ্যোতিঃ মণি, মরকতে,
ফুটিল ধুতুরা ফুল মানসের জলে
নির্গন্ধে ? কে কবে মোরে ? জানিব কি মতে ?
বামন দানব-কুলে, সিংহের ঔরসে
শৃগাল কি পাপে মোরা কে কবে আমারে ?—
রে কাল, পূরিবি কিরে পুনঃ নব রসে
রস-শূন্য দেহ তুই ? অমৃত-আসারে
চেতাইবি মৃত-কল্পে ? পুনঃ কি হরষে,
শুক্লকে ভারত-শশী ভাতিবে সংসারে ?

কবির স্বদেশ-স্বপ্ন ও ঐতিহ্যপ্রীতি ভারত-জননীর অঙ্গে যে সব রত্নালঙ্কার পরিয়েছে তা আর যা-ই হোক কাব্যলক্ষ্মীর বিভূষণ হয়ে উঠতে পারে নি। তবে যেখানে ভাব সহায়, কল্পনার দাক্ষিণ্য উদার এবং সর্বোপরি কবিমনের সাড়া সুস্পষ্ট, সেখানে মধুসূদনের অলঙ্কারপ্রধান কাব্যকলাও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এ-প্রসঙ্গে 'বঙ্গভাষা', 'পরিচয়' (১), 'সায়ংকাল', 'সায়ংকালের তারা', 'বিজয়া দশমী', 'নূতন বৎসর', 'মিত্রাক্ষর', '১০০', 'সমাপ্তি' প্রভৃতি সনেট স্মরণীয়। 'সায়ংকালের তারায়' অলঙ্কৃত বচন-বিন্যাসের অন্তরালে প্রকৃতির রূপমুগ্ধ ও সৌন্দর্যপ্রেমিক কবি-আত্মা এক অনবদ্য চিত্র অঙ্কন করতে পেরেছে—

কার সাথে তুলনিবে, লো সুর-সুন্দরি,
ও রূপের ছটা কবি এ ভব-মণ্ডলে ?
আছে কি লো হেন খনি, যার গর্ভে ফলে
রতন তোমার মত, কহ, সহচরি
গোধূলির ? কি ফণিনী, যার সু-কবরী
সাজায় সে তোমা সম মণির উজ্জলে ?—
ক্ষণমাত্র দেখি তোমা নক্ষত্র-মণ্ডলে
কি হেতু ? ভাল কি তোমা বাসে না শর্বরী ?
হেরি অপরূপ রূপ বুঝি ক্ষুণ্ণ মনে
মানিনী রজনী রাণী, তেঁই অনাদরে
না দেয় শোভিতে তোমা সখীদল-সনে,
যবে কেলি করে তারা সুহাস অম্বরে ?
কিন্তু কি অভাব তব, ওলো বরাঙ্গনে,—
ক্ষণমাত্র দেখি মুখ, চির আঁখি স্মরে !

এখানে সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারের উপমানাশ্রয়ী সৌন্দর্য ও সমাসোক্তির মানবীয়তা যে রস সঞ্চার করেছে, তারই মূল্যে কবিতাটি আস্বাদ্য হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে মানিনী রজনীর অনাদরের কথায় সন্ধ্যাতারার সৌন্দর্যকে ঈর্ষার বিপ্রতীপ কোণ থেকে দেখার চেষ্টা আছে, নক্ষত্রলোকে এক বিশেষ মানবিক ভঙ্গিমায় দৃষ্টিপাতের ফলে বর্ণনীয়ের বস্তুস্বভাব দ্রবীভূত হয়ে এক সক্রিয় ও সজীব পরিমণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। অস্বীকার করার উপায় নেই, এখানে মধুসূদনের বহির্জাগতিক চেতনার সঙ্গে তাঁর আত্মানুবর্তনশীল মন্ময় চেতনার সুন্দর সহযোগই হচ্ছে কবি-কল্পনার প্রাণ ও তার সৃষ্টির সৌন্দর্য। বস্তুলোকের তন্নিষ্ঠতায় এই মানবিক চেতনার প্রসারণে হয়ত চমকপ্রদ কিছু নেই, কিন্তু যেটুকু শক্তি ও সরসতা আছে তারই দাক্ষিণ্যে ক্ষণরূপাও হয়ে উঠেছে চির-অপরূপা।

যে সব সনেটে মধুসূদনের কবি-কল্পনা প্রায়-নিরলঙ্কার বেশ ধারণ করে আত্ম-প্রকাশ করেছে, তাদের মধ্যে 'জয়দেব' বিশেষভাবে স্মরণীয়। অজয়ের কূলে একদিন যে কবি কোমলকান্ত পদাবলী রচনা করে গিয়েছেন, তাঁর কণ্ঠে ছিল 'মাধবের রব', তাই মধুসূদনের কল্পনা নতুন বৃন্দাবন-লীলায় জয়দেবকে নায়কের আসন দিতে দ্বিধা করে নি। এখানে কবির জয়দেব-প্রীতি আন্তরিকতায় সংবেদনশীল হয়ে উঠেছে, ভাবাবেগের টানে অলঙ্কারের ঐশ্বর্য আহরণ করে নি (এর ব্যতিক্রম

শুধু একটি চরণ : 'নাচে শ্যাম, বামে রাধা—সৌদামনি ঘনে!' অবশ্য কাকু-বক্রোক্তির দুটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য নয় বলে হিসেবের মধ্যে ধরা হয় নি)।

এই আলোচনা থেকে বোঝা যাবে যে, অলঙ্কারের অতিশয়তা ও রূপকাশ্রিত ভাবের প্রাধান্য মধুসূদনের সনেটগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট। তবে স্বল্পসংখ্যক কবিতা ছাড়া অন্যগুলিতে অলঙ্কৃত বাগ্‌বিন্যাস ভাবের রূপায়ণ ও সৌন্দর্যসৃষ্টিতে সমগ্রভাবে সহায়ক হয় নি। তার কারণ, কবির রূপকল্পগুলি সুস্পষ্ট ও অবয়ববিশিষ্ট হলেও প্রায় প্রাণহীন। প্রাণবান্ উপমান উৎকৃষ্ট কাব্যে যে ভাবে কবি-কল্পনায় একটা বলিষ্ঠ ভঙ্গি আনে, অজানিত সৌন্দর্যলোক উদঘাটন করে চিত্ত-চমৎকারের কারণ হয়ে ওঠে এবং বেগচঞ্চল ও সক্রিয় সাধর্ম্যে উপমেয়ের প্রত্যয়ভূমিকে দৃঢ়মূল করে তোলে, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' তার উদাহরণ বিরল। তবু তাদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ভাবে এমন কিছু কিছু অলংকৃত চিত্র আছে, যা মধুসূদনের সৌন্দর্য-সৃষ্টির ক্ষমতা সম্বন্ধে আমাদের অবহিত করে তোলে—

১. কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি
মৃদু নাদে, কয়ো তারে, এ বিরহে মরি।
—মেঘদূত (১)

২. যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে
প্রভাতে, —পরিচয় (১)

৩. চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে
দিনেশ, ছড়ায়ে স্বর্ণ, রত্ন রাশি রাশি
আকাশে। —সায়ংকাল

৪. বসন্তে কুসুম-কুল যথা বনস্থলে,
চেয়ে দেখ, তারাচয় ফুটিছে গগনে,
মৃগাক্ষি! —নিশা

৫. চেয়ে দেখ, পদ-ছায়া-ছলে,—
কনক কমল ফুল্ল এ নদীর জলে—
—ঈশ্বরী পাটনী

৬. পত্রময়ী শাখা ছত্র ধরে
শীতলিতে দেহ তোর; —উদ্যানে পুষ্করিণী

৭. ওই হে উর্বশী।
সোণার পুতলি যেন, পড়ি অচেতনে।
—পুরুরবা

৮. কিন্তু ও মৃগাক্ষি হতে যবে গলি, ঝলে
অশ্রুধারা, ধৈর্য ধরে কে মর্ত্যে, আকাশে?
—শকুন্তলা

৬.

কাব্য-সাহিত্যের বিচারে ভাষা-প্রকরণের বিশেষ গুরুত্ব আছে। কারণ স্রষ্টার অভিজ্ঞা-প্রেরণার সুষ্ঠু প্রকাশ শব্দধৃত ভাষাভঙ্গির ওপরই নির্ভর করে। বাক্যগত অন্বয়ের বন্ধনে যখন শব্দধারা বাঁধা পড়ে, তখন শব্দের ধ্বনিপ্রকৃতি ও অর্থব্যঞ্জনা একটা বিশেষ ঢঙে সক্রিয় হয়ে কবির মনোভাবটিকে ব্যক্ত করে।[১] আর তাই কাব্যের সার্থকতাও শব্দসজ্জা ও পদবিন্যাসের যাথার্থ্যের ওপর নির্ভর করে। মধুসূদনের সনেট আলোচনার সময়ও আমাদের দেখতে হবে, কবির ভাব-প্রেরণা ও ভাষারীতির অন্যোন্য সহযোগিতা ও সম্মিতি কতখানি ঘটেছে এবং এই দুইয়ের সংযোগে কাব্যের কোন্ রূপ খুলেছে। একটা সীমিত আয়তনের মধ্যে সংযত ও সংহত ভাবে একটা ভাবকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার শক্তি সেই ভাষাদর্শের আছে কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা দরকার।

যে ভাব-উৎস থেকে মধুসূদনের সনেটগুলির জন্ম, তার মধ্যে কবির মাতৃভূমির প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা, তাঁর নাটকীয় জীবনের বহুবিচিত্র বাস্তব অভিজ্ঞতা, নানা মনস্বী ব্যক্তি সম্পর্কে অপরিসীম শ্রদ্ধা, দেশের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি নিগূঢ় প্রীতি, সর্বোপরি দুঃখক্লিষ্ট জীবনের গভীরতম আত্ম-জিজ্ঞাসার পরিচয় আছে। কাব্যের মর্মবস্তু হিসেবে এই সমস্ত সদ্ভাবের মূল্য অনেক, সন্দেহ নেই; তবে তা অনেক ক্ষেত্রেই কবির হৃদয়-রসে জারিত ও সজীব

১. ...'the sense of his words build up an intellectual harmony, and the sound of them will build up an instrumental harmony; both sense and sound being in poetry, equally required for expression.'—L. Abercrombie, The Theory of Poetry, p. III.

অনুভূতির স্পর্শে স্পন্দিত হয়ে উপস্থাপিত হয় নি।—কবি-প্রতিভার মায়ায় ভাবের রূপে কল্পনার রঙ ধরে নি। ফলে অনেক সনেটের ভাষা হয়ে উঠেছে নির্জীব ও নিশ্চল। তাতে সংযত-গম্ভীর ধ্বনির সমারোহ যতটা আছে, প্রাণের সাড়া ততটা নেই।

অনেক ক্ষেত্রেই মধুসূদনের সনেটের ভাষা যে প্রাণবন্ত ও শব্দ-চেতনা যে তীক্ষ্ণ বলে মনে হয় না তার একটি কারণ হচ্ছে এই যে, 'মেঘনাদবধে' যেমন মহাকাব্যোচিত বিষয় ও প্রকাশভঙ্গির দিকে লক্ষ্য রেখে কবি একটা নব্যভাষারীতি গড়ে তুলেছিলেন, তেমনি নাটকীয় জীবনের শেষভাগে নবলব্ধ আকৃতি ও পুনরাবিষ্কৃত স্বদেশ-চেতনার যথার্থ বাণীরূপ গড়তে পারেন নি। তিনি যে নবার্জিত অভিজ্ঞতার সঞ্চয় নিয়ে সনেট রচনায় অগ্রসর হয়েছেন, তার দিকে তাকিয়ে শব্দসজ্জা ও ভাষা বিন্যাসের চেষ্টা সর্বত্র করেন নি—'মেঘনাদবধের' ভাষা-সংস্কার নিয়েই যেন চতুর্দশপদীর দুরূহ কবিকর্মে আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁর সনেটের শব্দধারা, ভাষারীতি, বাক্য বা বাক্যাংশ-যোজনা যে অনেকটা পরিমাণে মহাকাব্যটির আদলে গড়া এবং তার সুরে বাঁধা তা নিচের উদাহরণগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—

সনেট	মেঘনাদবধ
গৌড় সুভাজনে (১)	গৌড়জন যাহে (১)
কবিগুরু বাল্মীকির (১)	কবিগুরু…বাল্মীকি (৪)
দেব-দৈত্য-নরাতঙ্ক (১)	দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস (১), (৬)
গৌড়-চূড়ামণি (১)	ভারতের শিরঃচূড়ামণি (৪)
তিতি চক্ষুঃ জলে (৪৯), তিতি অশ্রুজলে (৫১)	তিতি অশ্রু-নীরে (৪)
দিনেন্দ্র যেন অস্তের অচলে (৪৯)	কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন (১)
বারিদ-রূপে, স্নেহ-বারি দানে (৪৯)	স্রোতস্বতী…সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে (৪)
এ পোড়া পরাণে (৪৯)	এ পোড়া আঁখি (৪), এ পোড়া নয়নে (৩)
নীরবিলা ধীরে সাধ্বী (৪৯)	নীরবিলা শশিমুখী (৪), নীরবিলা স্বরীশ্বর (২)
বাহ্য-জ্ঞান-শূন্য মূর্তি (৪৯)	বাহ্য-জ্ঞান-হত (২)

সনেট	মেঘনাদবধ
ভৈরব-আকৃতি শূরে (৫৩)	বীর যত···ভৈরব মূরতি (৩)
পূর্ণ ইরম্মদে (৫৩)	দ্রুত ইরম্মদে (১)
প্রলয়ের মেঘ যেন (৫৩)	প্রলয়ের মেঘ কিম্বা (৩)
ভীম শরাসনে (৫৩)	করে ভীম ধনু (১), ভীম প্রহরণে (৭)
মত্ত বীর-মদে (৫৩)	মত্ত রণমদে (৭), মাতি বীরমদে (৭)
টঙ্কারিছে মুহুর্মুহু, হুঙ্কারি ভীষণে (৫৩)	টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনুঃ (৩), টঙ্কারিলা শিঞ্জিনী ; হুঙ্কারি কেহ (৪)
বিজলী-ঝলসা রূপে (৫৩)	বিদ্যুতঝলা-সম (১) বিজলীর ঝলা সম (১)
টলিল গিরি সে ঘন কম্পনে (৫৪)	টলিল কনক লঙ্কা বীরপদভরে (১), (৭)
তেজস্বী মৈনাক যথা সাগরের জলে (৫৬)	যেন উড়িল মৈনাক-শৈল অম্বর উজলি(১)
ধরি ঘন ধূমের মূরতি, উড়িল চৌদিকে ধূলা (৫৬)	ঘন ঘনাকারে ধূলা উঠিল আকাশে (১)
নিদ্রা গেল অভিমন্যু অন্যায় বিবাদে	অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি বীরেন্দ্রে (৭)

এইভাবে পাশাপাশি রেখে বিচার করলে মনে হয়, 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' অনেকটা পরিমাণে 'মেঘনাদবধের' ভাষাদর্শে রচিত। সনেটগুলির নিম্নোদ্ধৃত ভাষা-পরিচয়ও সেই একই সাক্ষ্য দেয়—কাব্যের কানন, বহুবিধ পিক, সঙ্গীত-সুধার রস, কবি-কুল-ধন, স্বর্ণবীণা করে (২), কেলিসু শৈবলে, মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে (৩), গুঞ্জরিছে অলিপুঞ্জ, মৃদু কলকলে, কবিতা-পঙ্কজ-রবি (৪), মোহিনী-রূপসী-বেশে, অপ্সরাচয় নাচিছে অম্বরে, রাজপদে বরি, রাজাসন, রাজছত্র, দিবেন সত্বরে রাজলক্ষ্মী, চঞ্চল ধনদা রমা, সুধামৃতে চন্দ্রের মণ্ডলে (৫), চন্দ্রচূড়-জটাজালে, পবিত্রিলা আনি মায়ে, সে বিমল জলে (৬), নয়নরঞ্জন-রূপ, রশ্মি মাণিকের দেহে, আপনি ভারতী, সঙ্গীত-লহরী, সুমধুর তানে (৭) শিখিপুচ্ছ-চূড়া শিরে, গোকুল-ভবনে, সৌদামিনী ঘনে, নাচিবে শিখিনী সুখে, গাবে পিকগণে, ব্রজের সুন্দরী (৮), কবিতা-নিকুঞ্জে, শৈলেন্দ্র-সদনে (৯), দাসের বারতা লয়ে, কুসুমের কানে স্বনে মলয় যেমতি (১০), উড় শুভক্ষণে, ইন্দ্র-ধনুঃ-চূড়া শিরে, ব্রজাঙ্গনে, মন্দ্রি ভীম স্বনে, খগেন্দ্রে উপেন্দ্র-সম, তড়িত-রতনে (১১), মানিনী ভামিনী, কভু দাস (১২), ধরণীর বিম্বাধর

চুম্বেন আদরে, সুমধুর কলে, ওলো বরাঙ্গনে (১৩), সুবর্ণ দেউল, অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে, উর্ধ্বগামী জনে (১৪), কল্পনা সুন্দরী, অস্তগামি-ভানু-প্রভা, নন্দন কানন হতে, যাহার ধেয়ানে (১৬), ঋতু-রাজেশ্বরে, উজ্জ্বল অম্বরে (১৭), ধবল মূরতি, পদ্মরাগে জ্যোতিঃ নিত্য ঝলঝলে, পরম-ভকতি-ভাবে, ও রাঙা চরণে (১৮), বীণার সুস্বরে, পদ্মবাসিনি ভারতি (১৯), মহাব্রতে রত, স্বর্ণবীণা করে, শিখিপৃষ্ঠে শিখিধ্বজ (২০), কনক-কঙ্কণ হাতে, স্বর্ণ-মালা গলে, সাজাইবে গজ বাজী, উজ্জ্বলিত স্বর্ণবর্ণ-নীরে (২১), এ ভব-মণ্ডলে, যার গর্ভে ফলে, মণির উজ্জ্বলে, সুহাস-অম্বরে (২২), তারাচয় ফুটিছে গগনে, ফুল্ল ফুল-দলে (২৩), রতন-মুকুট শিরে, রজত-চরণে বীচি-রব-রূপ পরি নূপুর (২৪), কোন্ পুণ্যবলে, সংসার-মণ্ডলে, শিরঃশোভা (৬৭), আঁধার পিঞ্জর, রোদন-নিনাদ, মধু-বরিষণে (৬৮), বাসন্ত আমোদে, দ্বেষের অনলে (৬৯), বিফল যতনে, ফেন-চূড় জল-রাশি, যশোগিরি-শিরে, ভস্মের রাশি ঢাকে বৈশ্বানরে (৭১), শত ধিক তারে, ফুলেশ্বরী নলিনী, মন্দ-স্বর্ণ-রেখা-সম, সুধবল পাখা বিস্তারি অম্বরে, রতনের চূড়া-রূপে শিরোদেশে জ্বলে দীপাবলী (৭৭), সুরপুরে তিতিবেন যিনি (৭৮), গরুড়-ধ্বজে গরজেন ঘনে বীরেশ, তীক্ষ্ণ শর-জালে, স্বচ্ছ প্রবাহিণী, সুবর্ণ মন্দিরে, শোভ নভস্তলে (৮০), কমলিনী-রূপে, সুবর্ণ কিরণে, রতন-ব্রজ (৮১), নিশান্তে সুবর্ণ কান্তি নক্ষত্র যেমতি, খেদায় তিমির-পুঞ্জে, আঁধার নরকে (৮২), দেব-দৈত্য-দলে, লভিল অমৃত-রস, ভীমধ্বনি করে, কবি-কুল-মণি (৮৩) ইত্যাদি। তাছাড়া মহাকাব্যটির মতোই সনেটেও তৎসম ও যুক্তব্যঞ্জনমূলক শব্দ, নামধাতু, সমষ্টিবাচক তৎসম শব্দ, বিস্ময়সূচক অব্যয়, বিশেষ্যের পরে বিশেষণের প্রয়োগ যথেষ্ট লক্ষ্য করা যায়। তবে স্বীকার করতেই হবে, সনেটগুলিতে আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ নেই বলে এবং দূরান্বয় ও অনন্বয় দোষ প্রায় না থাকায় তাদের ভাষা মহাকাব্যটির ভাষার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠেছে। ভাষার স্বাভাবিক শ্রীও কতকটা দেখা দিয়েছে। শব্দের মধুসূদনীয় প্রয়োগ অবশ্য সনেটেও আছে—যেমন 'মৃদে', 'দ্রুতে', 'প্রচণ্ডে' ইত্যাদি ক্রিয়ার বিশেষণ প্রয়োগে এবং 'ভাগ্যবানতর', 'উজ্জ্বলে' (উজ্জ্বলতা অর্থে), 'অজাগর,' 'যদপিও' ইত্যাদি পদ গঠনে।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে, মহাকাব্যোচিত ভাষা-সংস্কার কম-বেশী পরিমাণে বজায় থাকায় মধুসূদনের সনেটের ভাষা তেমন প্রাণসম্পদ্

লাভ করতে পারে নি। 'মেঘনাদবধে' একটা ক্লাসিক্যাল ঢঙ সৃষ্টিতে তার যোগ্যতা যতই থাক না কেন, সনেটের ক্ষেত্রে তা সর্বত্র উপযোগী হয়ে ওঠে নি। সত্য বটে, সনেটে যে সংযম-সৌন্দর্য ও ক্লাসিক চরিত্র প্রত্যাশিত, নির্দিষ্ট গঠনের মধ্যে তা রূপায়িত করার জন্য ভাষায় সংযম রক্ষা করা বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু মধুসূদনের সনেটে ভাষাদর্শ বিষয়াশ্রিত ভাবাবেগ ও সজীব অনুভূতির স্ফূর্তিকে সংযম-শাসনে বাঁধবার দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পিত হয় নি, বিষয় ও আবেগনিরপেক্ষভাবে একটা গুরুগম্ভীর ভাষারীতি তাতে প্রয়োগ করা হয়েছে মাত্র। আর তারই জন্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' ভাষা 'বাগাড়ম্বর'[২] মাত্র বলে কারো কারো মনে হয়েছে। ভাবপ্রকাশের আলঙ্কারিক পদ্ধতিও সেই বাগাড়ম্বরের অন্যতম কারণ।

মধুসূদনের সনেটের ভাষা যে অনেক কবিতাতেই নীরস ও দীপ্তিহীন বলে মনে হয়, তার আর একটি কারণ তাঁর নিরুত্তাপ শব্দচেতনা। কাব্যে শব্দ শুধু বোঝায় না, বাজায়ও বটে—তাতে ছবি আভাসিত হয়, ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হয়, নতুন ভাব ও ধ্বনির আমন্ত্রণ ঘটে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' শব্দসজ্জায় সেই প্রত্যাশিত উদ্বোধনী শক্তি নেই, তা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কোনো নতুন অর্থ ও ব্যঞ্জনা ডেকে আনে নি। তাতে বর্ণগত ধ্বনি যতটা আছে, রসগত ব্যঞ্জনা ততটা নেই। কবিতাগুলির বিশেষণপ্রাচুর্যে যে ভার মাত্র জমেছে, তার উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) 'রাজীব' চরণে (৭৯)
(২) 'সুবর্ণ' কিরণে (৮১), 'সুচারু' কিরণে (৮২), 'কনক' কিরণে (৪৯)
(৩) 'বরাঙ্গ' তোর (৯০)
(৫) 'সুমধুর' রবে (৯১), 'সুমধুর' বচনে (৯৪), 'সুমধুর' স্বরে (৯৫)
(৬) 'হেমাঙ্গি' রোহিণি (৫২)
(৭) 'উজ্জ্বলিত' 'স্বর্ণবর্ণ' নীরে (২১)
(৮) 'চিররুচি' কোকনদ (৫২)

এই ধরণের বিশেষণ ব্যবহার প্রথাসিদ্ধ, তার সম্পর্কে একথা বলা চলে না

২. 'তিনটি কি চারটি বাদ দিয়ে চতুর্দশ-পদাবলি বাগাড়ম্বর মাত্র।' বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা (১৩৬৮), পৃঃ ১৭।

যে— আঁখি দিয়া দেখি তব বলে
ভাব-পটে কল্পনা যা সদা চিত্র করে।[৩]

এ ছাড়া মধুসূদনের সনেটে ভাষাগত আর একটি ত্রুটি হচ্ছে একই ধরনের শব্দ বা বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি। অলঙ্কৃত বাক্যে 'যথা', 'যেমতি', 'তেমতি', 'হেন', 'সম', 'মত' ইত্যাদি সাদৃশ্যমূলক শব্দ স্বাভাবিকভাবেই প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে এবং বিভিন্ন কবিতায় তাদের ব্যবহারের রীতিও অনেকটা একই ঢঙের। 'সু' উপসর্গের অনাবশ্যক পীড়ন ঘটেছে বারে বারে—সুরঙ্গ (৭), সুমধুর (১৩), সুশ্যামাঙ্গ (২০), 'সুভূষণে' (৬৭), 'সুসঙ্গীত' (৮৩), সুভাবের (৯৬), 'সুনির্মল' (১০০) ইত্যাদি তার নিদর্শন। সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে, 'সুন্দরী' শব্দের বহুল প্রয়োগ[৪]—কখনও তা সম্বোধনাত্মক ঢঙ বজায় রেখেছে, কখনও পাদ-পূরণের কাজে লেগেছে। এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় যে, প্রায় প্রতিটি সনেটে বর্ণিতব্য বিষয়কে সরাসরি লক্ষ্য করে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে বলে সম্বোধনাত্মক শব্দ-ব্যবহারে গতানুগতিকতা এসে গেছে—হে বঙ্গ (৩) ওরে বাছা (৩), ধন্য তুমি (৪), দেখ তব ঘরে (৫), হে কাশি (৬), যশস্বি তুমি (৫), চল যাই, জয়দেব, (৮), হে কবীন্দ্র (৯), পড়ে কি হে মনে? (১০), হে প্রভু (১১), কোথা লো (৬৪), লো সরসি (৬৫), রূপসি (৬৫), তুই (৬৭), ক মোরে (৬৮), মা গো (৬৯), রে কাল (৭১), লো সুন্দরী (৭২), মা ভারতি (৭৩), যাও দ্রুতে (৭৮), ইত্যাদি। তবে এই সব বাক্যাংশে কবি যে বাংলা ভাষা ও বাঙালী জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রাখতে পেরেছেন, এটা অবশ্য প্রশংসার কথা। অন্য দিকে 'সৃষ্টিকর্তা,' 'সূর্য', 'প্রাণ', 'রাশি-চক্র', 'পরলোক', 'শ্মশান' 'দ্বেষ', 'শনি' ইত্যাদি সনেটের ভাষা খুবই গদ্যাত্মক—নদীতে পিঠ-উঁচিয়ে দেওয়া চড়ার মতো—শুধুই খট্‌খটে মাটি, জল গেছে শুকিয়ে।

এই সমস্ত মন্তব্য অবশ্য মধুসূদনের কতকগুলি সনেট সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। যে সমস্ত সমালোচক 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' মধ্যে একটা আত্মগত ভাবের

৩. 'নন্দন-কানন' নামক সনেটে মধুসূদন ভারতীকে সম্বোধন করে একথা বলেছেন।

৪ ৮, ১৬, ২৫, ২৬, ২৭, ৪০, ৪৮, ৫০, ৫২, ৫৮, ৫৯, ৬৩, ৭০, ৭২, ৭৭, ৭৮, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯৮ প্রভৃতি সংখ্যক সনেটে তার উদাহরণ পাওয়া যাবে।

সহজ ও সুন্দর প্রকাশ দেখেছেন এবং কাব্যটিকে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ রচনা হিসেবে নির্দেশ করেছেন, তাঁরা সেই কবিতাগুলির ওপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বস্তুতঃপক্ষে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' কতকগুলি সনেট—বিশেষ করে 'বঙ্গভাষা', 'কমলে কামিনী', 'কাশীরাম দাস', 'জয়দেব', 'পরিচয়' (১), 'সায়ংকাল', 'সায়ংকালের তারা'. 'সীতা দেবী', 'কবতক্ষ নদ', 'করুণ রস', 'বিজয়া-দশমী', 'নূতন বৎসর', 'শ্যামা-পক্ষী', 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', 'মিত্রাক্ষর', 'ব্রজবৃত্তান্ত', '১০০',—ভাবের আন্তরিকতায় ও ভাষার যাথার্থ্যে সার্থক কবিতা হয়ে উঠেছে। কবিতাগুলির মর্মবস্তুতে অনুভূতির স্পন্দন ও কল্পনার লীলা অধিকতর স্বচ্ছন্দ হওয়ায় ভাষায়ও প্রাণের সাড়া জেগে উঠেছে ও কবিত্বের রস স্ফুরিত হয়েছে। সেদিক থেকে নিম্নোদ্ধৃত অংশগুলি উল্লেখযোগ্য—

(১) স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কয়ে দিলা পরে,—
'ওরে বাছা মাতৃ-কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে !'

—বঙ্গভাষা।

(২) দিনেশে যে দেশে সেবে নলিনী যুবতী ;—
চাঁদের আমোদ যথা কুমুদ-সদনে ;—
সেই দেশে জনম মন ; জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেম-দাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে।

— পরিচয় (১)।

(৩) কবির হৃদয়-বনে যে ফুল ফুটিবে,
সে ফুল-অঞ্জলি লোক ও রাঙা চরণে
পরম-ভকতি-ভাবে চিরকাল দিবে

(৪) সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;

—'কবতক্ষ নদ'।

(৫) দূরে কি নিকটে,
যেখানে যখন থাকি, ভজিব তোমারে ;
যেখানে যখন যাই, যেখানে যা ঘটে !
প্রেমের প্রতিমা তুমি, আলোকে আঁধারে !

—১০০।

এই উপরি-উদ্ধৃত অংশগুলির ভাষা যে বেশ সরল ও অনাড়ম্বর, একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে এই জাতীয় উদাহরণের সংখ্যা বেশী নয়, সেই কারণে তার ওপর নির্ভর করে ১০৮টি সনেটের ভাষার সামগ্রিক মূল্যায়ন সঙ্গত নয়।

মধুসূদনের সনেটের রূপ ও রীতি বিশ্লেষণ করে দেখা গেল, প্রথানুগত অলঙ্কার-চর্চা ও নিষ্প্রাণ ভাষা-বিন্যাসের ত্রুটি সত্ত্বেও সনেটগুলির অবয়ব-সংস্থানে ও রূপ-নির্মিতিতে কবির শিল্প-নৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় আছে। আরও বোঝা গেল, এই বিশেষ কাব্যকলার ছকটি তিনি ঠিকই ধরতে পেরেছেন এবং বিচক্ষণতার সঙ্গেই বাঙলা ভাষায় উপস্থাপিত করতে সমর্থ হয়েছেন। সাংগঠনিক পরিকল্পনায় ও রূপোপাদান-সমাবেশে কবির এই কৃতিত্বের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে, সন্দেহ নেই। তবে আমাদের নির্ধারণ করা দরকার,—ঋজু, কঠিন ও সংহত রূপবলয়ের মধ্যে প্রাণবান্ ভাবের সংযোগে সনেটগুলি কবিত্বগুণোপেত ও ঐক্যরসাশ্রিত সৃষ্টি হয়ে উঠেছে কিনা, কারণ সেই নির্ধারণের ওপরই নির্ভর করছে তাদের চূড়ান্ত কাব্যমূল্য।

মধুসূদনের সনেটের কাব্যমূল্য নির্ধারণের সময় তাঁর তৎকালীন মানসিক অবস্থাটা মনে রাখা প্রয়োজন। তিনি ফ্রান্সের ভার্সাই সহরে যখন বাস করছিলেন, তখন তাঁর ব্যবহারিক জীবন একেবারে বিপর্যস্ত। এর আগেও তাঁর জীবনে দুঃখ এসেছে, এসেছে অভাব—কিন্তু তখন তিনি এমন ভাবে ভেঙে পড়েন নি, সংসারের টানাপোড়েনের হাত থেকে আপন শক্তি বলেই আপনাকে তিনি মুক্ত করেছেন। কিন্তু বিদেশে যখ
তখন বিদ্যাসাগরের দিকে আকুল দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন, কিন্তু সমস্ত সম্ভাব্য সাহায্য সত্ত্বেও তিনি শান্তি পান নি। ততদিনে তিনি প্রায় সব খুইয়ে বসে আছেন,

মনের দিক থেকে দ্রুত দেউলে হয়ে যাচ্ছেন। মধুসূদন তখন নিঃস্ব হওয়ার পথে—বাইরের দিক থেকে যেমন, তেমনি ভেতরের দিক থেকে। মাঝে মাঝে তিনি জানাচ্ছেন বটে—আমি অবিশ্রান্ত পড়ে যাচ্ছি, শিখে যাচ্ছি—কিন্তু তখনকার আর্থিক সংকট ও মানসিক অশান্তির ফলে সেই বিদ্যাচর্চাও তাঁর কবিসত্তার সমৃদ্ধিতে ও সৃষ্টিশক্তির পরিশীলনে সহায়ক হয়েছিল বলে মনে হয় না। বস্তুতঃ পক্ষে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনার সময় শোক-দুঃখের চাপে মধুসূদনের মনের সরসতা ও প্রাণাগ্নির তেজ যে অনেকটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তার ইঙ্গিত আছে শেষ সনেটটিতে—

> বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
> (হৃদয়-মণ্ডপ হায়, অন্ধকার করি !)
> ও প্রতিমা ! নিবাইল, দেখ, হোমানলে
> মনঃ-কুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি !
> শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
> যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
> সংসারের ধর্ম, কর্ম ! ডুবিল সে তরি,
> কাব্য-নদে খেলাইনু যারে পদ-বলে
> অল্পদিন ! ····· —সমাপ্তে।

মধুসূদনের যে হোমানল নিভে গেছে, তা সৃষ্টির হোমানল। প্রমিথিউস স্বর্গ থেকে আগুন নিয়ে এসেছিলেন ; কবিও আগুন নিয়ে আসেন—সৃষ্টির আগুন। সেই আগুনে গালাই হয়ে ঢালাই হয়ে দেখা দেয় ভাবের প্রতিমা, কবির সাহিত্যের প্রাঙ্গণ কালক্রমে ভরে ওঠে। কিন্তু মধুসূদনের সৃষ্টির হোমানল নির্বাপিত—মনঃকুণ্ডে অশ্রু-ধারা মনোদুঃখে ঝরি। একদা কাব্য-নদীতে শক্তির অফুরন্ত উল্লাসে তিনি অনায়াসে বিচরণ করেছেন। কিন্তু আজ দুরদৃষ্টের অভিশাপ এসেছে, অনুভূতির যে উৎস থেকে কবিত্বের রস সঞ্চারিত হয় তা শোকদুঃখের তাপে শীর্ণ হয়ে গেছে। মনে রাখতে হবে, এর পরে আর কোনো পূর্ণাঙ্গ কাব্য তিনি রচনা করতে পারেন নি। নিছক কবিত্ব ও রসাভিব্যক্তির দিক থেকে 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' যে প্রশংসার দাবী করতে পারে না, মধুসূদনের এই ক্ষীয়মাণ সৃষ্টিশক্তির মধ্যে তার কারণ নিহিত। তাই তার অনেক সনেট পড়লে মনে হয়, কাব্যগত ভাব কবি-মনের সোহাগ-স্পর্শে রসসিক্ত হয়ে ওঠে নি। শুধু তাই নয়, বিষয়ের উপর কবিদৃষ্টির আলো ঠিকমতো প্রতিসৃত হয়ে বিচিত্র রূপ লাভ না

করায় বিষয়ের কাব্যিক সম্ভাবনাও সীমিত থেকে গেছে। উদাহরণ স্বরূপ 'রামায়ণ' (৮৮) কবিতাটির কথা উল্লেখ করতে পারি। যে কাহিনী অনন্তকাল ধরে বহু মানুষের অন্তরের পিপাসা পরিতৃপ্ত করে এসেছে, যার অনির্বাণ শিখা থেকে কবিরা যুগে যুগে জ্বালিয়েছে সহস্র কাব্যের প্রদীপ তা মধুসূদনের কবি-কল্পনাকে যেন একেবারেই উজ্জীবিত করতে পারে নি। গুরুর কৃপায় যে দিব্য চক্ষু তিনি পেয়েছেন, তা দিয়ে শুধু দেখলেন—

দেখিনু সুক্ষণে
শিলা জলে ; কুম্ভকর্ণ পশিল সমরে,
চলিল অচল যেন ভীষণ ঘোষণে,
কাঁপায়ে ধরায় ঘন ভীম-পদ-ভরে।
বিনাশিলা রামানুজ মেঘনাদ রণে ;
বিনাশিলা রঘুরাজ রক্ষোরাজেশ্বরে।

কতকগুলি ঘটনার এই নীরস বিবরণের মধ্যে যেমন ভারতবর্ষের 'ভূতলজঠর থেকে উদ্ভূত' রামায়ণের মর্মরস ধরা পড়ে নি, তেমনি কোন গভীরতর উপলব্ধির ব্যঞ্জনা সঞ্চারের আয়োজন হয় নি। মধুসূদন যেটুকু দেখেছেন তা রূপোজ্জ্বল নয়—তাঁর সৌন্দর্য-চেতনার স্বাক্ষর কোথায়ও নেই। তার চেয়েও লক্ষণীয়, কবির ক্লান্তমন যেন কিছু ভাবতে চায় নি—তাই সনেটটি পড়বার সময় কোনো ভাবের ঝলক পাঠকের মনকে আলোকিত করে দেয় না। মধুসূদনের মনোভঙ্গি এখানে বড়ই গদ্যাত্মক। বলা দরকার, একথাগুলি তাঁর সনেট-সংগ্রহের অনেকগুলি কবিতা সম্পর্কেই প্রযোজ্য এবং সে কারণে তাদের কাব্যমূল্যও খুবই সীমিত।

তবে পূর্বে ভাষা-প্রসঙ্গে যে কয়েকটি সনেটের সপ্রশংস উল্লেখ করেছি, কবিত্বের দিক থেকেও সেগুলি বিশেষ উপভোগ্য বলে মনে করি। তার কারণ, মধুসূদনের দুঃখব্রত চিত্ত এদের মধ্যে স্মৃতির বাতায়ন খুলে দিয়েছে। কবির স্মৃতি পাকা জহুরির মতো তার মণিকুট্টিমে যে দুর্লভ রত্নকণাগুলি গোপনে সঞ্চয় করে রেখে-ছিল, শেষ বোঝাপাড়ার দিনে তা আঁচল বিছিয়ে কবিকে দেখিয়ে দিল। মধুসূদন দেখতে পেলেন দেশের মৃন্ময় ও চিন্ময় মূর্তি ; বুঝতে তাঁর দেরী হল না—এই তাঁর নতুন প্রত্যয়ের উপকরণ, এই পথেই ঘটবে তাঁর শেষ রসতীর্থ-যাত্রা। এইভাবে দুঃখের হোমাগ্নি-শিখা জ্বালিয়ে সত্যের যে খাঁটি সোনা তৈরী করলেন, তাকে তিনি পরম মমতায় গ্রহণ করলেন। ফলে শস্যাঢ্যি জন্মভূমির

প্রাণ-সংবেদনায় ও কবির আত্মাবিষ্কারের আন্তরিকতায় এই সনেটগুলিও হয়ে উঠেছে মর্মস্পর্শী। তাছাড়া সনেটগুলির ভাবে ও রূপে কবির হৃদয়-রসের সুধাক্ষরণের সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে কল্পনার লাবণ্য। যে মধুসূদন জানতেন—

সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ।

—কবি।

তিনি যেন এই কবিতাগুলির মধ্যেই কল্পনার ডানায় ভর করে মানসাভিসারের সুযোগ পেয়েছেন। আর সেই কারণেই কবির অন্তরাশ্রিত ভাবলোকে কল্পনার মায়াঘন ছটা লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। পূর্বে দেখেছি, কবিতাগুলির মধ্যে ভাবের যে সুষমা আছে, তার বাঙ্ময় মূর্তি রচনায় ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কারেরও সুন্দর সহযোগিতা ঘটেছে। উল্লিখিত সনেটগুলির দেহ-আত্মার এই সৎ ও সুষম প্রকাশের মধ্যেই তাদের কাব্যমূল্য নিহিত। মধুসূদনের সার্থক সনেটগুলির অন্যতম উদাহরণ হিসেবে আমরা 'বিজয়া-দশমী' সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি—

"যেও না রজনি, আজি লয়ে তারাদলে!
গেলে তুমি, দয়াময়ি, এ পরাণ যাবে!—
উদিলে নির্দয় রবি উদয়-অচলে,
নয়নের মণি মোর নয়ন হারাবে!
বার মাস তিতি, সতি, নিত্য অশ্রুজলে,
পেয়েছি উমায় আমি! কি সান্ত্বনা-ভাবে—
তিনটি দিনেতে, কহ, লো তারা-কুন্তলে,
এ দীর্ঘ বিরহ-জ্বালা এ মন জুড়াবে?
তিন দিন স্বর্ণদীপ জ্বলিতেছে ঘরে
দূর করি অন্ধকার; শুনিতেছি বাণী—
মিষ্টতম এ সৃষ্টিতে এ কর্ণ-কুহরে!
দ্বিগুণ আঁধার ঘর হবে, আমি জানি,
নিবাও এ দীপ যদি!"—কহিলা কাতরে
নবমীর নিশাশেষে গিরীশের রাণী।

৫। চতুর্দশপদীতে মধুসূদনের অনুকরণ

যুগপ্রবর্তক কবিদের দুর্ভাগ্য এই যে, সমকালের কাছে তাঁদের সৃষ্টিকর্মের যথার্থ মূল্য সাধারণতঃ ধরা পড়ে না। প্রথানুগত পূর্বতন কাব্যকলার বিরুদ্ধে তাঁদের যে বিদ্রোহ ভাব ও রীতির মৌলিকতায় প্রকাশ পায়, তার প্রকার ও প্রকৃতি নিয়ে ভুল বোঝার দৃষ্টান্তও বিরল নয়।[১] অনেক সময় দেখা যায়, নবকাব্যকলার কোনো গৌণ লক্ষণের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপিত হয় এবং সেদিক থেকেই তার ব্যর্থ অনুসরণের চেষ্টা প্রবল হয়ে ওঠে। তাছাড়া নূতন ভাব ও রূপ নিয়ে যুগস্রষ্টার কাব্যকৃতি যে পূর্ণ গোলকত্ব ও অখণ্ডত্ব লাভ করে, তার যথার্থ আদর্শানুশীলন কতকটা সমভাবুকতা ও তুলনীয় শিল্প-দক্ষতার ওপর নির্ভর করে। অথচ অনুবর্তীরা সে-সম্বন্ধে সচেতন না থেকেই অক্ষম অনুসরণে এগিয়ে আসেন। ফলে সৃষ্টি হয় ফ্যাশানের[২], সেই ফ্যাসানের নিজস্ব মূল্য স্বভাবতঃই সামান্য।

মধুসূদন 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' যে নূতনত্ব প্রবর্তন ও প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সমসাময়িক ও অনুবর্তী কবিরা তার স্বরূপ ধরতে পারেন নি। তাঁরা সনেট বলতে বুঝলেন, চোদ্দ চরণের কবিতা। কিন্তু সেই চোদ্দ চরণের

---

১. হেমচন্দ্রের খণ্ডকবিতাসংগ্রহ 'কবিতাবলীর' (১৮৭০) প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হলে 'কলিকাতা গেজেটে' তার এই পরিচয় দেওয়া হয়—'পুস্তকের নাম—কবিতাবলী বা Sonnets। বিষয়—বিবিধ বিষয়ক Sonnets,...'। অর্থাৎ খণ্ডকবিতাগুলিকে সনেট নামে অভিহিত করা হয়। সেকালে সনেট বলতে যে ছোটকবিতাকে মনে করা হত এবং সনেটের স্বরূপ সম্বন্ধে যে স্পষ্ট ধারণা ছিল না, এটা তার প্রমাণ।

২. 'যারা সাহিত্যের ওমরাও-দলের, যারা নিজের মন রেখে চলে, স্টাইল তাদেরই। আর যারা আমলা-দলের, দশের মন রাখা যাদের ব্যবসা, ফ্যাশান তাদেরই। বঙ্কিমি স্টাইল বঙ্কিমের লেখা "বিষবৃক্ষে," বঙ্কিম তাতে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন; বঙ্কিমি ফ্যাশান নসিরামের লেখা "মনোমোহনের মোহনবাগানে," নসিরাম তাতে বঙ্কিমকে দিয়েছে মাটি করে।'—শেষের কবিতা।

আয়তনের মধ্যে একটানা ভাবের প্রবাহ ও পয়ার-মিল যে অনভিপ্রেত এটা যেমন তাঁরা বুঝতে পারলেন না, তেমনি নিয়মানুগ মিল ও গাঢ়বন্ধ কাঠামোর মধ্যে ভাবের উপস্থাপনায় যে এর শিল্পসৌন্দর্য নিহিত, এ তত্ত্বও তাঁদের কাছে ধরা পড়ল না। ফলে অনুবর্তীদের হাতে মধুসূদনের সনেট হয়ে দাঁড়াল চতুর্দশ পদের খণ্ডকবিতা মাত্র। নূতন শিল্পরূপের প্রতি কবিসুলভ আকর্ষণ বশতঃ কিংবা অন্তর্লোকের ভাবচিন্তা প্রকাশের উপযুক্ত বাহন বলে মনে হওয়ায় সনেটের দিকে তাঁরা হাত বাড়ান নি, তাঁরা সনেটের চর্চা করেছেন নিতান্তই ফ্যাশান হিসেবে।

সনেটের ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রথম অনুকারক হচ্ছেন রামদাস সেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ৫০টি কবিতা নিয়ে তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতামালা' প্রকাশিত হয়। পরে গ্রন্থটি যখন 'কবিতালহরীর' অন্তর্ভুক্ত হয় তখন চতুর্দশপদীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৩[৩]। কবিতাগুলির শিরোনাম হচ্ছে এই—আমি; কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত; কপালকুণ্ডলা; ভগবান শঙ্করাচার্য; তুষারাবৃত গিরি; বন্ধু-বিয়োগ—১; বন্ধু-বিয়োগ—২; মুঙ্গের দুর্গ; পাদ্রি লং সাহেব; পাপীর খেদ—১; পাপীর খেদ—২; পাপীর খেদ—৩; কাসীম বাজারের ধ্বংস; ভট্ট মোক্ষমূলর; ফিঙ্গাপক্ষী; সঙ্গীত; নাট্যশাস্ত্রপ্রণেতা ভরতমুনি; ইয়ং বেঙ্গল—ভণ্ডতপস্বী; বালক; যুবা—১; যুবা—২; সংসার; পরমভাগবত শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী; আচার্য গোবর্ধন; ময়ূর ভট্ট; দাম্পত্য-প্রেম; রাখাল ও তাঁহার প্রণয়িণী; রোদাবার রূপ বর্ণন; শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব; রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি মন্দির দর্শনে; নূতন কাব্যকর্তা; রাজা নন্দের সভায় অপমানিত চাণক্য পণ্ডিতের উক্তি, সুকবি শ্রীশিহ্লণ মিশ্র; কবি কর্ণপুর, ভর্তৃহরি; পর্বতময় প্রদেশে ঝড়বৃষ্টি; সেরাজদৌল্লার প্রেতস্তম্ভ দর্শনে—২; রাত্রিকালে সমুদ্র দর্শনে; রাত্রি এবং প্রভাত—১; রাত্রি এবং প্রভাত—২; বিষপূর্ণ পাত্রহস্তে কৃষ্ণকুমারী; বীর বাক্যাবলী—১; বীর বাক্যাবলী—২; শোকাকুলা কামিনী; বুদ্ধদেব; ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাই; অহল্যা বাই; কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেব; জন্মভূমি; মহাত্মা গোকুল দাস তেজপাল; বিদ্যুৎ; চাতক।

৩. ১২৭৫ সালে শ্রীনিমাইচরণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত 'কবিতালহরীর' দ্বিতীয় সংস্করণ দ্রষ্টব্য।

এই সূচীপত্রের দিকে তাকালে চতুর্দশপদীগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য প্রথমেই চোখে পড়ে। মধুসূদনের আদর্শ অনুসরণ করেই তিনি প্রেমকে এদের একমাত্র উপজীব্য করেন নি, চতুর্দশপদী নামে 'নানাবিষয়িণী কবিতাকলাপ' রচনা করেছেন। ব্যক্তি, প্রকৃতি, পাখী, সংসার, জীবনের বিভিন্ন দশা, সঙ্গীত, কবি, সাহিত্যোক্ত চরিত্র, ঐতিহাসিক ঘটনা বা ধ্বংসাবশেষ অবলম্বনে তিনি যে কবিতা রচনা করেছেন মধুসূদনের সনেট স্পষ্টতঃই তার প্রেরণাস্থল। সনেটের বিষয়বস্তু হিসেবে এদের মূল্য অবশ্যস্বীকার্য। এ-প্রসঙ্গে 'রহস্য-সন্দর্ভের' [৪] মন্তব্য উল্লেখযোগ্য— '...তাহার প্রায় সমস্ত বিষয়গুলি সুচারু এবং নীতিগর্ভ।'

'চতুর্দশপদী কবিতামালায়' রামদাস সেন মধুসূদনের আদর্শানুসরণে চতুর্দশ-মাত্রক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ব্যবহার করেছেন। মাঝে মাঝে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগও লক্ষণীয়।[৫] বাঙলা সনেটের পক্ষে এই ছন্দের উপযুক্ততা সম্বন্ধে সচেতন থেকে তিনি এটা করেছেন কিনা, বলা কঠিন। তবে জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক তিনি যে ছন্দের ক্ষেত্রে পূর্বসূরীর পথেই চলবার চেষ্টা করেছেন, এটা তাঁর পক্ষে প্রশংসার কথা। তাছাড়া রামদাস কোনো কবিতাতেই চোদ্দ চরণের সীমা লঙ্ঘন করেন নি। মনে রাখা দরকার, সে-যুগের কবি ও সমালোচকদের চোখে চোদ্দ চরণের সুনির্দিষ্টতাই ছিল সনেটের প্রধান লক্ষণ। সে-কারণেই 'চতুর্দশপদী কবিতামালার' আলোচনা প্রসঙ্গে 'নানাপ্রবন্ধ' [৬] পত্রে বলা হয়েছিল—'প্রত্যেক কবিতাই চতুর্দশ পদে সমাপ্ত, এই নিমিত্ত ইহার নাম চতুর্দশপদী।'

রামদাসের চতুর্দশপদীগুলির ভাষায় মধুসূদনের প্রভাব আছে। পূর্বসূরীর অনুসরণে তিনি অনেক ক্ষেত্রে শব্দ ও বাক্যাংশ যোজনা করেছেন—তেমতি; কি শোভা ধরেছে; এবে; সুমন্দ; কুরঙ্গ শিশু; পোড়া মনে; প্রফুল্লিত; সুশোভিত; বিদ্যাধরী; বিরস বদনে বসি; বিখ্যাত নামে রূপ, সনাতন; অদূরে বাজিছে বীণা; খদ্যোতের মালা; সুমধুর কাব্য; সুকবি; মানস-

৪. ৪ পর্ব, ৪৬ খণ্ড।

৫. 'অমিত্রাক্ষরগুলিও নীরস হয় নাই।' —১২৭৪, ৩রা মাঘ, সংবাদ প্রভাকর।

৬. ১২৭৪, মাঘ, দ্বিতীয় ভাগ, ১০ম সংখ্যা।

প্রফুল্লকর স্বর্গীয় সুরভি, তমালের তলে; রাধিকা-রমণে; শ্যাম গুণমণি; মধুসম মধুমাসে; শ্রীমধুসূদন; গৌড়-জন-মন; সদর্পেতে বীরহিয়া জাগিল অমনি; দিবানিশি ভ্রমিতেছে ইত্যাদি। তাঁর কবিতার মিলও অনেক ক্ষেত্রে মধুসূদনের সনেটের মিল স্মরণ করিয়ে দেয়। মধুসূদনের মতোই তিনি মিলে হলন্ত অক্ষর কিছু কিছু ব্যবহার করেছেন বটে, তবে বেশী ব্যবহার করেছেন স্বরান্ত অক্ষর। মিলসূচক শব্দগুলি হয় দুই মাত্রার, নয় তিন মাত্রার; চার মাত্রার শব্দ খুব কম চোখে পড়ে।

সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে, রামদাসের 'চতুর্দশপদী কবিতামালা' মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' আদর্শে রচিত। আর সেইজন্যই 'কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত' নামে একটি চতুর্দশপদী লিখে তিনি গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

মধুসম মধুমাসে মোহন-বাঁশরী।
বাজান নিকুঞ্জবনে রাধাকান্ত-হরি॥
শুনি গোপ গোপীগণ আনন্দে বিহ্বল।
চকিত স্থগিত নেত্রে হেরে বনস্থল॥
তেমতি বংশীর রবে শ্রীমধুসূদন।
প্রেমানন্দে ভাসাইলা গৌড়-জন-মন॥
বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা, তিলোত্তমা মুখে।
তানলয় সঙ্গীতের ধ্বনি শুনি সুখে॥
পুনঃ মেঘনাদ মুখে রণ ভেরি শুনি।
সদর্পেতে বীরহিয়া জাগিল অমনি॥
নবরসে প্রপূরিত তোমার সঙ্গীত।
কাব্য-প্রিয় বাঙ্গালির যাহে জন্মে প্রীত॥
কাব্যের কানন দিকে পুনঃ কর্ণ ধায়।
শুনিতে নূতন স্বর তোমার গাথায়॥

কিন্তু মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' যে 'নূতন স্বর' শোনা গিয়েছিল, রামদাস তার স্বরূপ ঠিক মতো ধরতে পেরেছিলেন বলে মনে হয় না। চোদ্দ চরণের রূপবন্ধ, চরণে চোদ্দ মাত্রার শাসন, মিলে দুই বা তিন মাত্রার শব্দ ব্যবহার, স্বরান্ত অক্ষরের সাহায্যে মিল-যোজনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি মধুসূদনের আদর্শ বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করলেও সনেটের আরও কতকগুলি অপরিহার্য লক্ষণ

উপেক্ষা করেছেন। আমরা পূর্বে দেখেছি, মধুসূদন পাশ্চাত্ত্য মডেলের দিকে দৃষ্টি রেখে পেত্রার্কীয় সনেটগুলিতে একটা দ্বিধাবিভক্ত রূপাবয়ব নির্মাণ ও দুই অংশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পরিণামে এক অখণ্ড ভঙ্গিমা সুষম সৌন্দর্য সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছিলেন। অন্তরঙ্গ ভাব ও বহিরঙ্গ রূপের এই বিন্যাস-ভঙ্গির সঙ্গে তাল রেখে অষ্টক-ষট্‌কে বিভিন্ন মিল যোজনার দিকেও তাঁর দৃষ্টি ছিল। মিল্টনীয় সনেটগুলির মধ্যে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ না থাকলেও মিল-বিন্যাসে বিশিষ্টতা দেখতে পাওয়া যায়। আর তিনি যে কয়টি সেক্সপীরীয় ঢঙের সনেট লিখেছেন, তাতে পাশ্চাত্ত্য মডেলের সাংগঠনিক ও মিলগত বৈশিষ্ট্য একেবারে উপেক্ষিত হয় নি। সত্যকথা, তাঁর রচিত পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেটগুলিতে নিয়মের ব্যতিক্রম অনেক আছে, তৎসত্ত্বেও তাদের আকৃতি ও প্রকৃতির বিশিষ্টতা বুঝতে পারা যায়। কিন্তু রামদাস চতুর্দশপদী কবিতামালায়' পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেটের বিশেষ শিল্প-সূত্রগুলি একেবারে বর্জন করেছেন। তাতে যেমন ভাব প্রকাশের dialectical পদ্ধতি, তেমনি logical পদ্ধতি অনুসরণের কোন চিহ্ন নেই—ফলে ভাবে ও রূপে তাদের কোনো বিশেষ চরিত্র ফুটে ওঠেনি, ভাবের একটানা প্রবাহে সাধারণ কবিতা হয়ে উঠেছে মাত্র। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, মধুসূদনের সনেটে মিল-বৈচিত্র্য দেখেও তিনি চিরাচরিত পয়ার-মিলে সনেটগুলি রচনা করেছেন এবং আধুনিক-পূর্ব রীতি অনুযায়ী চরণশেষে এক দাঁড়ি ও দুই দাঁড়ি ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ কবির রচনা ভঙ্গি প্রথাসিদ্ধ মিত্রাক্ষর দ্বিপদীর মতো, তাতে কোনো নূতনত্ব নেই।

এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়, রামদাস সনেটের সাধারণ শিল্প-সূত্রগুলি মোটামুটি অনুসরণ করলেও বিশেষ শিল্প-সূত্রগুলি একেবারে বর্জন করায় তাঁর রচিত কবিতাগুলি সনেট হয়ে উঠতে পারেনি, চতুর্দশপদী কবিতামাত্র হয়েছে।

যে সব চতুর্দশপদীতে ভাগবত বিভাজন আছে, সেখানেও কবি পূর্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ও সচেতনভাবে সেই বিভাজন ঘটান নি। যেমন 'মুঙ্গের দুর্গ' কবিতায় মুঙ্গেরে মীরকাশিমের চিরস্থায়ী কীর্তির কথা আছে প্রথম ছয় চরণে, পরের আট চরণে আছে 'মায়াবিনী আশার কাহিনী'।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কবিতা হিসেবে তাঁর চতুর্দশপদীগুলির মূল্য কতটুকু? সেকালের সমালোচকেরা কবিতাগুলির যে প্রশংসা করেছিলেন,[৭] তার কি কোনো

৭, 'অধিকাংশ কবিতাই প্রাঞ্জল, সুললিত এবং সুশ্রাব্য।'—১২৭৪, ৩রা মাঘ, সংবাদ-প্রভাকর।

সঙ্গত কারণ আছে? সে বিচার করতে গিয়ে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, রামদাস উচ্চ প্রতিভাসম্পন্ন কবি ছিলেন না। দ্বিতীয়তঃ কোনো গভীর অন্তঃপ্রেরণা থেকে নয়, নিতান্তই ফ্যাসানের মোহ থেকে কবিতাগুলির জন্ম। তৃতীয়তঃ রামদাসের আদর্শস্থানীয় মধুসূদনের সনেটেও অনেক ক্ষেত্রেই তেমন কবিত্বগুণোপেত নয়। এমনি অবস্থায় রামদাসের নিছক চতুর্দশপদীগুলিতে কবিত্বসম্পদ যে সীমিত পরিমাণে থাকবে, এটা স্বাভাবিক। তবু সেকালের (মধুসূদনের কাব্য বাদে) বাঙলা কবিতার ঐতিহাসিক পটভূমিকা ও সাধারণ মনের কথা বিবেচনা করলে রামদাসের কবিতাগুলিকে 'অ-কবিতা' বলা যায় না। কবিতাগুলিতে আর কিছু না থাক ভাবের পরিচ্ছন্নতা ও প্রকাশভঙ্গির প্রাঞ্জলতা আছেই। একটা পরিমিত পরিসরের মধ্যে মনের কথা গুছিয়ে বলার শক্তিও অর্জন করেছেন। 'অমূল্য কবির যশ' স্বহস্তে গ্রহণ করতে গিয়ে কবি যে একেবারে 'উপহাসাস্পদ' হয়ে ওঠেন নি, নিম্নোদ্ধৃত কবিতাটি তার অন্যতম উদাহরণ—

> স্বর্গীয় অমৃত ইহা কে বলে গরল।
> সমুদ্রমন্থনে যাহা দেবতা সকল
> উঠাইলা যত্ন করি। পিতার আদেশ
> পালিবারে ;—হলাহল স্মরিয়া মহেশ
> মুহূর্তেকে পান করি আহ্লাদ অন্তরে।
> দেখুন আমার কার্য দেবতানিকরে॥
> পরিণয় কালে নারী বসন ভূষণে
> স্ব-সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। বিবিধ রঞ্জনে
> রঞ্জে সুকোমল তনু। আমিও তেমন
> পরিয়াছি চেল বস্ত্র স্বর্ণ রতন
> সাধিতে পিতার আজ্ঞা। দেশের মঙ্গল
> হয় যদি আমা হতে-জীবন সফল॥

'কবিতাগুলি হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।'—১২৭৪, ৬ই ফাল্গুন, সোমপ্রকাশ।

'কবিতামালা কবিতালহরী অপেক্ষা অধিকতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়াছে।'—১২৭৪, পৌষ, ১ম খণ্ড, ১১ সংখ্যা, অবোধবন্ধু।

'ইহার অধিকাংশই সরল, সুমিষ্ট, এবং গাঢ় ভাব সমন্বিত।'—১২৭৪, মাঘ, দ্বিতীয় ভাগ, ১০ম সংখ্যা, নানা প্রবন্ধ।

বিসর্জি পরাণ করি সর্পবিষপান।
মৃত্যু অন্তে যেন ঈশ স্বর্গে পাই স্থান॥

—বিষপূর্ণ পাত্র হস্তে কৃষ্ণকুমারী॥

২.

সনেটে মধুসূদনের অনুকরণের দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছে ১২৮০ সালে[১] প্রকাশিত রাধানাথ রায়ের 'কবিতাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড)'। গ্রন্থটিতে ৪৪টি চতুর্দশপদী আছে। প্রকাশকের নিবেদনে প্রকাশ, কবি ছিলেন উৎকলবাসী। মধুসূদনের সনেট সেকালে কতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল, উৎকলবাসী কবির এই কাব্য-সংগ্রহে তার প্রমাণ মেলে। 'কবিতাবলীর' বিষয়-সূচী হচ্ছে এই—ঈশ্বর-স্তোত্র; নগোৎসঙ্গে হ্রদ; মহাশ্বেতা; সাবিত্রী; মন্মথ; তিলোত্তমা; গিরি-নির্ঝরিণী; নিবাত-কবচ-যুদ্ধে; শ্রেণীবদ্ধ তারাত্রয়; রতি; দময়ন্তী; কোন ঐশ্বর্যশালীর প্রতি; ব্রাহ্মণী-তীর; যুবক; আশা; মাধব; তৃণাবৃত-চন্দ্রমল্লিকা; কপালকুণ্ডলা; কমলিনী; স্বীয় বনিতার প্রতি বিদেশীর প্রত্যুত্তর; অশোক; শরৎ; শচী; পাতকী; শীতকাল; রোশিনারা; ঘরচুকী (বিহঙ্গবিশেষ); প্রতারিত প্রেমিক; নব প্রণয়ী; কৃষ্ণক-শিশু; চন্দ্রের পাশে তারা; কুমুদ্বতী; সতী; কোন বিদেশীয় বন্ধুর প্রতি; শোণিতা নদী; হিংসা; দুর্জন; ক্রোধ; বিজ্ঞান; দাশরথি; চন্দ্রোদয়ে কুররীর রব শ্রবণে; দণ্ডকারণ্য; সায়ংকাল; নব-কপাল। কবির কাব্যগ্রন্থখানির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—(১) বিষয়-বৈচিত্র্য; (২) চতুর্দশমাত্রিক অক্ষরবৃত্ত ছন্দ; (৩) মিলে দুই ও তিন মাত্রার শব্দের প্রচুর ব্যবহার; (৪) প্রধানতঃ স্বরান্ত অক্ষরের দ্বারা মিল-রচনার চেষ্টা; (৫) স্থানবিশেষে প্রবহমান ছন্দের প্রয়োগ; (৬) কিছু সনেট-পরম্পরা রচনা। এই সব ক্ষেত্রে রাধানাথ যে মধুসূদন ও রামদাসের চতুর্দশপদীর ধারাই অব্যাহত রেখেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

১. কবিতাবলী (২য় খণ্ড), শ্রীরাধানাথ রায় প্রণীত ও শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত। ১২৮০। ১২৭৯ সালের ২০শে আষাঢ়ের তারিখসম্বলিত প্রকাশকের 'নিবেদনে' বলা হয়েছে—'গ্রন্থকার প্রায় ৪।৫ বৎসর পূর্বে এই পুস্তকের অধিকাংশ লিখিয়া বসিয়াছিলেন।' এই বিজ্ঞপ্তী অনুযায়ী গ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতা ১২৭৪।৭৫ সালে লিখিত।

তবে এদিক থেকে ভিন্নপ্রদেশবাসী কবি রাধানাথের কৃতিত্ব রামদাসের চেয়ে বেশী। রামদাস সর্বত্রই মিত্রাক্ষর দ্বিপদীর দ্বারা চতুর্দশপদী রচনা করেছেন। কিন্তু রাধানাথ মধুসূদনের অনুসরণে চতুর্দশপদীগুলিতে একান্তর ও দূরান্তরিত মিল-যোজনার সাধু প্রয়াস দেখিয়েছেন। এবং সেদিক থেকে তিনি যে তাঁর কবিতাগুলিকে অনেক বেশী পরিমাণে সনেট-লক্ষণে ভূষিত করতে পেরেছেন, একথা স্বীকার করতেই হবে। তবে তাঁর চতুর্দশপদীতেও আবর্তন সন্ধির অভাব এবং অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগের অনুপস্থিতি চোখে পড়ে। তাছাড়া অষ্টকে দুটি এবং ষট্‌কে দুটি বা তিনটি মিল-যোজনায় কবি অসমর্থ হয়েছেন এবং অনেক চতুষ্ক ও অষ্টকের শেষে ভাবযতি প্রয়োগ করেন নি। আর তারই ফলে তাঁর চতুর্দশপদী-গুলি খাঁটি পেত্রার্কীয় রূপধর্ম লাভ না করে একটানা ভাবের প্রবাহে মিল্টনীয় সনেটের মতো হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ দিচ্ছি—

দিনান্তে যখন আমি বসি শিলাতলে	ক
নিভৃতে, চিন্তায় রত থাকি এ বিজনে,	খ
কে তুমি জুড়াও কর্ণ মৃদু কলকলে?	ক
রম আঁখি চারু রূপে? গিরি আরোহণে	খ
হীরক-সোপান-শ্রেণী তুমি কি বিমলে?	ক
অথবা মুকুতামালা বসুন্ধরা স্তনে?	খ
নির্মলা বিভুর দয়া। শ্যামল অম্বরে	গ
পয়োরাশি রূপে কি লো উর বরাঙ্গনে	খ
এ ভবে, ধুইয়ে পথে নক্ষত্র-নিকরে,	গ
মলিনি তাদের আভা ধবল কিরণে?	খ
তাই কি নগেন্দ্র সাধে ধরেন মস্তকে	চ
তোমায়? এরূপ যদি লো সুরযুবতি!	ছ
উরি ধরাধামে, (তোমা প্রণমি পুলকে)	চ
নাশ গো কলুষ-রাশি, এ মম মিনতি।	ছ

—গিরি-নির্ঝরিণী।

লক্ষণীয়, সবশুদ্ধ কবিতাটিতে পেত্রার্কীয় সনেটসুলভ ৫টি মিল আছে; তবে সেই ৫টি মিলের প্রয়োগ রীতিসম্মত নয়। প্রথম আট ছত্রে 'ক, খ' মিলের সঙ্গে 'গ' মিলের ব্যবহার সঙ্গত হয় নি, কারণ অষ্টকে ২টি মিল থাকাই বাঞ্ছনীয়। শেষ ছয় ছত্রে অষ্টকের অন্তর্গত 'খ' মিলের পুনরাবর্তনও অভিপ্রেত নয়

প্রথম চতুষ্ক ও অষ্টকের পরে কোনো প্রকারের ছেদ-চিহ্ন নেই; তাতে একদিকে যেমন চতুষ্ক দুটি স্বতন্ত্র মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয় নি, তেমনি অন্যদিকে আবর্তন-সন্ধির অভাবে কবিতাটি মিণ্টনের সনেটের মতোই 'verse paragraph' হয়ে উঠেছে। রাধানাথের এই কবিতায় প্রবহমান ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়, নবম ও দ্বাদশ ছত্রে তিন মাত্রার পর, চতুর্থ ও সপ্তম ছত্রে আট মাত্রার পর উপচ্ছেদ বা পূর্ণচ্ছেদের প্রয়োগ স্বভাবতঃই মধুসূদনের অনুসৃত মিণ্টনীয় ছন্দ-পদ্ধতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যান্য কয়েকটি কবিতার মিলের পদ্ধতি, চতুষ্ক ও অষ্টক গঠন এইরূপ—

ঈশ্বর-স্তোত্র

প্রথম চতুষ্ক: সবে-স্বরে-অম্বরে-পল্লবে (কখখক; চতুষ্ক-শেষে ছেদ-চিহ্ন নেই)

দ্বিতীয় চতুষ্ক: গীতে-মিলনে-আলিঙ্গিতে-স্বননে (গঘগঘ; নেই)

ষট্ক: কল্লোলিনি-কলরবে-কাদম্বিনি-নীলার্ণবে-কামিনী-নীরবে (চক চক চক)

এখানে মিলের ক্ষেত্রে খুবই অনাচার লক্ষ্য করা যায়। প্রথম চতুষ্কের মিলের পুনরাবর্তন দ্বিতীয় চতুষ্কে হয় নি। ষট্কেও অষ্টকের 'ক' মিলের ব্যবহার একেবারেই নিয়ম-বিরুদ্ধ। প্রথম ও দ্বিতীয় চতুষ্কের শেষে কোনোরূপ ছেদ-চিহ্ন নেই, কিন্তু দশম চরণের শেষে পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হয়েছে।

মহাশ্বেতা

প্রথম চতুষ্ক: কাননে-কমলে-স্কলে-জীবনে, (কখখক)

দ্বিতীয় চতুষ্ক: তীরে-গভীরে-পবনে- করে, (গগখগ)

ষট্ক: যুবতী-যেমতি; (চচ, দ্বিপদী)

তরে-স্বনে-শ্রবণে-ঝরে (গককগ)

মোট ৪টি মিল আছে (তীরে ও করে জাতীয় শব্দ একই মিলের অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে) এবং তাদের প্রয়োগও বিশৃঙ্খল।

প্রথম চতুষ্ক: উপবনে-ছলে-সঘনে-কমলে। (কখকখ)

দ্বিতীয় চতুষ্ক: দরপণে-কলকলে-স্থলে-ধ্বনিছে, (কখখচ)

ষট্ক: শিঞ্জিতে-কুন্তলে-শ্রবণে-শিহরি-বিভাবরি-স্বপনে (চখকছছক)

এখানে সর্বশুদ্ধ ৪টি মিল আছে এবং অষ্টকে ও ষট্কে তাদের ব্যবহার যথেচ্ছ।

সুতরাং এই সিদ্ধান্ত করা অন্যায় হবে না যে, রাধানাথ তাঁর চতুর্দশপদীতে রামদাসের মতো দ্বিপদীর অন্ত্যমিল ব্যবহার করেন নি বটে, তবে মিলের ক্ষেত্রে তিনিও যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করেছেন এবং কোনো নির্দিষ্ট ছক অনুসরণ করতে চান নি।

সায়ংকাল, দাশরথি, ক্রোধ, চন্দ্রের পাশে তারা, প্রতারিত প্রেমিক, ঘরঢুকী, কমলিনী, কপালকুণ্ডলা, রতি ইত্যাদি কবিতার শেষে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী চোখে পড়ে। কিন্তু সেক্সপীরীয় সনেটের পয়ারপুচ্ছের মধ্যে যে epigrammatic গঠনভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়, তা এই কবিতাগুলির মধ্যে অনুপস্থিত। উদাহরণ স্বরূপ কপালকুণ্ডলা শীর্ষক কবিতাটির অন্ত্যদ্বিপদীতে যে মিল ব্যবহৃত হয়েছে (নিরঞ্জন-জীবন মিলসূচক শব্দ), তা পূর্ববর্তীতে অনুরূপ মিলেরই অনুসরণ মাত্র (নবম ও দ্বাদশ চরণের শেষে যথাক্রমে কানন ও সুমন শব্দ দুটি লক্ষণীয়)। বস্তুতঃ সেক্সপীরীয় সনেট রচনায় রাধানাথ গুরু মধুসূদনের মতোই কোনো কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি।

ভাষা-বিন্যাসে রাধানাথ রামদাসেরই মতো মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন। তাঁর শব্দচয়ন ও প্রকাশভঙ্গির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য বিরল। গাও মধুস্বরে, আঁধারি অম্বরে, রসাল-পল্লবে, গভীর স্বননে, কাদম্বিনি, তারকা-কুন্তলে, এ হেন উজ্জ্বলনিধি, লভিল এ হেন রত্ন, মণিময় পীঠোপরি, গাইছে সুতানে, গুঞ্জরে সুকলে, শ্যামাঙ্গী শর্বরী, প্রফুল্ল নলিনী, মধুর ঝঙ্কারে, কর-পদ্ম ধরি, উগরি অনলরাশি, বরাঙ্গী রূপসী, লয়ে সখীদলে, সুচারুহাসিনী, অনঙ্গ-রঙ্গিনী, ললাটে সিন্দুর দিলা, ও কর-কমলে, মধুময় কালে, শশি-বিলাসিনী, কাল-ভুজঙ্গিনী রূপে, কুসুমদাম, রমে আঁখি, একাকী বিরলে বসি, সুকোমল-দল-পুঞ্জ, অলি-ব্রজ, ত্রিদশ-ঈশ্বরী, বামাকুলেশ্বরী, ফুল্ল-ফুলরাজি, শশাঙ্করঙ্গিনি, শুভে ইত্যাদি বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ নিঃসন্দেহে মধুসূদনের আদর্শে গঠিত।

রাধানাথের চতুর্দশপদী কবিতাগুলির কাব্যগুণ খুব প্রশংসনীয় না হলেও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। কয়েকটি কবিতায় তাঁর কবিমনের পরিচয় পাওয়া যায়। সায়ংকালের বর্ণনায় মধুসূদনের দৃষ্টি ছিল মুখ্যতঃ অস্তগামী সূর্যের রক্তিমাভার দিকে, তিনি স্বর্ণ-রত্নের সাহায্যে—ঐশ্বর্যের আড়ম্বরে সন্ধ্যার মূর্তিটিকে সাজাতে চেয়েছিলেন। তবে প্রসঙ্গতঃ অলঙ্কারবিলাসী অঙ্গনার কথাও উল্লেখ করেছেন। রাধানাথের 'সায়ংকাল' কবিতার প্রত্যক্ষ প্রেরণাস্থল

মধুসূদনের 'সায়ংকাল' কবিতা [২], সন্দেহ নেই, তবু রাধানাথ ঐশ্বর্যের বদলে নর-নারীর অন্তর-আকৃতির রঙে সন্ধ্যাকে রাঙিয়ে দিয়েছেন বলে তাঁর কবিতায় মানবীয় রস অধিকতর—

মন্দে অস্ত-ধরাধরে চলেন দিনেশ,
উৎসুক বনিতা এবে সৌধ বাতায়নে
নিরিখি মিহিরে ভাবে 'দিন হলো শেষ,
শশীসহ নিশি আনি মিলাবে রমণে।'
দেখ হে ভাবুকবর! প্রতীচী-পর্বতে
কনক-নীরদমালা কিবা মনোহর!
ক্রমে বিভাকর-বিভা হতেছে অন্তর
আঁধারি অম্বর দেশ; দীনমন হতে
আশা যথা; যবে সেই বিপদসাগরে
বিরহী হরষে হেরে নিজ প্রণয়িনী
—চিররুচি সরোজিনী হৃদ্-সরোবরে—
(ললিত চম্পকমালা সুরভি-কাঞ্চনে
মাখা যথা) ধীরে পাশে আইসে রঙ্গিণী;
কিন্তু হায়! লাজে পুন চপলা-যুবতী
অন্তর্ধান হয় যথা, এ লীলা তেমতি।

রাজকৃষ্ণ রায়ের 'বঙ্গভূষণ' ১২৭৯ সালের চৈত্রমাসে লক্ষ্ণৌ নগরে লিখিত ও ১২৮০ সালে প্রকাশিত হয়। কবির ঘোষণানুসারে, গ্রন্থখানি 'চতুর্দশপদী কবিতানুসারে রচিত।' পরিশিষ্টে তিনি আরও বলেছেন—'মৃত কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত মহাশয়ের বঙ্গভাষায় প্রথম সৃষ্টি চতুর্দশপদী কবিতার অনুকরণ করিয়া বঙ্গভূষণ রচনা করিলাম।' অতএব মধুসূদনের সনেটের অনুকরণে কবিতা রচনার যে ধারা রামদাস সেনের 'চতুর্দশপদী কবিতামালায়' শুরু হয়েছিল, রাজকৃষ্ণের 'বঙ্গভূষণ' সেই ধারারই অন্তর্গত।

২. তুলনীয়—'চেয়ে দেখ, চলিছেন মৃদে অস্তাচলে দিনেশ' (মধুসূদন) ও 'মন্দে অস্ত-ধরাধরে চলেন দিনেশ' (রাধানাথ)।

কবি গ্রন্থখানির পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বঙ্গদেশোদ্ভূত মৃত মহাত্মগণের সংক্ষিপ্ত গুণাবলী।' এতে যে ৬৩টি চতুর্দশপদী আছে, তার প্রত্যেকটি একজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে লিখিত। যথা—পণ্ডিতবর বিশ্বনাথ কবিরাজ; ভারতচন্দ্র রায়; ভিষগ্বর মাধব কর; ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত; ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত; রামগোপাল ঘোষ; জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন; মাইকেল মধুসূদন দত্ত; মহারাজ সতীশচন্দ্র রায়; মহাত্মা লালাবাবু; মদনমোহন তর্কালঙ্কার; বাসুদেব সার্বভৌম; কাশীরাম দাস; দাশরথি রায়; শ্রীচৈতন্যদেব; মুকুন্দরাম চক্রবর্তী; মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়; রাজা রামমোহন রায়; ভিষগ্বর বিজয় রক্ষিত; মতিলাল শীল; রামনিধি গুপ্ত; স্যার প্রসন্নকুমার ঠাকুর; জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন; ভিষগ্বর চক্রপাণি দত্ত; দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দী; শম্ভুনাথ পণ্ডিত; ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়; মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ; রাধাকান্ত দেব; গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য; গোপাল ভাঁড়; হরিশ্চন্দ্র মিত্র; ভরত মল্লিক; গোবিন্দরাম মিত্র; হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস; নিত্যানন্দ; কবিবর জয়দেব; গণিতশাস্ত্রবিৎ শুভঙ্কর দাস; চণ্ডিদাস; রাণী ভবানী; প্রতাপাদিত্য; বিদ্যাপতি; কালীপ্রসন্ন সিংহ; রামপ্রসাদ সেন; রামকমল সেন; রঘুনাথ শিরোমণি; দেশ-হিতৈষিণী দাড়িম্বা দেবী; মহারাজ আদিশূর; বল্লাল সেন; লক্ষ্মণ সেন; গৌরমোহন আঢ্য; তারাচাঁদ চক্রবর্তী; আবু রায়; বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার; দ্বারকানাথ ঠাকুর; ভৈরবনাথ সান্ন্যাল; কিশোরীচাঁদ মিত্র, দীনবন্ধু মিত্র; কাশীপ্রসাদ ঘোষ্; প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ; রামশঙ্কর ভট্টাচার্য ও শ্যামচাঁদ গোস্বামী।

লক্ষণীয় এই যে, রাজকৃষ্ণের কবিতাগুলির মধ্যে বিষয়-বৈচিত্র্য নেই। বহুবিষয়ক 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' কয়েকটি কবিতায় মধুসূদন যেমন স্বদেশ ও বিদেশের কয়েকজন বন্ধু, কবি ও পণ্ডিতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তেমনি রাজকৃষ্ণও ৬৩টি কবিতাতেই খ্যাতনামা পূর্বসূরীদের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে তাঁদের উদ্দেশে কবি-প্রণাম জানিয়েছেন। বিষয়বস্তুর দিক থেকে চতুর্দশপদীগুলিকে এইভাবে ব্যক্তিমহিমাবর্ণনের মধ্যে সীমায়িত করার ফলে তাদের রসসৃষ্টিও একঘেয়ে হয়ে পড়েছে।

শিল্পরীতির দিক দিয়ে রাজকৃষ্ণ মধুসূদনের আদর্শ কতকটা রক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। তিনি রামদাস সেনের মতো সাতটি মিত্রাক্ষর দ্বিপদীর দ্বারা সনেট রচনায় অগ্রসর হন নি। তাঁর চতুর্দশপদীগুলিতে মিলের বৈচিত্র্য আছে, তবে পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেটের মিলের ছক নির্দিষ্টভাবে অনু-

সরণ করার কোনো চেষ্টা করেন নি। ৬৩টি কবিতার মধ্যে ২৩টিতে পয়ারপুচ্ছ আছে। কিন্তু মিলের ক্ষেত্রে নানারকমের পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়।

(১) কবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত—কথকথ, গঘগঘ, **পফফপ**, চচ
(২) কবিবর দাশরথি রায়—কথকথ, গঘগঘ, **পফফপ** [১], চচ
(৩) ধার্মিকবর নিত্যানন্দ—কথকথ, **গঘঘগ**, **পখপখ**, চচ
(৪) গণিত-শাস্ত্রবিৎ শুভঙ্কর দাস—**কথথক**, গঘগঘ, পফপফ[২], চচ
(৫) বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ—**কথথক**, গঘগঘ, পফপফ, চচ
(৬) দেশ-হিতৈষিণী দাড়িম্বা দেবী—**ককথক**[৩], **গঘঘগ**, পঘপঘ, চচ
(৭) রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর—কথকথ, গঘগঘ, **পফফপ**, চচ
(৮) সঙ্গীতকেশরী রামশঙ্কর ভট্টাচার্য - কথকথ, **গখগখ**, পফপফ, চচ
(৯) কবিবর কৃত্তিবাস—কথকথ, **গখগখ**, পফপফ, চচ
(১০) অনারেবল্ শম্ভুনাথ পণ্ডিত—কথকথ, গঘগঘ, **পফফপ**, চচ
(১১) ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত—কথকথ, **গঘতঘ**, **পফফপ**, চচ
(১২) ধার্মিকবর শ্রীচৈতন্যদেব—কথকথ, **গঘঘগ**, পফপফ, চচ
(১৩) কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী—কথকথ, **গঘঘগ**, পফপফ, চচ
(১৪) রাজা রামমোহন রায়—কথকথ, **গঘঘগ**, পফপফ, চচ
(১৫) বাবু মতিলাল শীল—কথকথ, **গঘঘগ**, পফপফ, চচ
(১৬) অনরেবল্ স্যার প্রসন্নকুমার ঠাকুর—কথকথ, **গঘঘগ**, পফপফ, চচ
(১৭) পণ্ডিতবর জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন—কথকথ, **গঘঘত**, পফপফ, চচ
(১৮) পণ্ডিতবর গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য—কথকথ, **গগপক**, পফপফ, চচ
(১৯) রসিকরাজ গোপালভাঁড়—কথকথ, গঘগঘ, **পফফপ**, চচ
(২০) কবিবর হরিশচন্দ্র মিত্র—কথকথ, গঘগঘ, **পফপফ**, চচ
(২১) পণ্ডিতবর ভরত মল্লিক—**কথথক**, গঘগঘ, **পফফপ**, চচ
(২২) কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—**কথথক**, গঘগঘ, পফপফ, চচ
(২৩) বাবু ভৈরবনাথ সান্যাল—কথকথ, **গঘঘগ**, **পফফপ**, চচ

১. 'কবিবর' ও 'তোমার'-এ পৃথক মিল ধরা হয়েছে।

২ 'বাঙ্গালায়' ও 'নিশ্চয়'-এ পৃথক মিল ধরা হয়েছে।

৩. 'পরিকরে' ও 'রাব্বারে'-এ পৃথক মিল ধরা হয়েছে।

এখানে খাঁটি সেক্সপীরীয় মিল কখকখ, গঘগঘ, পফপফ, চচ একটিও নেই; কোনো-না-কোনো চতুষ্কে নির্দিষ্ট রীতির ব্যতিক্রম আছেই। তবে কতকগুলি সনেটে ৭টি মিল থাকলেও ৬টি মিলের দ্বারা সনেট রচনার চেষ্টা অনেক-ক্ষেত্রেই দেখা যায়। অবশ্য তাঁর মিলের সংখ্যা ৬-এর নিচে নামে নি এবং সেদিক থেকে তাঁর কৃতিত্ব মধুসূদনের চেয়ে অধিকতর। অন্য দিকে উপযুক্ত ছেদ-চিহ্ন ব্যবহৃত না হওয়ায় এবং এক চতুষ্কের ভাব অন্য চতুষ্কে প্রবাহিত হওয়ায় তাঁর কবিতার চতুষ্কগুলি সুস্পষ্ট রূপ লাভ করে নি। ফলে রাজকৃষ্ণের এই শ্রেণীর চতুর্দশপদীগুলির অধিকাংশকে শিথিল সেক্সপীরীয় এবং কয়েকটিকে ভঙ্গ সেক্সপীরীয় রীতির রচনা হিসেবে নির্দেশ করা যায়। তবে রাজকৃষ্ণ এমন দু'একটি কবিতাও লিখেছেন যেখানে নিয়মানুগত্য সুস্পষ্ট। যেমন—

কবিতা-কুসুম-বনে ভ্রম নিরন্তর ক
কবিতা-প্রসূনরাজি তুলিয়া যতনে খ
ছন্দোডোরে গাঁথিলে হে হার মনোহর, ক
পরিল বাঙ্গলা তাহা হরষিত মনে। খ
পড়িয়া ভাবুক হয় ভাবেতে মগন, গ
অতি সুমধুর ভাব তব কবিতায় ঘ
ঝরণার ধারা সম নিয়ত ক্ষরণ গ
হইয়া কবিতা তব শ্রবণ জুড়ায়। ঘ
যেমতি আছিলে কবি, তেমতি আবার প
সম্পাদকীয়তা করি সাধি দেশ-হিত ফ
রাখিলে অক্ষুণ্ণ নাম; যথা হিম-ধার প
হিমালয় গিরি-শিরে চির অবারিত। ফ
অকালে কালের গ্রাসে যদি না পশিতে, চ
তা হ'লে দেশের হিত আরো হে সাধিতে! চ

কবিবর হরিশ্চন্দ্র মিত্র।

এই কবিতাটি মিলের দিক থেকে নিখুঁত ('নিরন্তর' ও 'আবার'-এ নাম মাত্র পৃথক মিল আছে বলে মনে হতে পারে। কিন্তু স্মরণ রাখা কর্তব্য, এই ধরণের নামমাত্র পৃথক মিলের উদাহরণ মধুসূদনের সনেটেও আছে।) প্রতি চতুষ্কের শেষেই পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহৃত হওয়ায় চতুষ্ক-গঠনেও ত্রুটি নেই। তিনটি চতুষ্কের মধ্য দিয়ে ভাব পয়ারগুচ্ছের logical deduction-এর দিকে

সহজভাবেই এগিয়ে গেছে। বস্তুতঃ এটি সাংগঠনিক লক্ষণ ও অন্তরঙ্গ স্বভাবের দিক থেকে রাজকৃষ্ণের একটি উৎকৃষ্ট সনেট। সেক্সপীরীয় সনেট রচনায় এতটা নৈপুণ্যের পরিচয় মধুসূদনের সমশ্রেণীর সনেটগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না।

এই ২৩টি সেক্সপীরীয় ঢঙের রচনা বাদ দিলে আর যে ৪০টি সনেট কাব্য-গ্রন্থখানিতে আছে, সেগুলিকেও খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতির রচনা বলা যায় না। কয়েকটি কবিতার গঠন বিশ্লেষণ করছি—

(১) পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বনাথ কবিরাজ—কখকখগঘঘগকচকচকচ
(২) কবিবর ভারতচন্দ্র রায়—কখকখগগপফপফচছছচ
(৩) কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ককখগখগপফপফখচখচ
(৪) মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়—কখকখগঘঘগপপকচকচ
(৫) গানবিৎ রামনিধি গুপ্ত—কখকখগঘঘগচছচছচছ
(৬) পণ্ডিতবর মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ—কখকখগঘঘগচছচছচছ
(৭) হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়—কখকখগগপফপফচছচছ
(৮) মহারাজ লক্ষণ সেন—কখকখগঘঘগকচকচকচ
(৯) দ্বারকানাথ ঠাকুর—কখকখগঘঘগচছচছচছ
(১০) কাশীপ্রসাদ ঘোষ—কখকখগখখগচছচছচছ

আর উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। কখখক কখখক, চছজ চছজ চছচছচছ—এই খাঁটি পেত্রার্কীয় মিল একটি সনেটেও অনুসৃত হয় নি। মিলগুলি সর্বত্রই বিচিত্র ও বিশৃঙ্খল। তার চেয়েও বড় কথা, চার পাঁচটি মিলের সাহায্যে পেত্রার্কীয় সনেট রচনার যে নিয়ম মধুসূদন বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করেছেন, তা রাজকৃষ্ণ উপেক্ষা করেছেন। কয়েকটি ক্ষেত্রে পাঁচটি মিল আছে বটে (উপরের ১, ৮ ও ১০ নং কবিতা দ্রঃ), কিন্তু সে-ক্ষেত্রেও অনাচারের লক্ষণ সুস্পষ্ট। অষ্টকের একটি মিলকে ষট্‌কে টেনে নিয়ে গিয়ে তিনি মিলের সংখ্যা পাঁচের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পেরেছেন। পৃথকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, একটি ক্ষেত্রেও অষ্টকে দুটি মিল নেই এবং ষট্‌কেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিলের সংখ্যা দুই/তিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে চার/পাঁচ/ছয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাছাড়া কোনো কোনো কবিতায় মিত্রাক্ষর দ্বিপদী প্রথম বারো চরণের মধ্যে চোখে পড়ে (উপরের ২,৩, ৪ ও ৭ নং কবিতা দ্রঃ)। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, অন্ততঃ মিলের দিক থেকে

পেত্রার্কীয় সনেট রচনায় কোনো নিখুঁত পরিকল্পনা রাজকৃষ্ণের ছিল না। পেত্রার্কীয় সনেটের সৃষ্টি-সৌন্দর্য মূলতঃ যে আবর্তন-সন্ধির মধ্যে নিহিত, তাঁর সনেটে সেই গঠন-কৌশলটির কোনো সচেতন প্রয়োগ ঘটে নি। কবি বক্তব্যের একটানা প্রকাশের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন বলে অষ্টকের পর পূর্ণচ্ছেদের ব্যবহার খুবই কম এবং সে-ক্ষেত্রে আবর্তন-সন্ধি দেখাবার সুযোগও থাকে নি। যেখানে অষ্টক-শেষে পূর্ণচ্ছেদ আছে, সেখানেও ভাবের মোড় ফেরার লক্ষণ অস্পষ্ট।

স্বর্ণকার মনোহর গঠিয়া ভূষণ
(শিল্পতার পরিচয়) শরীর সাজায়
যেমতি, নিরখি তাহা জুড়ায় নয়ন,
হর্ষে স্বর্ণকার-গুণ সকলেই গায় ;
তেমতি, গো বিশ্বনাথ! এ বিশ্ব-মাঝারে
সংস্কৃত সাহিত্যের চারু অলঙ্কার—
অতুলিত—গঠি তুমি পূজ্য সবাকার,
বুধকুল নিরবধি ঘুষিছে তোমারে।
ধন্য তুমি, ধন্য তব বুদ্ধি অতুলন!
মূল্যহীন অলঙ্কার গৌড়জন করে
অরপিলে, মহাদাতা, সুখ্যাতি-ভাজন
নরকুল মাঝে তুমি! সুদীননিকরে
ভূপ যথা হেম-ভূষা করি বিতরণ,
অক্ষয় সুযশ সহ সসুখে বিহরে।

—বিশ্বনাথ কবিরাজ।

এখানে নবম চরণে ভাবের একটু পরিবর্তন হয়েছে, একথা আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হতে পারে। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, অষ্টকে যে চারু অলঙ্কারের কথা আছে ষট্‌কে হেম-ভূষা প্রসঙ্গে তারই জের টানা হয়েছে এবং ষট্‌কে কবির সুযশের কথায়ও আছে অষ্টকের 'বুধকুল নিরবধি ঘুষিছে তোমারে' চরণটির প্রতিধ্বনি মাত্র। সুতরাং এখানে অষ্টক শেষে আবর্তন-সন্ধির অস্তিত্বও দুর্নিরীক্ষ্য। সুতরাং আলোচ্য ৪০টি কবিতাকে সনেটের পেত্রার্কীয় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করার কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। আবর্তন-সন্ধির অভাব থাকায় এগুলিকে যেমন খাঁটি পেত্রার্কীয় রীতির রচনা বলা যায় না; তেমনি মিল-বিন্যাসে

চরম শৈথিল্য থাকায় এদের মিল্টনীয় সনেটও বলা যায় না। স্মরণ রাখা কর্তব্য, মিল্টন আবর্তন-সন্ধির আদর্শ বজায় না রাখলেও মিলের ক্ষেত্রে পেত্রার্কীয় আদর্শের কোনো পরিবর্তন ঘটান নি।

রাজকৃষ্ণের কবিতাগুলির ভাষা মধুসূদনের চতুর্দশপদীর ভাষা থেকে পৃথক্ নয়। গুরুর রচনার আদর্শ সামনে রেখে কবিতাগুলি লিখেছিলেন বলে তাদের ভাষায় মধুসূদনের প্রভাব স্বাভাবিকও বটে। তবে স্থানবিশেষে তিনি সহজ কথ্য ভাষার আশ্রয় অধিকতর পরিমাণে গ্রহণ করেছেন। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

(১) বাঙ্গালী করিত ঘৃণা এ নাম শুনিলে।
(২) এই যে এখন দেখি অসংখ্য ডাক্তার,
(৩) খনিজাত খাদ মাখা হীরা কে ফেলায়?
(৪) সময় পাইলে মারি কাড়ি লয় প্রাণ;
(৫) অনুবাদ করাইয়া তুমি সে ভারতে

ব্যক্তিমাহাত্ম্যসূচক এই কবিতাগুলিতে সাদৃশ্যমূল অলঙ্কারের—বিশেষ করে উপমা ও রূপকের—ব্যবহার প্রচুর পরিমাণে ঘটেছে। সেই সব অলঙ্কৃত বচন - বিন্যাসে মধুসূদনের প্রভাব সুস্পষ্ট এবং কবির স্বকীয়তার নিদর্শন প্রায় অনুপস্থিত।

রাজকৃষ্ণ বড় কবি ছিলেন না এবং মৌলিক সৃষ্টি-প্রতিভাও তাঁর ছিল না। সাহিত্যের নানা শাখায় তাঁর রচনার পরিমাণ প্রচুর হলেও স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল নয়। তবে তিনি ছিলেন সেকালের একজন পরিচিত পদ্য-লেখক এবং জনপ্রিয় নাট্যগীতি-রচয়িতা[৪] (তাঁর সৌভাগ্য এই যে, কিশোর রবীন্দ্রনাথ ১২৮৩ সালের কার্তিক সংখ্যা 'জ্ঞানাঙ্কুর' পত্রিকায় অন্য দুটি কাব্যের সঙ্গে রাজকৃষ্ণের 'অবসরসরোজিনীর' সমালোচনা করেন এবং সেই গ্রন্থ সমালোচনাটিই হচ্ছে কবিগুরু রচিত প্রথম ক্রিটিসিজম্ জাতীয় প্রবন্ধ)। সুতরাং রাজকৃষ্ণের 'বঙ্গভূষণেও' কবিত্বের তেমন স্ফুরণ প্রত্যাশা করা উচিত নয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মহিমা বর্ণনা অনেকটাই গতানুগতিক, কোনো ক্ষেত্রেই কবি তীক্ষাগ্র বচনের বিদ্যুৎ-ঝলকে ব্যক্তিত্বের অনুদ্‌ঘাটিত লোক উদ্ভাসিত করতে পারেন নি। তিনি কাব্যটির প্রারম্ভে মিল্টন থেকে দুটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন—

৪. রাজকৃষ্ণের রচিত 'হিরণ্ময়ী' ও 'কিরণ্ময়ী' উপন্যাস একদা পাঠকদের মনোরঞ্জন করেছিল।

(১) '—I will tell you now
What never yet was heare in tale or song,
Form old or mordern bard, in hall or bower'

(২) '—it pursues.
Things unattempted yet...theyme.'

কিন্তু সতর্ক বিচারে মনে হয়, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে কাব্যটির মধ্যে অভিনবত্ব কিছু নেই। তিনি এখানে মধুসূদনেরই এক সাধারণ উত্তরপুরুষ মাত্র।

মধুসূদনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে রামদাস সেন, রাধানাথ রায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ কবিরা চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন এবং তাঁদের সমবেত সাধনায় চতুর্দশপদী রচনার একটা ফ্যাসান বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয়েছিল। সেই ফ্যাসান এত ব্যাপক হয়েছিল যে, নবীনচন্দ্র সেনও তা এড়িয়ে যেতে পারেন নি। তাঁর 'অবকাশরঞ্জিনী' নামক খণ্ড কবিতা সংগ্রহে 'প্রতিকৃতি' শীর্ষক যে কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তাকে তিনি সনেট বলে নির্দেশ করেছেন। এর ভাষা, ছন্দ, মিল ও গঠনে মধুসূদনের সনেটের কোনো প্রভাব নেই এবং সেদিক থেকে তিনি রামদাস-রাধানাথ-রাজকৃষ্ণের দলভুক্ত নন, সন্দেহ নেই। তবে স্বীকার করতেই হবে, নিজস্ব ঢঙে হলেও তিনি যে অন্ততঃ একটি চতুর্দশপদী রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তার পেছনে ছিল সনেট রচনার সমকালীন ফ্যাসান।

পূর্ণচন্দ্র-নিভ	ফুল্লচন্দ্র মুখে,	৬+৬
মহিমার হাসি	ভাসিছে তায় ;	৬+৫
পতি-গরবেতে	গরবিত বুকে	৬+৬
গরব-তরঙ্গ	দেখিয়া যায়।	৬+৫
পূর্ণ কলেবর,	চিত্র পূর্ণতার,	৬+৬
পবিত্র মাধুরী	কোমলতাময় ;	৬+৬
পূর্ণ-সিন্ধু-জলে,	উচ্ছ্বাস আধার,	৬+৬
স্ফুটন্ত জ্যোৎস্না	হতেছে লয়।	৬+৫
পতি-ভালবাসা	অঙ্গে অঙ্গে মাখা,	৬+৬

পতি-ভালবাসা	হৃদয়ে ভ'রে ;	৬+৫
পতি-ভালবাসা	নাহি যায় রাখা,	৬+৬
হৃদয় ভরিয়া	উথলি পড়ে।	৬+৫
সোনার পুতুলে	অঙ্গ সুশোভন,	৬+৬
শিরে পতি শিব	চন্দ্রের মতন।	৬+৬

এই কবিতার ছন্দ-সঙ্গীত সনেটের ছন্দ-সঙ্গীত নয়। বারো ও এগারো মাত্রার চরণ সমাবেশে তিনি কবিতাটির যে রূপাবয়ব নির্মাণ করেছেন তাতে নবীন কবিতার কোনো লক্ষণ নেই। কবিতাটির শেষে পয়ারপুচ্ছ এবং অন্যত্র একান্তর মিল আছে বটে, তবু কবিতাটির গঠন সেক্সপীরীয় সনেটের অনুরূপ নয়। এ কবিতা স্বভাবতঃই প্রাচীন পদ বা ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার ঢঙে লেখা হয়েছে। বস্তুতঃ পক্ষে নবীনচন্দ্রের কবি-স্বভাব ও ভাবাবেগপ্রবণতা সনেট রচনার অনুকূল ছিল না। তিনি চেষ্টা করলে যে চোদ্দ চরণের কবিতা রচনা করতে পারতেন এবং চেষ্টা করলেও যে সনেট লিখতে পারতেন না, তার প্রমাণ হচ্ছে এই 'প্রতিকৃতি' কবিতাটি।

এই বিচার-বিশ্লেষণ থেকে বোঝা যাবে, রামদাস-রাধানাথ-রাজকৃষ্ণের অনুকরণের মধ্য দিয়ে মধুসূদনের প্রবর্তিত বাঙলা চতুর্দশপদীর ধারা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে গেছে। সঙ্গে সঙ্গে এটাও লক্ষণীয় যে, পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেট-আদর্শ অনুবর্তীদের রচনায় কোনো উজ্জ্বলতর প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি—বরং নিয়ম-শৈথিল্য ও সাংগঠনিক স্বেচ্ছাচারিতার ফলে, সনেটের যে রূপ ও রীতি মধুসূদন বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন তা এঁদের অনুকরণাত্মক রচনার মধ্যে পুরোপুরি আত্মরক্ষা করতে পারে নি। কবি হিসেবে এঁরা উচ্চ শ্রেণীর ছিলেন না বলে সনেট নামক গীতিকবিতার বিশিষ্ট প্রজাতিটির উৎকর্ষ বিধানে এঁরা সমর্থ হন নি। তবু ঐতিহাসিক বিচারে এঁরা দুদিক থেকে কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন—প্রথমতঃ এঁরাই মধুসূদনের চতুর্দশপদীর ধারাকে বাঙলা কাব্য থেকে নিশ্চিহ্ন হতে দেন নি ; দ্বিতীয়তঃ এঁদের অনুকরণের ফলে বাঙলা সনেটের আদর্শ মর্যাদা না পেলেও বাঙলা চতুর্দশপদীর আদর্শটি মর্যাদা পেয়েছে। তাই এই অনুকারকবৃন্দের সৃষ্টির কোনো সাহিত্যিক মূল্য না থাকলেও ঐতিহাসিক মূল্য আছেই।

৬ । সনেট-আদর্শের স্বীকৃতি : কয়েকজন কবি

আদি সনেট-রচয়িতার প্রাথমিক অসুবিধা সত্ত্বেও মধুসূদন সনেটের আদলটি ঠিক ধরতে পেরেছিলেন। পেত্রার্কা ছিলেন তাঁর আদর্শ। তবে তিনি সর্বত্র ইতালীয় কবির শিল্পরীতি অনুসরণ করতে চান নি, মিলের ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাধীনতা অবলম্বন করেছেন। সর্বত্র ভাবের আবর্তন-নিবর্তনের দিকে লক্ষ্য রেখে অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগও করা হয় নি। কিন্তু এই সব ব্যতিক্রম সত্ত্বেও মধুসূদনের সনেটের আকৃতি ও প্রকৃতি তাঁর কলাকীর্তির প্রোজ্জ্বল উদাহরণ। বাঙলা কাব্যে সনেটের সূত্রপাত ও প্রতিষ্ঠায় তাঁর এই কৃতিত্ব সত্ত্বেও সমসাময়িক অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত কবিরা সনেটের দিকে দৃষ্টিপাত করেন নি। হয়ত কবিত্ব-প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে সনেটের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ রূপ তাঁদের মনোহরণ করে নি। তবে নিরপেক্ষ বিচারে মনে হয়, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র[১] ও বিহারীলালের প্রতিভা চতুর্দশপদী রচনার উপযুক্ত ছিল না। অনিয়ন্ত্রিত ভাবাবেগ, অত্যুৎসাহী বক্তৃতা ও অফুরন্ত বর্ণনার সাহায্যে সনেটের সংযম-দীপ্ত ও ভাব-গম্ভীর রূপমূর্তি নির্মাণ করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব ছিল। তবে মধুসূদনের সমসাময়িক প্রখ্যাত কবিদের দৃষ্টি সনেটের দিকে না পড়লেও রামদাস সেন, রাধানাথ রায়, রাজকৃষ্ণ রায় প্রমুখ কয়েকজন গৌণকবি চতুর্দশপদী রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। এঁদের কোনো মৌলিক উদ্ভাবনী শক্তি ছিল না, কোনো জটিল রূপবন্ধের আশ্রয়ে বিশেষ কাব্য-সৌন্দর্য সৃষ্টিও তাঁদের সাধ্যের অতীত ছিল। তাই এই স্বল্পবিত্ত কবির দল যখন মধুসূদনের অনুকরণে সনেট রচনায় আত্মনিয়োগ করলেন, তখন পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেটের রচনা-কৌশল সাধ্যায়ত্ত না হওয়ায় তাঁরা পয়ার-মিল বা বিশৃঙ্খল মিলের কতকগুলি চতুর্দশপদী মাত্র রচনা করলেন। যথার্থ সনেট রচনায় তাঁদের এই অসামর্থ্য সত্ত্বেও বাঙলা সনেট-চর্চার ইতিহাসে তাঁদের কবিকর্মের একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

১. একটি সনেট রচনায় যে ব্যর্থ প্রয়াস নবীনচন্দ্র করেছিলেন, তার কথা পূর্বের অধ্যায়ে আলোচনা করেছি।

এই পটভূমিকায়[২] বাংলা সনেটের পরবর্তী ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করতে হবে। মধুসূদনের অনুবর্তী ও রবীন্দ্রনাথের সমকালীন কবিদের মধ্যে সনেটকার হিসেবে দেবেন্দ্রনাথ সেন (১৮৫৫-১৯২০) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি সারাজীবন ধরে অজস্র কবিতা লিখেছেন, কিন্তু তাঁর কবিত্ব-সম্পদ্ ও শিল্প-নৈপুণ্য উজ্জ্বলভাবে প্রকাশ পেয়েছে সনেটের মধ্যে। অস্বীকার করার উপায় নেই, সনেট তাঁর প্রতিভার স্ব-ক্ষেত্র। এই বিশেষ শ্রেণীর কবিতা রচনায় তাঁর কৃতিত্বের রহস্য লুকিয়ে আছে তাঁর কবিকর্মের মধ্যে। রবীন্দ্র-নাথের মতো সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা, আত্মভাব-প্রাধান্য ও অসামান্য কল্পনাপ্রবণতা দেবেন্দ্রনাথের না থাকলেও তিনি হৃদয়ের আবেগ, যৌবনের মায়ামোহ ও গার্হস্থ্য প্রেমের সরল উচ্ছ্বাসেই কাব্য রচনা করতেন—তাঁর কবিসত্তায় প্রবল ছিল লিরিক অনুপ্রাণনা। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথের ছিল বস্তুনির্ভর রূপদৃষ্টি, ইন্দ্রিয়নির্ভরতা ও গৃহগত জীবন-ভাবনা। যেহেতু তাঁর হৃদয়াবেগ বস্তুনিরপেক্ষ ও অতীন্দ্রিয় ছিল না, সেই জন্য তাঁর কবিত্বও ভাবোন্মত্ততায় একেবারে বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে নি, আকারহীন ফেনোচ্ছ্বাস মাত্র হয়ে ওঠে নি। তার চেয়েও বড় কথা, ঘরোয়া প্রেম ও প্রকৃতির বর্ণনায় অসংযমের যেটুকু সম্ভাবনা ছিল তাও পরিহার করার জন্য তিনি স্বেচ্ছায় সনেটের সংহত ও সুনির্দিষ্ট বন্ধন মেনে নিয়েছিলেন। সনেটের বহিরঙ্গ শাসন তাঁর কবি-স্বভাবের আবেগপ্রবণতাকে আটকে রাখার ফলে তাঁর কবিতাগুলিও অনেকটা পরিমাণে দৃঢ়পিনদ্ধ হয়ে উঠেছে।

দেবেন্দ্রনাথের কোনো ক্লাসিকধর্মী মানস-চেতনা ছিল না। তাঁর রোমান্টিক কবি-প্রকৃতি ও লিরিক্যাল ভাবকল্পনায় কোন স্বাভাবিক সংহতি ও সংযমধর্ম এবং ক্লাসিকক্যাল ঝোঁক কখনও দেখা যায় নি। শুধু তাই নয়, 'জন্ম-রোমান্টিক' রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর 'কবি-ভ্রাতা' দেবেন্দ্রনাথের মর্মবন্ধনও অনস্বীকার্য সত্য। 'তিনি রবীন্দ্রবাবুর সনেট' ও 'ইলা'[৩] শীর্ষক দুটি সনেট লিখে রবীন্দ্র-প্রভাবের দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। 'গোলাপগুচ্ছের' একটি সনেটের ('সোনার শিকল') পাদটীকায় তিনি মন্তব্য করেছেন—'বলা বাহুল্য, আমার এ সনেটটি রবিবাবুর "সোনার বাঁধন" কবিতার অনুসরণে লিখিত।

২. এ-সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা পূর্ববর্তী দুটি অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

৩. রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' নাটকের ইলা-চরিত্র অবলম্বনে রচিত।

প্রভেদ এই যে, তাঁহার খাঁটি সোনা আর আমার chemical gold...'.[৪] এমনি অবস্থায় দেবেন্দ্রনাথের মানসে রোমান্টিক-চেতনার সুস্পষ্ট স্ফুরণ হয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষণীয় এই যে মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের মহাকাব্যিক চন্দ্রাতপের তলায় দেবেন্দ্রনাথের আবির্ভাব, মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' স্বচ্ছ হ্রদে তাঁর অবগাহন। তিনি নিজেকে 'মাইকেল মধুসূদন, হেমচন্দ্রের স্কুলের কবি'[৫] বলে মনে করতেন। তাঁর কাব্যধারার আদিপর্বে উপমা-উৎপ্রেক্ষায়, নামধাতুর প্রয়োগে, শব্দসজ্জায় ও অমিত্রাক্ষর চরণ-বিন্যাসে মধুসূদনের প্রভাব ছিল সুস্পষ্ট।[৬] কোনো কোনো কবিতার মিল-যোজনায় ('ফুটেছে-ধরেছে'), চরণ ও স্তবক বিন্যাসে এবং ভাষাভঙ্গিতে হেমচন্দ্রের প্রভাবও চোখে পড়ে।[৭] দেবেন্দ্রনাথের রোমান্টিক ভাবুকতার সঙ্গে এই ক্লাসিক রচনারীতির যোগাযোগেরই উত্তম ফল হচ্ছে তাঁর সনেট।

৪. 'অপূর্ব নৈবেদ্য'-এর অন্তর্গত 'কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রতি' কবিতায় দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন—এ মোহিনী বীণা কোথায় পাইলে?
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে প্রাণ কেড়ে নিলে!
হেন স্বর্ণবীণা নাহি রে নিখিলে,—
সুধা-ভরা, সুধা-হরা।

৫. দ্রঃ কৃষ্ণবিহারী গুপ্ত, সঙ্কল্প, অগ্রহায়ণ, ১৩২১।

৬. নিম্নোদ্ধৃত অংশটি লক্ষণীয়—
সাদরে চিবুক মোর ধরি বীরবর
অধরে চুম্বিলা দেবী, হায় সে চুম্বনে—
নিচল যমুনা জলে চন্দ্রকর লেখা
পড়ে গো নিঃশব্দে যথা, অথবা যেমতি
ঊষার মুকুট শোভা কুসুমের শিরে
নিশির শিশির পাত; নীরব মৃদুল। —ঊর্মিলা-কাব্য।

৭. স্মরণীয়— বাস করে থাকে কীট পার্থিব কুসুমে রে,
থাকে গুপ্ত বিষধর অগুরু চন্দনে রে,
যুবতী যৌবন হায়, তটিনী বুদ্বুদ প্রায়,
চকিতে মিলায়ে যায়; ভুল না রে ভুল না,
কারে ভালবেস না রে বেস না।
—ভালবেস না, নির্ঝরিণী।

তৃতীয়তঃ মনে রাখতে হবে, দেবেন্দ্রনাথ শুধু মধুসূদন, রামদাস, রাজকৃষ্ণ প্রমুখের সনেট বা চতুর্দশপদীর সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না, তিনি পরিচিত ছিলেন পাশ্চাত্ত্য সনেটের সঙ্গেও। তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের এম. এ. এবং ইংরেজী ভাষায় সনেট-লেখক। পাশ্চাত্ত্য সনেটের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সময় তিনি নিশ্চয়ই তার অন্তর্নিহিত সংহতি ও সংযমধর্ম এবং নিয়মানুগত গঠনভঙ্গিমা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলেন। ফলে দেবেন্দ্রনাথ নিজের রোমান্টিক ভাবকল্পনাকে সংযত ও সংহত করে সনেটের সুনির্দিষ্ট রূপবন্ধের মধ্যে তাকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করেছিলেন। অর্থাৎ ক্লাসিক-চেতনা দেবেন্দ্রনাথের সর্বকালীন মনোধর্ম না হলেও সনেটের ক্ষেত্রে তা সৃজন-মুহূর্তের চিত্তসম্পদ্ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

উপরি-উক্ত তিনটি কারণে ভাবাবেগসম্পন্ন রোমান্টিক কবি হওয়া সত্ত্বেও দেবেন্দ্রনাথ সনেট-চর্চায় সাফল্য লাভ করেছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলেই রামদাস-প্রদর্শিত পদ্ধতি অনুসরণ করে সাতটি যুগ্মক বা মিত্রাক্ষর দ্বিপদীর সাহায্যে চতুর্দশপদী রচনা করতে পারতেন কিংবা রাধানাথ-রাজকৃষ্ণের মতো বিশৃঙ্খল মিলের সাহায্যে অধিকতর স্বাধীন চোদ্দচরণের কবিতা লেখায় আত্মনিয়োগ করতে পারতেন। এবং সে-ক্ষেত্রে তাঁর কবিতাগুলি হয়ে উঠত তাঁর কবিস্বভাবের সঙ্গে আরও সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ পূর্বসূরীদের চতুর্দশপদীর সহজ পন্থায় গেলেন না, তিনি সনেট রচনার প্রতিভাসাধ্য কাজই বেছে নিলেন। সেদিক থেকে তিনি মধুসূদনের যোগ্য উত্তরসূরী এবং খাঁটি সনেট-আদর্শ বাঙলা কাব্যে ফিরিয়ে আনার কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য।

তবে দেবেন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন, তিন প্রকারের সনেটের মধ্যে সেক্সপীরীয় বা রোমান্টিক সনেট লেখা সবচেয়ে সহজ। কারণ, চার/পাঁচ মিলের দ্বারা এবং অষ্টক-ষট্কের dialectical গঠনভঙ্গি অক্ষুণ্ণ রেখে পেত্রার্কীয় সনেট রচনা খুবই কষ্টকর ও যত্নসাধ্য কাজ। অবশ্য নবম ও দশম চরণে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী থাকে বলে পেত্রার্কীয় সনেটের চেয়ে ফরাসী সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ।[৮] তবে অন্তরঙ্গ স্বরূপ ও বহিরঙ্গ রূপের দিক থেকে সাত মিলের

৮. প্রমথ চৌধুরী বলেছেন—'সনেটের technique বড় কঠিন অন্ততঃ আমার পক্ষে। ফরাসী সনেট গড়া অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই আমি ঐ form-টাই নিই। ওরই মধ্যে একটু সহজ বলে।'—গ্রন্থপরিচয়, সনেট পঞ্চাশৎ ও অন্যান্য কবিতা (১৮৮৩ শকাব্দ), পৃঃ ১৫৫।

সেক্সপীরীয় সনেট নিঃসন্দেহে সনেটগোষ্ঠীর মধ্যে সবচেয়ে স্বাধীন ও সহজ কবিকর্ম। নিজের ভাবাবেগপ্রবণতা ও কাব্যস্থাপত্যকর্মে অপটুতা বা অমনোযোগের কথা স্মরণ রেখেই দেবেন্দ্রনাথ বোধ হয় সেক্সপীরীয় সনেট রচনায় অধিকতর আগ্রহ দেখিয়েছেন। কিছু মিশ্ররীতির সনেটও তিনি লিখেছেন বটে, তবে তাঁর সেক্সপীরীয় রীতির সনেটগুলিই সংখ্যায় ও সার্থকতায় সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য। তাঁর নারীপ্রেম ও প্রকৃতি-প্রিয়তাও সেক্সপীরীয় সনেট-চর্চার পক্ষে অনুকূল হয়েছিল। এই সেক্সপীরীয় রূপকলা প্রতিষ্ঠায় তাঁর ভূমিকার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অবশ্যই স্বীকার্য, কারণ (আমরা পূর্বে দেখেছি), তাঁর পূর্বসূরীরা, এমন কি মধুসূদনও, এই বিশেষ কাব্যবন্ধটি অনেকটা উপেক্ষা করেছেন।

এবার দেবেন্দ্রনাথের রচিত সনেট বিশ্লেষণ করে উপরি-উক্ত মতগুলির যাথার্থ্য বিচার করা যেতে পারে। উনিশ শতকে তিনি যে সমস্ত সনেট লিখেছেন তার মধ্যে অনেকগুলি 'অশোকগুচ্ছ' (১৩০৭) কাব্যে সঙ্কলিত হয়।[৯] এই সময়ের মধ্যে তিনি আরও কিছু সনেট লিখেছিলেন—যা 'অশোকগুচ্ছে'র[১০] প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হয় নি—তাও বর্তমান অলোচনার বিষয়ীভূত।

৯. শ্রীপ্রকাশচন্দ্র দত্ত প্রকাশিত। পৃঃ ১৪৪। প্রকাশকের নিবেদনে বলা হয়েছে—'...যাঁহার অব্যর্থ তুলিকার স্পর্শে, আটপৌরে শাড়ী, কলা-পাতা, পানের বাটা, কৌটার সিন্দুর, চাবির গোছা, আলতার গুটী এবং চোটা গুড় প্রভৃতি অকিঞ্চিৎকর উপাদান সাহায্যে বঙ্গ-বধূ বিচিত্র বর্ণে, বঙ্গ-বিধবা অপূর্ব মহিমায় এবং বঙ্গ-শিশু আদিম নগ্ন-সৌন্দর্যে অতি সহজেই ফুটিয়া উঠিয়াছে—তাহার আর নূতন করিয়া কি পরিচয় দিব।'

১০. নারী-মঙ্গল (সনেট-পরম্পরা) —১৭, ভুল—১, দুটি কথা—১, প্রিয়তমার প্রতি—১, মা—১, রাণীর চুমো—১, লক্ষ্মৌর আতা—১, দ্রৌপদী —১, সদ্যঃস্নাতা—১, অদ্ভুত শাস্তি—১, সধবা—১, সাবিত্রী—১, উৎসর্গ (১,২)—২, অশোক-তরু—১। মোট—৩১। প্রথম সংস্করণ 'অশোকগুচ্ছ' থেকে এই হিসেব দেওয়া হল।

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	দ্বিপদী ও চতুষ্ক-গঠন	মিলের সংখ্যা
নারী-মঙ্গল—১.	কথকথ গঘগঘ পফপফ চচ	নিখুঁত	৭
২	কথকথ **কখকখ** পফপফ চচ	প্রথমে ত্রুটি	৫
৩.	**কখখক কগকগ পফফপ** চচ	দ্বিতীয়ে ত্রুটি	৬
৪.	কথকথ গঘগঘ পফপফ চচ	নিখুঁত	৭
৫.	কথকথ **কখখক** **পপপপ** চচ	”	৪
৬.	কথকথ **কখখক খপখপ** চচ	প্রথমে ত্রুটি	৪
৭.	**কখখক** গঘগঘ পফপফ চচ	নিখুঁত	৭
৮.	কথকথ **গঘঘগ পপপপ পপ**	”	৫
৯.	**কখখক গঘঘগ** পফপফ চচ	”	৭
১০.	**কখখক খকখক পফফপ** চচ	তৃতীয়ে ও দ্বিপদীতে ত্রুটি	৫
১১.	**কখখক** গঘগঘ **কপপক** চচ	”	৬
১২.	**কখখক কগগক** পফপফ চচ	”	৬
১৩.	কথকথ গঘগঘ পফপফ চচ	নিখুঁত	৭
১৪.	**কখখক** গঘগঘ পফপফ চচ	তৃতীয়ে ত্রুটি	৭
১৫.	কথকথ **খগগখ** পফপফ চচ	প্রথমে ত্রুটি	৬
১৬.	**কখখক গঘঘগ পফফপ** চচ	তৃতীয়ে ও দ্বিপদীতে ত্রুটি	৬

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	দ্বিপদী ও চতুষ্ক-গঠন	মিলের সংখ্যা
১৭. ভুল	কথকথ কথকথ পফপফ কক	দ্বিতীয়ে ত্রুটি	৪
১৮. দুটি কথা	কথকথ গখগখ পপফফ চচ	নিখুঁত	৬
১৯. প্রিয়তমার প্রতি	কখখক কগগক পপফফ চচ	”	৬
২০. লক্ষ্মৌর আতা	কথকথ কথকথ পফপফ চচ	”	৫
২১. অশোক-তরু	কথকথ কগকগ পফপফ চচ	”	৬
২২. সদ্যঃ স্নাতা	কথকথ গঘগঘ পকপক চচ	”	৬
২৩. দ্রৌপদী	কথকথ গকগক পফফপ চচ	”	৬
২৪. যুবতীর হাসি[১১]	কথকথ খগগখ পফপফ চচ	”	৬
২৫. লাজ-ভাঙান[১১]	কথকথ গঘঘগ পফফপ চচ	”	৭
২৬. দীপ-হস্তে যুবতী[১১]	কখখক গঘগঘ ঘপঘপ চচ	”	৬
২৭. বঙ্গনারী[১২]	কথকথ খকখক পখপখ কক	প্রথমে ত্রুটি	৩

১১. সাহিত্য, ১২৯৯, ৩য় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত। এবং অশোকগুচ্ছের দ্বিতীয় সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত।
১২. ” ” ” চতুর্থ ” ” ” ।

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি	দ্বিপদী ও চতুষ্ক-গঠন	মিলের সংখ্যা
২৮. উমা-মঙ্গল (চিত্র ১)[১৩]	কখখক কগগক পফপফ চচ	তৃতীয়ে ও দ্বিপদীতে ত্রুটি	৬
২৯. উমা-মঙ্গল (চিত্র ২)[১৩]	কখকখ গকগক পফপফ চচ	নিখুঁত	৬
৩০. উমা-মঙ্গল (চিত্র ৩)[১৩]	কখখক গঘগঘ ঘখঘখ চচ	”	৫
৩১. মহীরাবণের পালা[১৪]	কখখক গঘগঘ ঘপপঘ চচ	”	৬
৩২. গীতিকাব্য[১৪]	কখখক গঘগঘ খপপখ চচ	”	৬
৩৩. অদ্ভুত শাস্তি[১৫]	কখকখ গঘগঘ পককপ চচ	”	৬
৩৪ অশোক ফুল[১৬]	কখকখ কখকখ পফফপ চচ	”	৫
৩৫. আমি[১৬]	কখখক কগগক পফফপ চচ	”	৬
৩৬ উচ্চহাসি[১৬]	কখখক গঘগঘ পফপফ চচ	”	৭
৩৭. গণিকা[১৬]	কখকখ খগগখ পফপফ চচ	”	৬
৩৮ রাক্ষসী[১৬]	কখকখ কখকখ পফফপ চচ	”	৫

১৩. সাহিত্য, ১২৯৯, ৩য় বর্ষ সপ্তম সংখ্যায় প্রথম প্রকাশিত।

১৪ ” ” ” নবম ” ” ” ।

১৫. ” ” ” ” ” ” ” । এবং অশোকগুচ্ছে প্রথম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত।

১৬. অশোকগুচ্ছের দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩১৯) অন্তর্ভুক্ত।

আটত্রিশটি সনেটের এই পরিচায়িকা থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়—(১) প্রত্যেকটি কবিতারই শেষে পয়ারপুচ্ছ আছে এবং সে-কারণে কবিতাগুলি সেক্সপীরীয় মণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত; (২) খাঁটি সেক্সপীরীয় সাতটি মিলের রীতি (কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ) অনুসৃত হয়েছে তিনটি মাত্র (১, ৪ ও ১৩ নম্বর) সনেটে; (৩) পুরোপুরি সেক্সপীরীয় নিয়মানুগ না হলেও সাতটি মিলের সাহায্যে সনেট রচনার চেষ্টা আছে ৫টি কবিতায়; (৪) ছয়টি মিলের সন্ধান পাওয়া যায় ১৯টি সনেটে; (৫) পাঁচ, চার ও তিনটি মিল আছে যথাক্রমে ৭, ৩ ও ১টি সনেটে; (৬) ১২টি সনেটের চতুষ্ক ও দ্বিপদী-গঠনে ত্রুটি থাকলেও ২৬টি সনেটে তা নিখুঁত।

অতএব যে ১১টি কবিতায় তিন, চার ও পাঁচ মিলের সমাবেশে সেক্সপীরীয় রীতির বিশেষ ব্যভিচার ঘটানো হয়েছে সেগুলিকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ২৭টি কবিতাকে মোটামুটিভাবে সেক্সপীরীয় সনেট হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। এই ২৭টি সনেটের মধ্যে অনেকগুলিতে মিলের ক্ষেত্রে কিছু কিছু স্বাধীনতা এবং কয়েকটিতে দ্বিপদী ও চতুষ্ক-গঠনে ত্রুটি থাকলেও সামগ্রিকভাবে সেক্সপীরীয় সনেটের চরিত্র এদের মধ্যে বজায় আছে বলে আমি মনে করি। যে ১১টি কবিতাকে বর্জন করা হল তাদের মধ্যে ৮, ১৭ ও ২৭ নম্বর কবিতা তিনটি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, কারণ এদের দ্বিপদীর মধ্যে পূর্ববর্তী কোনো না কোনো চতুষ্কের মিল পুনরাবৃত্ত হয়েছে। তাছাড়া 'নারীমঙ্গলের' অন্তর্গত ১৭ নং কবিতাটি (পূর্বের পরিচায়িকায় এটি দেখানো হয় নি) মিল ও গঠনের দিক থেকে অদ্ভুত। এতে সেক্সপীয়ীর পয়ারপুচ্ছ নেই, মিলের (কখখক গকগক কপপ-কপক) সংখ্যা চার হলেও কবিতাটির গঠন কোনো ক্রমেই পেত্রার্কীয় নয়। তাছাড়া দেবেন্দ্রনাথের যে সমস্ত সনেটে ৭ টির কম মিল আছে তাদের কতকগুলির মধ্যে প্রথম আট চরণে ৪টির জায়গায় দুটি মাত্র মিল দেখতে পাই এবং সে-সব ক্ষেত্রে পেত্রার্কীয় সনেটের অষ্টকের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়।

মিলের ক্ষেত্রে দেবেন্দ্রনাথ ভালমন্দ দুই ধরনের দৃষ্টান্তই রেখে গেছেন। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, সনেটের মিলগুলি সুস্পষ্টভাবে পৃথক হওয়া বাঞ্ছনীয়, অস্পষ্ট বা দুর্বল মিল তার পক্ষে ক্ষতিকারক। ক্রিয়াপদের মিল ('সেজেছিল-এনেছিল'[১৭]), অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণবর্ণের মিল ('সৌরভ-গৌরব' [১৮]), অস্পষ্ট পৃথক্ মিল ('ক্রূর-সুন্দরীর-বিধুর-রুচির' [১৯]), যুক্তব্যঞ্জনমূলক মিল

১৭. লাজ-ভাঙান ১৮. আমি ১৯. লক্ষ্ণৌর আতা

('চঞ্চল-অঞ্চল-কুন্তল-বিফল' [20]) ও দুর্বল মিল ('এই-সেই' [21]) যেমন তাঁর সনেটে আছে, তেমনি আছে সুন্দর ও সার্থক মিল। 'নারী-মঙ্গলের' অষ্টম সংখ্যক কবিতায় শেষ ছয়টি চরণে একটি মাত্র মিলের ব্যবহার খুবই অদ্ভুত।[22] ভাষার দিক থেকে খুব বেশী কৃতিত্ব দেবেন্দ্রনাথের প্রাপ্য নয়। সত্য বটে, প্রেম ও প্রকৃতির রোমান্টিক ভাবুকতার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি আবেগাত্মক ও মাধুর্যবাচক শব্দ অনেক ব্যবহার করেছেন, তবু ভাষায় পূর্বাপর সমতা রক্ষার চেষ্টা তাঁর ছিল না। তাই মধুর ও সাধু ভাষার পাশেই লঘুত্ববাচক ও গ্রাম্য শব্দ ব্যবহারে তিনি দ্বিধা করেন নি। যেমন 'ভুল' কবিতায় এক দিকে যেমন আছে 'নয়ন', 'শ্রীঅঙ্গে ঝলকে,' 'মহিময়ী বর্ষীয়সী নারী', 'নিশীথে উজ্জলরূপে', 'দিবসে, শর্বরী ঘোর' অন্য দিকে তেমনি আছে'এলোচুলে', 'চারিগাছি চুড়ি', 'ঝকমকে সিতি,' 'আটপৌরে শাড়ী'। কোথায়ও কোথায়ও ভাষার এই দুই রীতি খুব স্পষ্টভাবেই চোখে পড়ে। 'দুটি কথায়' কবি প্রথমে অলঙ্কৃত বর্ণনা দিলেন—

> কেহ বলে, পূর্ণশশী প্রিয়ার আনন ;—
> সুরভি সুবাস কোথা হিমাংশু-হিয়ায় ?
> কেহ বলে, প্রিয়ামুখ বিদ্যুৎ-বরণ ;—
> সুকুমার জ্যোৎস্না কোথা বিদ্যুৎ-বিভায় ?
> কেহ বলে, প্রিয়ামুখ ফুল্ল কমলিনী,
> ব্রীড়ার বিক্ষেপ হায়, কমলে কোথায় ?
> কেহ বলে উষাসম উজ্জল-বরণী ;—
> আলাপী চাহনি কোথা গোলাপী উষায় ?

তার পরেই তিনি 'সাদাসিদে' ভাষায় বলে উঠলেন—

> সাদাসিদে লোক আমি, উপমার ঘটা
> নাহি জানি ; নাহি জানি বর্ণনার ছটা !
> যদি কিছু থাকে মোর কবিত্ব-বড়াই,
> অবাক্—ও মুখ হেরে, সব ভুলে যাই !

২০. নারীমঙ্গল-৮. ২১ নারী-মঙ্গল-১১ ২২. 'হরিমঙ্গলের' অন্তর্গত 'হিরণ্যকশিপু-বধ' কবিতায় চোদ্দ চরণের মধ্যে বার চরণই ছয়টি দ্বিপদীর দ্বারা গঠিত।

তাঁর ভাষায় সরলতা ও শ্রুতি-সৌন্দর্য থাকা সত্ত্বেও রীতিগত এই অসমতার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অসংযম প্রকাশ পাওয়ায় তা কব্যোপযোগী হয় নি।

ছন্দের দিক থেকে লক্ষণীয় এই যে, দেবেন্দ্রনাথের সনেটে প্রবহমাণ ছন্দের প্রয়োগ থাকলেও তার- পরিমাণ অনেক কমে গেছে। মধুসূদনের মতো সর্বাত্মকভাবে প্রবহমাণ ছন্দ ব্যবহার না করায় তার সনেটের মিলধ্বনির আঘাত সুস্পষ্ট হওয়ার অবকাশ পেয়েছে[২৩]। ৮+৬ মাত্রার পর্ব-বিভাগে বিশেষ ত্রুটি না থাকায় চরণের ধ্বনিবিন্যাসও সঙ্গত হয়েছে[২৪]। এর চেয়েও বড় কথা, দেবেন্দ্রনাথই প্রথম মধুসূদনের চোদ্দ মাত্রার পয়ার-চরণকে আঠারো মাত্রার মহা-পয়ার-চরণে প্রসারিত করে সুন্দর সনেট রচনা করেছেন। পূর্বে মধুসূদন-প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখিয়েছি, সনেটের ধ্বনি-রূপের দিক থেকে চোদ্দমাত্রার পয়ার-ছন্দ খুবই উপযোগী; দেবেন্দ্রনাথ প্রমাণ করে দিলেন সেই চোদ্দমাত্রাকে আঠারো মাত্রায় প্রসারিত করলেও তার ধ্বনি-রূপ বিপর্যস্ত হয় না। পরবর্তী কোনো কোনো কবি এই আঠারো মাত্রার চরণে সনেট রচনা করে এই বিশেষ রূপবন্ধে ছন্দটির সার্থকতা আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন। সুতরাং সেদিক থেকে দেবেন্দ্রনাথের এই 'ছন্দ-অষ্টাদশীর' যে একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

দেবেন্দ্রনাথের সনেটের প্রকাশরীতির আর একটি বৈশিষ্ট্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। পাশ্চাত্ত্য সনেট, বিশেষ করে সেক্সপীয়ারের সনেট কবির হৃদয়-উদ্ঘাটনের একটা উপযুক্ত মাধ্যম হিসেবে প্রশংসিত হয়েছে। মধুসূদনের সনেটেও ব্যক্তি-উপাদনের প্রাচুর্য আছে এবং সেই ব্যক্তি-উপাদানকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করতে গিয়ে তিনি সম্বোধন-আত্মক প্রকাশরীতি অনেক সময় অনুসরণ করেছেন। দেবেন্দ্রনাথ তাঁর সনেটে এই সম্বোধন-আত্মক প্রকাশরীতির আরও ব্যাপক ও সুন্দর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এবং তাতে তাঁর কবিতা পাঠকের কাছে বিশেষ হৃদ্য হয়ে ওঠার সুযোগ হয়েছে। স্বীকার

২৩. প্রবহমাণ ছন্দের সর্বাত্মক প্রয়োগ যে মিলের সৌন্দর্য স্ফূরণে বাধার সৃষ্টি করে, তা মধুসূদন-প্রসঙ্গে আলোচনা করে দেখিয়েছি।

২৪. 'কুসুম কোমল আর জ্যোৎস্না-সুশীতল' ('উচ্ছহাসি,)—এই চরণে 'জ্যোৎস্না' দ্বিমাত্রিক হলেও ওজনে ভারী, তাই পড়তে গেলে একটু বাধার সৃষ্টি হয়। এটি ব্যতিক্রমের উদাহরণ।

করতেই হবে, সম্বোধনের ঢঙ তাঁর সনেটের নিপুণতম নির্মাণ-কৌশল। কিছু

ঘোমটা খুলিবে না'ক ? থাক তবে বসি।
আমি করি কাব্য-পাঠ, যামিনী জাগিয়া।
একি! একি! চাঁপাগুলি গেছে বুঝি খসি ?
খোঁপা চাহে ফুলগুলি কাঁদিয়া, কাঁদিয়া।

—লাজ-ভাঙান।

'ছাড়, ছাড়, হাত ছাড়—' ছাড়িলাম হাত!
হে স্থন্দরি, রোষ কেন ? তুমি যে আমার
পরিচিত ; মনে নাই সে নিশি আঁধার ?
তোমাতে আমাতে হল প্রথম সাক্ষাৎ!

—দীপ-হস্তে যুবতী।

নাগেশ্বর-চাঁপাতলে কোন্ অলকায়,
দাঁড়াইয়াছিলে, তুমি মদনমোহিনী ?
এক রাশি জাতি, যুথি, মল্লিকা কামিনী,
ঝাঁপাইয়া কোলে তব, পশিল হিয়ায়!

—যুবতীর হাসি।

সম্বোধন-আত্মক রীতির উদাহরণগুলি যথেষ্ট নাটকীয়তারও সঞ্চার করেছে।

দেবেন্দ্রনাথের সনেটের কবিত্ব-সম্পদ্ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি যদি ভাবে আরও সংযম রক্ষা করতে পারতেন, ভাষা ও আঙ্গিক সম্বন্ধে আরও যত্নবান্ হতেন এবং কাব্যের প্রসাধনকলার দিকে আরও দৃষ্টি দিতে পারতেন তবে তাঁর কবিতা আরও রূপরসবিশিষ্ট হয়ে উঠত, সন্দেহ নেই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর কবিতায় এমন উপমা, ছবি ও চিত্রকল্প আছে যা রূপোজ্জ্বল, ইন্দ্রিয়সৌরভপূর্ণ ও বাস্তবরসাশ্রিত—

শ্রী-অঙ্গে মিশিয়া গেছে লজ্জা আবরণ ;
কেশের তরঙ্গরাশি চুম্বিছে মেদিনী!
সশৈবাল সরোজেতে ভ্রমর গুঞ্জন,
ঝির্ ঝির্ বহে যাঁর রূপ-নির্ঝরিণী!

—সত্তঃস্নাতা।

এ কি কাব্য! সারারাত্রি জ্বলিছে দেউটি,
প্রিয়া-চক্ষে কাব্য পড়ি উলটি পালটি॥

—গীতিকাব্য।

ছাদে চল; মুক্ত বায়ু; অদূরে তটিনী,—
দ্রৌপদীর শাড়ীসম সচন্দ্রা যামিনী!

—প্রিয়তমার প্রতি।

অধরে গড়ায়ে পড়ে সুধা রাশি রাশি!
সুরার বুদ্বুদ বুঝি ওই উচ্চ হাসি?

—উচ্চ হাসি।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কবি সনেটগুলির মধ্যে সর্বত্র ভাবের সুউচ্চ মহিমা ও সুরের অটল গাম্ভীর্য বজায় রাখতে তৎপর হন নি। তিনি যেন কতকটা লঘুচপল ও ঈষৎ কৌতুকমিশ্রিত দৃষ্টি নিয়ে বাস্তব জীবনের পাদপীঠে প্রেম ও প্রকৃতির সহজ সরল রূপটিকে দেখবার চেষ্টা করেছেন। মধুসূদনের সনেটের করুণ-গাম্ভীর্য এখানে স্পষ্টতঃই অনুপস্থিত (তা কবির কাব্যে এসেছে পরের দিকে)। দেবেন্দ্রনাথের সনেটের এই সুরের নূতনত্ব যথার্থই লক্ষণীয়।

পরিশেষে ভাব, ভাষা, আঠারো মাত্রার ছন্দ, কবিত্ব ইত্যাদি সব দিক থেকে সার্থক ও উজ্জ্বল একটি সনেট উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

বসন্তের উষা আসি রঞ্জি দিল যুগল-কপোলে,
তাই ও ফুলের বাস, ফুল-হাসি আননে প্রিয়ার।
নিদাঘের রৌদ্র আসি ঝিলসিল ললাট-নিটোলে,
তাই গো প্রিয়ার ভালে জ্যোতি খেলে মহিমা-ছটার।

ঘন-ঘোর বর্ষা-রাতি বিহরিল অলক-নিচোলে,
তাই গো প্রিয়ার পিঠ কেশ-মেঘে সদা মেঘাকার।
নাচিল শরৎ-শশী রূপ-হ্রদে হিল্লোলে হিল্লোলে,
তাই গো প্রিয়ার দেহ কূলে-কূলে চন্দ্রে চন্দ্রাকার!

রাহু, কেতু—দুই ঋতু, শীত ও হেমন্ত শুধু হায়,
প্রিয়ার হৃদয়ে পশি' ছড়াইল কঠিন তুষার।
তাই প্রিয়ে! তাই বুঝি সুকঠিন হৃদয় তোমার?
উপাসনা আরাধনা সকলি ঠেলিয়া দাও পায়।

আমি গো বুঝিতে নারি—দেবী তুমি, অথবা রাক্ষসী।
পূর্ণিমার জ্যোৎস্না তুমি, কিম্বা ঘোর কৃষ্ণা চতুর্দশী।

—রাক্ষসী।

দেবেন্দ্রনাথ একদা লিখেছিলেন—'বন্দী হ'য়ে সনেটের ক্ষুদ্র কারাগারে, কাঁদে যথা সুকবিতা, গুমরে গুমরে'। তাঁর প্রতিভা-স্পর্শে সেই বন্দিনী কবিতা প্রাণময়ী রূপোজ্জ্বলা সনেট-সুন্দরী হয়ে উঠেছে। তিনি অন্ততঃ সনেটের ক্ষেত্রে মেজর কবি। তার প্রমাণ আছে যেমন 'অশোকগুচ্ছে', তেমনি 'পারিজাতগুচ্ছ,' 'গোলাপগুচ্ছ' ও 'শেফালীগুচ্ছে'।

দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল ও গোবিন্দচন্দ্র দাস একই কাব্যবৃন্তের অন্তর্গত। এঁরা তিনজনই গীতিকবি, খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। প্রেম ও প্রকৃতি-পূজায় এবং তারই মধ্যে ঘরোয়া সুর ও গার্হস্থ্যরস সঞ্চারে তাঁরা সমধর্মা। আসক্তি বা প্যাসন্ এঁদের তিনজনেরই কবিমন্ত্র। আঙ্গিকের ক্ষেত্রেও এঁরা তুলনার যোগ্য, সনেট সম্পর্কে তিনজনই ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। তাই বাঙলা সনেটের ইতিহাসে দেবেন্দ্রনাথ, অক্ষয়কুমার ও গোবিন্দচন্দ্র স্মরণীয় নাম।

কবি-স্বভাবের দিক থেকে সনেট দেবেন্দ্রনাথের অপরিহার্য বা অত্যাবশ্যক কাব্যরূপ ছিল না। তিনি স্বভাবজ আবেগধর্ম ও উচ্ছ্বাসপ্রবণতাকে শাসন করবার জন্য সনেটের দৃঢ়পিনদ্ধ কাব্যবন্ধের আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু অক্ষয়কুমার ছিলেন সংযমী কবি, তাই সনেটের রূপ ও আত্মার সঙ্গে তাঁর কবিধর্মের একটা স্বাভাবিক সাযুজ্য ছিল। তাঁর কবিতায় হৃদয়ের উত্তাপের সঙ্গে মনের ভাবনার যে সহযোগ ঘটেছিল, তা-ই সনেটের ক্ষেত্রে তাঁর সিদ্ধির চাবিকাঠি। দ্বিতীয়তঃ, অক্ষয়কুমার বিহারীলালের ভাবশিষ্য ও দেবেন্দ্রনাথের কবি-সতীর্থ হলেও শিল্পকর্মে তাঁদের মতো উদাসীন ছিলেন না। তাঁর কাব্যধারার রূপ ও রীতিতে যেমন তার প্রমাণ আছে, তেমনি বিভিন্ন সংস্করণে কাব্যগ্রন্থগুলির বহু কবিতার কবির স্বকৃত পরিবর্তন ও পরিমার্জনে তার পরিচয় আছে। অবলীলাক্রমে লিখে এবং কবিতার প্রাথমিক রূপ দেখে তিনি কখনও সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি। কাব্যশিল্পে বড়ালকবির মনোযোগ ও রূপ-সাধনার সজ্ঞান অভিপ্রায় টেকনিকপ্রধান সনেট রচনায় যে সহায়ক হয়েছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

অক্ষয়কুমারের খণ্ড কবিতায় যে সংযম ও সংহতি দেখা যায় তার কারণ কবির আত্মস্থতা। তাঁর রোমান্টিক মানসধর্ম কখনও আবেগের অতিরেকে কূলপ্লাবী হত না, প্রকাশের তাড়নায় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত না। শোক তাঁর জীবনে এসেছে, জীবনের প্রথম পর্বে স্বপ্নচারিতার অনিবার্য অসন্তোষ তাঁকে পীড়িত করেছে, তবু কবি নিজেকে হারিয়ে ফেলেন নি। তার একটি কারণ, পূর্বে বলেছি, ভাবাত্মিকা বৃত্তির সঙ্গে চিন্তাত্মিকা বৃত্তির সন্নিপাত। দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে—বড়ালকবির বাস্তব অভিজ্ঞতা, সাংসারিক জ্ঞান ও কর্তব্যবুদ্ধি। মনে রাখতে হবে, তাঁর কবিজীবনের সাফল্যের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছে কর্মজীবনের সাফল্য; তিনি পরিণামে শিল্পীর মনোজীবন ও গৃহগতপ্রাণ সাংসারিক মানুষের বহির্জীবনকে এক সূত্রে গ্রথিত করতে পেরেছিলেন বলেই একটা ধীর ও শান্ত চিত্তবৃত্তি নিয়ে সাধারণ গীতিকবিতা ও সনেট লিখতে পেরেছিলেন। একটা উদাহরণ দিচ্ছি—

থাকিতে সময় তবে বিদায়, ললনা!
মিলন চঞ্চল অতি—
বিরাগ-সমুদ্রে গতি;
আর কেন স্বপ্নে মাতি থাকিতে চেতনা।

দেখিছ না পলে পলে
প্রেম মৃত্যুপথে চলে—
ভুলি' বর্তমান—ক্রমে ভবিষ্য-ভাবনা।
বিদায়, ললনা!
—আসি তবে, কনকাঞ্জলি।

কবির প্রিয়ামিলন নিশান্তেও সম্পূর্ণ হয় নি—'অসমাপ্ত এ চুম্বন, অপূর্ণ পিপাসা।' হৃদয়ে প্রলয়-ঝড়, দেহে মনে দহন তখনও চলেছে। তবু কবি বিদায় নিতে চাইলেন। কারণ তাঁর 'ভবিষ্য-ভাবনা', তাঁর 'চেতনা', তাঁর বাস্তব জ্ঞান—'মিলন চঞ্চল অতি', 'প্রেম মৃত্যুপথে চলে'। অক্ষয়কুমারের বক্তব্যের মধ্যে যেমন একটা চিন্তার ছাপ আছে, তেমনি বক্তব্য প্রকাশের মধ্যে আছে একটা argumentative ভঙ্গি। তারই ফলে কাব্যাংশটি বেশ সংযত ও সংহত হয়ে উঠেছে। কিন্তু অনুরূপ বিষয়ে দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিমোহ ও তৃষ্ণাকাতরতা কতখানি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত তার একটি নিদর্শন উদ্ধৃত করছি—

কবে কোন্ সেফালীর, সৌরভে হয়ে অস্থির,
দোঁহে-দোঁহা করেছিনু প্রেমসুধা-দান ;
কবে কোন্ যামিনীতে বসি বাতায়ন-পথে
করেছিলে তুমি সখি অভিমান-ভাণ ;
কোন্ সে মাধবী-রাতে, ফুলশয্যা ফুল-পাতে,
একটি চুম্বনে হল নিশি অবসান ;
নয়নে ত্রিদিব নেশা, পুলক-বিহ্বল-বেশা,
বলে যাও সে কাহিনী ; গেয়ে যাও গান ;
সাজে না তোমারে সখি মিছা অভিমান।

—গান-শোনা, অশোকগুচ্ছ।

অক্ষয়কুমারের ভাবগত সংযম-প্রসঙ্গে তাঁর বাক্‌প্রতিমার স্মিত প্রকাশের কথা বিচার্য। কবির হৃদয় যখন আবেগে ভরপূর, মন মোহাচ্ছন্ন তখনও তিনি বাক্‌কুণ্ঠ। তিনি জানেন—

সরল-হৃদয় কবি—
যেখানে মাধুরী-ছবি
সেখানে আকুল।

—কবি, কনকাঞ্জলি।

তবু সেই আকুলতায় অক্ষয়কুমার মুখর হয়ে ওঠেন নি। পরম আবেগের ক্ষণেও তাঁর প্রার্থনা—

ভয় হয়—কহিও না কথা,
যথেষ্ট পাইয়া এই রূপ !
দেখি ব'সে সলিলের লীলা,
কাজ নাই জানিয়ে—এ সাগর, কি কূপ।

—ওগো, ভুল।

আত্মস্থ ব্যক্তিত্বের এই পরিমিতিবোধের মধ্যে জন্ম বলেই অক্ষয়কুমারের কবিতার একটি শব্দও অতিরিক্ত বা অনাবশ্যক বলে মনে হয় না। যেটুকু না বললে চলে না, তার বাইরে একটি কথাও তিনি বলেন নি।

নত আঁখি, নত মুখ, কম্পিত শরীর,
বুঝিবে কি ভিতরের, দেখিয়া বাহির ?

—বাঁধিতেছি, খুলিতেছি ; ভুল।

ভাব ও ভাষার এই সংযম অক্ষয়কুমারের ছিল বলে সনেট তাঁর একটা বিশিষ্ট কাব্যবন্ধ হয়ে উঠেছে। অবশ্য দেবেন্দ্রনাথ, গোবিন্দচন্দ্র ও কামিনী রায়ের মতো তিনি সনেটসর্বস্ব কাব্যসংগ্রহ প্রকাশ করেন নি এবং তাঁর রচিত সনেটও সংখ্যায় খুব বেশী নয়। সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ 'কনকাঞ্জলি', 'ভুল', 'শঙ্খ' ও 'বিবিধখণ্ডের' সনেটের মোট সংখ্যা হচ্ছে ৩০টি (৭+১০+৮+৫)। তার মধ্যে 'শঙ্খ' কাব্যের সবগুলি সনেট উনিশ শতকে রচিত হয় নি। 'প্রদীপে' কোনো সনেট নেই।

অক্ষয়কুমার 'কনকাঞ্জলিতে' যে ৭টি সনেট লিখেছেন তার মধ্যে একটির শেষে ('এখনো রজনী আছে') মিত্রাক্ষর দ্বিপদী আছে। সনেটটির মিলের পদ্ধতি হচ্ছে কখখক কখখক পফপফ চচ। লক্ষণীয় এই যে, কবিতাটিতে মিলের সংখ্যা পাঁচ। ভাবের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, অষ্টম চরণের শেষে সুস্পষ্ট আবর্তন-সন্ধি আছে; নিশিভোরে প্রেমিকের করুণ আর্তি প্রেমিকার কাছে সহৃদয় মিনতিতে বাঁক নিয়েছে। কবিতাটির রূপমূর্তিও ছুটি স্তবকে বিন্যস্ত। এ থেকে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, চতুর্দশপদীটির পেত্রার্কীয় সনেট হয়ে ওঠার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু ষট্‌কের শেষ ছুটি চরণ মিত্রাক্ষর দ্বিপদীর রূপ নেওয়ায় পেত্রার্কীয় সনেটের রূপটি পুরোপুরি ফুটে উঠতে পারে নি। পেত্রার্কার সনেটেও যেখানে পয়ারপুচ্ছ আছে, সেখানে পেত্রার্কীয় সনেটের আদল এমনিভাবে অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে। অন্য দিকে এটা নিঃসংশয়ে বলা যায় যে, অন্তিম দ্বিপদী সত্ত্বেও কবিতাটির ভাব-আত্মা ও রূপ-গঠন সেক্সপীরীয় সনেটের লক্ষণাক্রান্ত নয়। এবং গানের ধুয়োর মতো দশটি চরণের প্রারম্ভে অনেকটা একই ধরনের কথার পুনরাবৃত্তি রচনাটির সাঙ্গীতিক চরিত্র যতখানি নিয়মানুগ করেছে ততখানি পরিমাণে সনেটের সংহত ভাব ও সুমিত প্রকাশধর্মকে ক্ষুণ্ণ করেছে। তবে গীতিকবিতা হিসেবে 'এখনো রজনী আছে' অনবদ্য সৃষ্টি।

'মিলনে', 'শত নাগিনীর পাকে', 'ছু' দিকে', 'সে নেত্রে', 'হেমন্তে' ও 'হৃদয় সমুদ্র সম' কবিতায় পেত্রার্কীয় সনেট রচনায় চেষ্টা বড়ালকবি করেছেন। তাদের মিলের পদ্ধতি যথাক্রমে—কখকখ কখকখ চথচথচথ, কখখক কখখক চছচছচছ, কখকখ কখকখ চছচছচছ, কখখক কখখক চছচছচছ, কখখক কগগক চছছচচছ, কখখক কখখক চছছচচছ। লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, প্রথম ও পঞ্চম কবিতা ছাড়া অন্যত্র পেত্রার্কীয় মিলের আদর্শ

অক্ষুণ্ণ আছে। অষ্টকে ও ষট্‌কে কোথায়ও কোথায়ও যে বিচিত্র মিলসজ্জা আছে তাও পেত্রার্কীয় আদর্শ-বিরোধী নয়, কারণ এই ধরনের স্বাধীনতা পাশ্চাত্ত্য কবিরাও ভোগ করেছেন। 'ছু'দিকে' কবিতাটি ছাড়া অন্য পাঁচটি কবিতায় অষ্টম চরণের শেষে ভাবের বক্রায়ণ সহজেই চোখে পড়ে। তবে 'ছু'দিকে' ভাববিন্যাসের দিক থেকে একটু ভিন্নতর—অষ্টক-ষট্‌ক ধরনের স্তবকসজ্জা সত্ত্বেও প্রথম বারো চরণে আছে বিচ্ছেদের শূন্যতা ও বেদনার কথা, আর শেষ ছুটি চরণে আছে সেই শূন্যতার ভেতরেও এক অবিনশ্বর স্মৃতিচিহ্নের কথা—

চুম্বন-চিহ্নটি শুধু অধর-শয়নে,—
জীবনের চিরস্মৃতি, মরণ-সম্বল।

সুতরাং ছুই তিনটি কবিতায় ভাব-বিন্যাস ও রূপসজ্জার কিছু নূতনত্ব সত্ত্বেও কবিতাগুলি পেত্রার্কীয় সনেটের উজ্জ্বল উদাহরণ। কয়েকটি কবিতাকে একেবারে নিখুঁত বলে মনে হয়। যেমন—

শত নাগিনীর পাকে বাঁধ' বাহু দিয়া
পাকে পাকে ভেঙ্গে যাক এ মোর শরীর।
এ রুদ্ধ-পঞ্জর হ'তে হৃদয় অধীর
পড়ুক ঝাঁপায়ে তার সর্বাঙ্গ ব্যাপিয়া।
হেরিয়া পূর্ণিমা-শশী—টুটিয়া লুটিয়া
ক্ষুভিয়া প্লাবিয়া যথা সমুদ্র অস্থির
বসন্তে—বনান্তে যথা, তুরন্ত সমীর
সারা ফুলবন দলি নহে তৃপ্ত হিয়া।
এদেহ—পাষাণ-ভার কর গো অন্তর।
হৃদয়-গোমুখী-মাঝে প্রেম-ভাগীরথী,
ক্ষুদ্র অন্ধ পরিসরে ভ্রমি' নিরন্তর
হতেছে বিকৃত ক্রমে, অপবিত্র অতি।
আলোকে পুলকে ঝরি, তুলি কলস্বর
করুক তোমারে চির স্নিগ্ধ-শুদ্ধমতি!

—শত নাগিনীর পাকে।

'ভুল' কাব্যে যে দশটি চতুর্দশপদী আছে তাদের প্রত্যেকটিরই শেষে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী আছে। সুতরাং সেক্সপীরীয় রীতির মানদণ্ডে কবিতাগুলিকে বিচার করা যেতে পারে।

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি
চুম্বন	কখকখ গখখগ পখপখ চচ
আলিঙ্গন	কখখক গঘঘগ পফফপ চচ
দম্পতির নিদ্রা	কখকখ গঘঘগ পফফপ চচ
রবীন্দ্রনাথ	কখকখ গঘগঘ পপপপ চচ
ঈশানচন্দ্র	কখকখ গঘগঘ পফফপ চচ
কোথায় সে দেশ	কখকখ গঘগঘ পফফপ চচ
রমণী-হৃদয়	কখখক গঘঘগ পফফপ চচ
শত ধিক্	কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ
ডুবেছে তপন	কখকখ গঘগঘ পফফপ চচ
বাঁধিতেছি, খুলিতেছি	কখখক গঘঘগ পফপফ চচ

কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ—এই খাঁটি সেক্সপীরীয় মিল একটি মাত্র কবিতায় ('শত ধিক্') আছে। 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক কবিতাটি ছাড়া অন্য আটটি কবিতায় প্রথাবদ্ধ মিলের কিছু ব্যতিক্রম ঘটলেও সাতটি মিল অব্যাহত থাকায় তাদেরও সেক্সপীরীয় সনেট হিসেবে গ্রহণ করা যায়। 'চুম্বনে' মাত্র পাঁচটি মিল আছে এবং প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় ও তৃতীয় চতুষ্কে পুনরাবৃত্ত হওয়ায় এটি ভঙ্গ সেক্সপীরীয় রীতির সনেটেরই উদাহরণ। কবিগুরু সম্পর্কিত কবিতাটির তৃতীয় চতুষ্কের চারটি চরণে একই মিলের সমাবেশ গুরুতর দোষের কারণ হয়েছে এবং সে-কারণে এটিকে ভঙ্গ সেক্সপীরীয় সনেট হিসেবে গ্রহণ করাই শ্রেয়। অক্ষয়কুমারের কবিতাগুলিতে মিলের সুস্পষ্টতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রশংসার যোগ্য। তবে 'ডুবেছে তপন' কবিতার 'আলো-জাল'-এর মিল খুবই দুর্বল এবং 'কোথায় সে দেশ' কবিতাটির দ্বিতীয় চতুষ্কে দুটি মিলের পার্থক্য নামমাত্র। কবিতাগুলির চতুষ্ক ও দ্বিপদী-গঠনে অক্ষয়কুমারের মুন্সীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায়। চতুষ্ক ও দ্বিপদীগুলিকে তিনি সুস্পষ্ট আকার দিতে পেরেছেন।

'শঙ্খ'[১] কাব্যগ্রন্থে যে ৮টি সনেট স্থান পেয়েছে তাদের সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—

---

১. 'শঙ্খ' (১৯১০)-এর কোনো কোনো সনেট উনিশ শতকে রচিত বলে কাব্যগ্রন্থটি বর্তমান আলোচনার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি
পূজার পর	কখখক কখখক চছছচচছ
রবীন্দ্রনাথ (১২৯৭)	কখকখ কখকখ পফফপ চচ
মাতৃহীন	কখকখ কখকখ চছচছচছ
হেমচন্দ্র (১৩১০)	কখকখ কখকখ পফপফ চচ
ঈশানচন্দ্র	কখকখ কখকখ পফপফ চচ
হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৩০৫)	কখকখ কখকখ পফফপ চচ
সন্ধ্যায়	কখখক কখখক চছজচছজ
নিত্যকৃষ্ণ বসু (১৩০৭)	কখখক কখখক চছচছচছ

এদের মধ্যে চারটির শেষে দ্বিপদী আছে এবং প্রত্যেকটিরই মিলের সংখ্যা পাঁচ। কোনোটিরই প্রথম আট চরণে দুটির বেশী মিল নেই। সুতরাং মিলের দিক থেকে এগুলিকে ভঙ্গ সেক্সপীরীয় সনেট বলতে হয়। তবে ভাব-বিন্যাসের দিক থেকে কবিতাগুলির মধ্যে কম-বেশী পরিমাণে সেক্সপীরীয় সনেটের logical ঢঙ বজায় আছে। 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় প্রথম বারো চরণে পূর্বাশায় উদীয়মান্ সূর্যের মনোরম বর্ণনার পর অন্তিম দ্বিপদীতে কবি যখন বলেন—

অর্ধ-নিদ্রা জাগরণে ধরা স্বর্গচ্ছবি—
জীবনে স্বপন-ভ্রম, ফুটে রবি—কবি।

তখন বক্তব্য প্রকাশের মধ্যে একটি উজ্জ্বলতার সন্ধান পাওয়া যায়। চতুষ্ক ও দ্বিপদী গঠনেও অক্ষয়কুমারের কৃতিত্বের পরিচয় আছে। কাব্য-গ্রন্থটির অবশিষ্ট ৪টি সনেট পেত্রার্কীয় রীতির। তাদের মধ্যে 'মাতৃহীনে' নিয়মের একটু ব্যতিক্রম থাকলেও ('কখখক'-এর বদলে 'কখকখ' আছে) অন্য তিনটির মিল-বিন্যাস নিখুঁত। প্রত্যেকটিতে অষ্টক-ষট্‌ক-বিভাগ ও আবর্তন-সন্ধি আছে। যেমন—

স্নেহময়ী মাতা ওই দিবা-অবসানে	ক
চঞ্চল বালকে তাঁর, দুটি হাতে ধরি,	খ
কত ছলে, কত বলে, কত স্নেহে, মরি,	খ
পথ হ'তে ল'য়ে যান নিজ গৃহ পানে!	ক
যায় শিশু—চায় পিছে কাতর নয়ানে,—	ক
কত সাধ, কত আশা, কত ধূলা পড়ি'!	খ

বাধে পদ, উঠে দুঃখে কাঁদিয়া গুমরি',— খ
'মাগো, আর কিছুক্ষণ খেলি এইখানে!' ক
হা প্রকৃতি—জননী গো! জীবন-সন্ধ্যায় চ
ওই মূঢ় শিশু সম, না বুঝে' তোমার ছ
স্নেহ-আকর্ষণে—ভাবি মরণ-তাড়না! জ
পলাইতে তোমা হ'তে পড়িয়া ধূলায় চ
আঁকড়িয়া ধরি বুকে ধূলার সংসার— ছ
রোগ, শোক, হাহাকার, অভাব, লাঞ্ছনা! জ

—সন্ধ্যায়।

বড়ালকবির এই সনেট অষ্টক-ষট্‌ক-বিভাগ ও মিল-বন্ধনের দিক থেকে নিখুঁত। পেত্রার্কীয় মিলের পদ্ধতি এখানে বিশ্বস্তভাবে অনুসৃত। অষ্টকে মায়ের কাছে সন্তানের আর একটু খেলবার সুযোগ প্রার্থনা এবং মায়ের ছলে বলে সন্তানকে ঘরে নিয়ে যাওয়ার কথা আছে। ষট্‌কে বৃহত্তর মানবজীবনের জন্ম-মৃত্যুর ক্ষেত্রে সেই একই ভাবেরই তাৎপর্য আরোপিত। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, যে ভাবকল্পনা অষ্টকে বিলসিত, তার মধ্যে থেকেই একটা বৃদ্ধিবৃত্ত গভীরতর চিন্তার প্রকাশ ষট্‌কে ঘটেছে। কবি এই দুই ভাগের মধ্যে সূক্ষ্ম যোগ রক্ষা করেও চিন্তার মোড় সুন্দরভাবে ঘুরিয়ে দিতে পেরেছেন। প্রথমাংশের করুণ-মধুর ছবি ললিত বিস্তারে উচ্ছ্বসিত হতে পারত, কিন্তু দ্বিতীয়াংশের ছয়টি চরণ সেই সম্ভাবিত উচ্ছ্বাসকে একটা সংযত-শোভন ভাবনার বৃত্তে শোষণ করে নিয়েছে। সব মিলে সনেটটির রস-রূপ নিটোল মুক্তার মতো প্রতিভাত।

অক্ষয়কুমারের জীবিতকালে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতার যে সংগ্রহ সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশ করেছেন, তাতে ৫টি সনেট আছে। সেই কবিতাগুলির গঠন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়—

সনেটের নাম	মিলের পদ্ধতি
হেমন্তে—১ (১৮৮৮)	কখখক গঘঘগ পফফপ চচ
হেমন্তে—২ (১৮৮৮)	কখখক গঘঘগ পফফপ চচ
বেহারিলাল (১৮৮৮)	কখখক গঘঘগ পফপফ চচ
অঞ্চলের বাতাস (১৮৮৮)	কখখক কখখক পফপফ চচ
রোগে যশাকাঙ্ক্ষা	কখকখ গকগক পফফপ চচ

প্রত্যেকটি সনেটের শেষে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী থাকলেও কোনো সনেটেই খাঁটি

সেক্সপীরীয় মিল কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ নেই। তবে নিয়মের একটু ব্যত্যয় থাকলেও প্রথম চারটিকে মিলের দিক থেকে শিথিল সেক্সপীরীয় সনেট বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। পঞ্চমটিতে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে পুনরাবৃত্ত হওয়ায় এটিকে ভঙ্গ সেক্সপীরীয় সনেট হিসেবে নির্দেশ করা যায়। শেষটি ছাড়া অন্যত্র চতুষ্ক ও দ্বিপদী গঠনে ত্রুটি নেই এবং চতুষ্কগুলিতে ভাবের ক্রমবিন্যাসের পর দ্বিপদীতে ভাবের উপসংহার আলোকবিন্দুর মতো উজ্জ্বলভাবে প্রতিভাত।

সুতরাং অক্ষয়কুমারের রচিত ৩০টি সনেটের সামগ্রিক পরিচয় হচ্ছে এই—

বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয়—৩ (কনকাঞ্জলি)+৩ (শঙ্খ)=৬
শিথিল পেত্রার্কীয়—২ (কনকাঞ্জলি)+১ (শঙ্খ) =৩
ভঙ্গ পেত্রার্কীয়—১ (কনকাঞ্জলি) =১
বিশুদ্ধ সেক্সপীরীয়—১ (ভুল) =১
শিথিল সেক্সপীরীয়—৭ (ভুল)+৪ (বিবিধ) =১১
ভঙ্গ সেক্সপীরীয়—২ (ভুল)+৪ (শঙ্খ)+১ বিবিধ=৭
মিশ্র রীতির সনেট—১ (কনকাঞ্জলি) =১
৩০

এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়, অক্ষয়কুমার (১) সনেটই রচনা করেছেন, চতুর্দশপদী নয়; (২) পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় এই উভয় জাতীয় সনেট রচনায় তিনি পারদর্শী ছিলেন; (৩) দ্বিবিধ রীতির সনেটে' নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটাতে তিনি দ্বিধা করতেন না; (৪) সেক্সপীরীয় রীতির সনেটের চেয়ে পেত্রার্কীয় রীতির সনেটে তাঁর নৈপুণ্য ছিল অধিকতর (ভঙ্গ সেক্সপীরীয় রীতির সনেটের সংখ্যা ৭ হলেও ভঙ্গ পেত্রার্কীয় রীতির সনেটের সংখ্যা ১, এটা লক্ষণীয়)।

পূর্বে সাধারণভাবে অক্ষয়কুমারের গীতিকবিতার বাক্‌সংযম ও ভাবসংহতি সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছি, তা তাঁর সনেটের ক্ষেত্রে কতখানি প্রযোজ্য তা এবার বিচার করে দেখা যাক্। 'অঞ্চলের বাতাস' শীর্ষক সনেটের প্রথম আট চরণে মলয়-সমীরের মহিমা কীর্তিত। কিন্তু সাধারণভাবে বাসন্ত সমীরের গুণ—তার পাবনত্ব, শক্তিময়তা, আনন্দকরতা বর্ণনার পর কবির মন হল গৃহাভিমুখী। সঙ্গে সঙ্গে কবির আবেগ বন্দী হল ঘরোয়া ভাবনার বৃত্তে, শান্ত হল এক

আনন্দময় উপলব্ধির স্থিরতার মধ্যে। শেষ ছয়টি চরণের মধ্যে তার পরিচয় আছে—

জননীর স্নেহ-ভরা অঞ্চল-বাতাসে,
কোন্ শিশু ফুটে নাই দেব-শিশুপ্রায় ?
মণি ভেবে ফণী ধরি বিহ্বল তরাসে
কে কিশোর ছুটে নাই জুড়াতে হেথায় ?
কে যুবক—কোন্ পাপী, এ পুণ্য-সৌরভে,
শত নাগ-পাশ ভাঙ্গি' দেবত্ব না লভে ?

'মিলনে' কবিতায় কবির হৃদয় মিলনের ফুলশয্যায় স্বপ্নাতুর হয়ে উঠেছে। ধরণী তাঁর চোখে হয়ে উঠেছে স্বর্গ। কিন্তু তবু তিনি বুদ্ধিভ্রষ্ট হন নি—চেতনার আলো জ্বালিয়ে সত্য-সন্ধানে অগ্রসর হয়েছেন—

বল, সখী, সত্য তুমি—নহ গো কল্পনা।
সত্য—ধ্রুব সত্য এই হৃদয়-মিলন !
স্বপন-ছলনা নহে,—এ প্রেম-চেতনা,
জীবনের অন্তরালে অনন্ত জীবন।

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কোনো স্থানেই অক্ষয়কুমারের আবেগের আমন্ত্রণে ভাষার অনাবশ্যক আড়ম্বর সৃষ্টি হয় নি—যেখানে সম্ভাবনা ছিল সেখানেও উপমা-রূপকের নাগপাশে, বাক্যখণ্ডের তীক্ষ্ণ শায়কে (কাটা কাটা ধরনের ভাষা লক্ষণীয়), চিরায়ত প্রসঙ্গের শীতল-স্পর্শে, যুক্তাক্ষরের কঠিন আঘাতে, প্রশ্নাত্মক বাক্যের রুদ্ধধ্বনিতে তাকে সংযত ও সংহত করে এনেছেন। তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত আছে নিচের উদ্ধৃতিতে—

হৃদয় সমুদ্র সম আকুলি' উচ্ছ্বসি'
আছাড়ি' পড়িছে আসি' তব রূপ-কূলে !
হৃদয়-পাষাণ-দ্বার দাও—দাও খুলে' !
চিরজন্ম লুটিব কি ও পদ পরশি' ?
অহুদিন—অনুক্ষণ দুরাশায় শ্বসি'
বৃথায় পশিতে চাই ওই মর্ম-মূলে !
লক্ষ্যহীন-নেত্রে, নারী, সাজি' নানা ফুলে,
মরণ-লুণ্ঠন হের,—স্থির গর্বে বসি'।

—হৃদয় সমুদ্র সম।

অক্ষয়কুমারের সনেট কবিত্ব সম্পদে বঞ্চিত নয়। অল্পকথায় মনের ভাব সুন্দর ও সরস করে তিনি বলতে পারতেন। নিখুঁত ছন্দে, পরিমিত শব্দ-সমাবেশে, উপমা-রূপকের মালায় তিনি যে বাক্-প্রতিমা সাজাতেন তাতে ভাবের রসঘন মূর্তি পরিস্ফুটনে তার যোগ্যতা অনস্বীকার্য। তাতে আবেগ ও অনুভূতির প্রকাশ যেমন ঘটেছে তেমনি প্রসাধনকলারও পরিচয় আছে। কবি একটি ক্ষেত্রে সংসারের দিকে কৌতুকমিশ্রিত ও হাস্যোজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন—ফলে সনেটও ('পূজার পর') নূতন রসের আস্বাদ নিয়ে উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'শঙ্খ' কাব্যের 'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় উপমাচ্ছলে যে প্রকৃতি-চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার যেমন নিজস্ব কাব্য-মূল্য আছে, তেমনি রবিকবির আবির্ভাবের ভাবপটভূমি হিসেবেও তা মূল্য বহন করছে। কয়েকটি ব্যক্তিবিষয়ক সনেট হয়ত আশানুরূপ রসরূপ লাভ করে নি। তবে স্মরণ রাখতে হবে, ব্যক্তিবিষয়ক সনেটগুলিকে উজ্জ্বল কবিতায় পরিণত করা মধুসূদনের পক্ষেও অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় নি। তিনি গুণী-জনের কণ্ঠে যে শ্রদ্ধা ও প্রীতির মালা পরিয়েছেন তা প্রায় শুষ্ক এবং উদ্দিষ্ট চরিত্রের মর্মস্থলে লক্ষ্যভেদ করতে তিনিও সর্বত্র সমর্থ হন নি। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে, অক্ষয়কুমারের অপরাধ যে অপেক্ষাকৃত কম, তা 'রবীন্দ্রনাথ' শীর্ষক দুটি সনেট ('ভুল' ও 'শঙ্খ' গ্রন্থে আছে; কবিতা দুটিতে ভাব ও ভাষাগত মিল আছে), 'হেমচন্দ্র', 'ঈশানচন্দ্র' ও 'নিত্যকৃষ্ণ বসু' দেখলেই বোঝা যায়।

মধুসূদন-প্রবর্তিত খাঁটি পেত্রার্কীয় সনেটের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় এবং মধুসূদন-রাজকৃষ্ণ-দেবেন্দ্রনাথ ইত্যাদির অনুশীলিত সেক্সপীরীয় সনেটের আদর্শ অনুসরণে অক্ষয়কুমারের কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে স্মরণীয়।

৩.

বাঙলা সনেটের ইতিহাসে গোবিন্দচন্দ্র দাসেরও একটা স্থান আছে। তাঁর 'ফুলরেণু' নামক সনেট-সংগ্রহ ১৩০৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এতে মোট ১২১টি[১] সনেট আছে। প্রথম কয়েকটি সনেটের নাম হচ্ছে—বালিকা; যুবতী;

১. (মূল গ্রন্থ) ১২০ + (উপহার-অংশ) ১ = মোট ১২১

প্রৌঢ়া; বৃদ্ধা; আমার ঈশ্বর; প্রশংসাপত্র; কার শক্তি; আমার দেবতা; ভূতের ভয়; চুল শুকান; আর; ক্ষতি নাই; আমরা; ভয়; দেখা; কলঙ্ক; তুমি আর আমি; চিলাই; সংবাদ; অনাদি অব্যয়, দুই দুই; বিদায় ইত্যাদি। এ থেকে কাব্যটির বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে ধারণা করা যায়। প্রেম গোবিন্দচন্দ্রের অন্যতম মূল ভাবগ্রন্থি হলেও তিনি মধুসূদনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে বিচিত্রবিষয়ক সনেট লিখেছেন, এটা লক্ষণীয়।

গোবিন্দচন্দ্র দাস ইংরেজী-শিক্ষিত কবি ছিলেন না। ইংরেজী কাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় না থাকার জন্য য়ুরোপীয় সনেট সম্পর্কে তিনি সাক্ষাৎভাবে কিছু জানতেন না। তবে মধুসূদনের কাল থেকে ইংরেজী কাব্যের যে সমস্ত রূপ ও রীতি বাঙলা কাব্যে প্রবর্তিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার কথা তিনি ভালো ভাবেই জানতেন। অনুমান করা যায়, মধুসূদন, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, অক্ষয়কুমার বড়াল, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদির সনেট বা সনেটকল্প কবিতা দেখেই তিনি তাঁর 'ফুলরেণু' (১৩০৩) কাব্যগ্রন্থের সনেটগুলি রচনা করতে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, প্রত্যক্ষভাবে কোনো ইংরেজ কবির সনেট তাঁর আদর্শ ছিল না। মনে রাখতে হবে, সারের মৃত্যু ও সেক্সপীয়ারের আবির্ভাবের অন্তবর্তী কালে সনেট রচনা করা যেমন অপ্রধান ইংরেজ কবিদের কাছে ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তেমনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের পর থেকে বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত সনেট বা চতুর্দশপদী রচনা করাও অপ্রধান বাঙালী কবিদের কাছে ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেকালের পত্র-পত্রিকায় (অবশ্য 'বঙ্গদর্শন' তার ব্যতিক্রম) এই জাতীয় কবিতা প্রায়শঃই চোখে পড়ে। গোবিন্দচন্দ্রও কতকটা কাব্যগত ফ্যাসান হিসেবেই সনেটের চর্চা করেছিলেন।

ফ্যাসান মাত্রই সর্বতোভাবে মন্দ নয়। সারের মৃত্যুর পর সনেট রচনার যে ফ্যাসান ইংরেজী কাব্যে দেখা দিয়েছিল, তা শুধু আগাছার আবর্জনাই সৃষ্টি করে নি—সিড্‌নির 'অ্যাস্ট্রোফেল ও স্টেলার' মতো উজ্জ্বল ও জনপ্রিয় সনেট-সংগ্রহেরও জন্ম দিয়েছে। বস্তুতঃ সনেটের নির্ধারিত ছন্দোবন্ধ ও সুপরিকল্পিত গঠনভঙ্গির মধ্যে নিজের হৃদয়াবেগকে বাস্তব বোধ ও বুদ্ধিপ্রসূত যুক্তিনিষ্ঠার সাহায্যে সংযত ও সংহত করে রাখতে পেরেছিলেন বলেই সিড্‌নির সাফল্য ঘটেছিল। কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের তীব্র মর্মজ্বালা ও তির্যক মনোভঙ্গি সনেটের রূপবন্ধের সঙ্গে খাপ খেয়ে যায় নি। তাঁর মনোজীবনের মূল প্রোথিত

ছিল যে দুটি পক্ষপাতমূলক সংস্কারের মধ্যে[২] সেখানে কঠিন আঘাত পড়ায় একটা প্রচণ্ড অভিমান ও রোষ, অতৃপ্তির বেদনা ও ব্যর্থতার আবেগ তাঁর কবিচিত্তকে একেবারে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এবং কবিচিত্তের সেই উত্তাপ ও আবেগের সঙ্গে সনেটের কাব্যবন্ধের ভারসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখা প্রায় অসম্ভব ছিল। অথচ আমরা জানি, একটা পাথুরে অবয়বের মধ্যে ভাবের প্রাণপ্রবাহকে কৌশলে বিধৃত করার ওপরেই সনেটের স্ফূর্তি ও দীপ্তি নির্ভর করে। গোবিন্দচন্দ্রের অন্তরের 'গলন্ত লাভাস্রোত' শিল্পকলার শাসন মানতে অসমর্থ ছিল বলে সনেট তাঁর আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে নি। তবে তাঁর প্রতিভার সঙ্গে সনেটের রূপবন্ধের এই অসামঞ্জস্য সত্ত্বেও তিনি যে সনেট চর্চায় অগ্রসর হয়েছিলেন, তার কারণ তৎকালীন ফ্যাসান। ফ্যাসানের দাসত্ব এ-ক্ষেত্রে মন্দ ফল ফলিয়েছে।

অথচ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় এই আবেগের তীব্রতা যদি না থাকত, যদি তাঁর উপলব্ধিতে নিবিড়তা ও প্রশান্তি দেখা দিত, তবে তিনি ভালো সনেট লিখতে পারতেন বলে মনে হয়। কারণ তাঁর অন্তরের ভাবগ্রন্থিদ্বয়—পত্নীপ্রেম ও জন্মভূমি-প্রীতি—সনেটের পক্ষে উপযুক্ত বিষয়। এই পত্নী-প্রেমের রস-উৎসেই জন্ম নিয়েছে সেকালের বিশিষ্ট সনেটকার দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমারের কবিতাবলী। বিষয় দুটি য়ুরোপীয় সনেটেরও প্রিয় মর্মবস্তু। তবু যে তিনি সার্থক সনেটকার হতে পারেন নি তার কারণ, পূর্বেই বলেছি, তাঁর অন্তরাবেগের প্রচণ্ড তীব্রতা। তার উজ্জ্বল নিদর্শন আছে ভাওয়াল-বিষয়ক ১১টি সনেটের মধ্যে।

---

২. 'স্ত্রীর মৃত্যু এবং জয়দেবপুর হইতে নির্বাসন, এই দুটি তিক্ত স্মৃতি কবির পরবর্তী সমস্ত রচনাকে দুঃখে তিক্ততায় জ্বালায় এবং সৌন্দর্যে রঞ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। জন্মভূমি ও পত্নী, জন্মভূমির সৌন্দর্য ও পত্নীর প্রেম—এই দুইটি হইতে অকালে আকস্মিকভাবে শোকাবহভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় কবির মনে যে ক্ষত সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই ক্ষত মুখে তাঁহার কবিতা উৎসারিত হইয়াছে, সেইজন্যই তাঁহার কবিতাবলীতে, তা সে যে-বিষয়েই হোক-না কেন, গলন্ত লাভার ন্যায় এক প্রকার অস্বাভাবিক উত্তাপ অনুভূত হয়।'—প্রমথনাথ বিশী, বাংলার কবি (১৩৬৬), পৃঃ ৩১।

ভাওয়াল-বিষয়ক সনেট-পরম্পরার[৩] মধ্যে একটা ভাবগত ঐক্য আছে। প্রত্যেকটি কবিতাকে একটা বৃহত্তর কবিতার স্তবক-বিশেষ রূপেই কবি রচনা করতে প্রয়াস পেয়েছেন। প্রথম কবিতাতেই স্বভাব-কবির মনের আগ্নেয় জ্বালা অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ভাষায় অভিব্যক্ত—

পূর্ববঙ্গ রাজধানী ঢাকার নিকটে,
মূর্খতা-আঁধারে ঢাকা ভাওয়ালের বন,
এ দেশে বসতি বন-মানুষের বটে,
প্রকৃত মানুষ বাস করে না কখন !

* * * *

পশুর অধিক এরা পশু বনচর,
আত্মবলে অবিশ্বাসী, অপরে নির্ভর। —১নং সনেট।

দ্বিতীয় কবিতাটিতে গোবিন্দ দাস 'অতি ক্ষুদ্র তৃণজাতি শ্যাম দূর্বাদলের' প্রশংসা করতে গিয়ে ভাওয়ালবাসীকে তুলনামূলকভাবে হীনতর বলে নির্দেশ করেছেন—

তোমরা ভাওয়ালবাসী এর চেয়ে হীন,
মায়ের কৃতঘ্নপুত্র তৃণাদপি তৃণ। —২নং সনেট।

তৃতীয় কবিতায় তিনি ভাওয়ালবাসীকে আত্মঘাতী, ভ্রাতৃদ্রোহী, মাতৃ-হত্যাকারী, অসভ্য বর্বর, মূর্খ ইত্যাদি বলে আক্রমণ করে শেষ পর্যন্ত এই অনুরোধ করেছেন—

উঠহে ভাওয়ালবাসী প্রিয় ভ্রাতৃগণ,
উঠ শীঘ্র মোহনিদ্রা উঠ পরিহরি,
জড়তা আলস্য ত্যজ দৃঢ় কর মন,
উঠ নীচ, ভীরুতারে পদাঘাত করি। —৩নং সনেট।

৩. 'ভাওয়াল'-বিষয়ে ৬টি, 'হুকা' সম্পর্কে ২টি, 'মোক্ষদা' শিরোনামে ৩টি এবং 'কিশোরী' বিষয়ে ২টি সনেট-পরম্বরা তিনি লিখেছেন। এছাড়া 'কালী-নারায়ণ রায়', 'ভাওয়ালে পূজা', 'ভাওয়ালে বিজয়া', 'ভাওয়ালে কোজাগর পূর্ণিমা', 'ভাওয়ালে ভাইফোঁটা' এই ৫টি স্বতন্ত্র সনেটকেও 'ভাওয়াল'-শীর্ষক ৬টি সনেট-পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত করা যেতে পারে।

চতুর্থ কবিতায় ইংরেজের প্রশংসা থাকলেও ভাওয়ালবাসী সম্পর্কে কবির মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে নি—

ইংরাজের মত কেহ নাহি সদাশয়,
ধরার দাসত্ব প্রথা করেছে মোচন,
তোমরা তাহারি প্রজা—সরল হৃদয়,
তোমরা দাসের দাস কেন অকারণ ? —৪নং সনেট।

পঞ্চম কবিতার ভাবও অভিন্ন—

তোমরা নাগার নাগা, গারো চেয়ে গারো,
নাহি ধর্ম নাহি জ্ঞান হৃদয়ে কাহারো।

—৫নং সনেট।

শেষ কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে ভাওয়ালবাসী সম্বন্ধে সেই একই মনোভাবের পুনরাবৃত্তিতে—

তোমরা এমনি নীচ—এমনি অধম,
সামান্য বাষ্পের চেয়ে মহিমায় কম !

—৬নং সনেট।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি সনেটে কবির রোষ-কষায়িত মনের তীব্র প্রতিফলন ঘটেছে। কবি কোথায়ও নিজের আবেগের প্রচণ্ডতাকে সংযত ও সংহত করবার চেষ্টা করেন নি। সবগুলি কবিতাই যেন ছন্দোবদ্ধ তিরস্কার মাত্র। অথচ আমরা জানি, কবি মাত্রেরই আবেগ শান্ত সমাহিত না হলে—অনেকখানি ভাব মরে গিয়ে একটুখানি ভাবে পরিণত না হলে রসস্থ ও সৌন্দর্যধর্মী হয়ে ওঠে না। আর সে-কারণেই গোবিন্দ দাসের সনেটগুলি শিল্পকর্ম হিসেবে সার্থকতা লাভ করে নি। সিড্‌নি, স্পেন্‌সার, সেক্সপীয়ার ইত্যাদি কবিদের জীবনে বিরহ-মিলনের তীব্র উপলব্ধি ঘটেছিল—কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের সেই সব অভিজ্ঞতাকে তাঁরা সনেটে যথার্থ কাব্যরূপ দিতে পেরেছিলেন। এক অবিশ্বাসী বন্ধু ও এক উপেক্ষিকা নারীকে নিয়ে সেক্সপীয়ারের যে হৃদয়-মন্থন হয়েছিল, তা থেকেই তো জন্ম নিয়েছে নিম্নোদ্ধৃত সনেটটি—

Two loves I have, of comfort and despair,
Which like two spirits do suggest me still ;
The better angel is a man right fair,
The worser spirit a woman, colour'd ill.

To win me soon to hell, my female evil
Tempteth my better angel from my side,
And would corrupt my saint to be a devil,
Wooing his purity with her foul pride.
And whether that my angel be turn'd fiend,
Suspect I may, yet not directly tell;
But being both from me, both to each friend,
I guess one angel in another's hell.
Yet this shall I ne'er know, but live in doubt,
Till my bad angel fire my good one out.

—No. 144

এখানে 'worser spirit' 'colour'd ill', 'female evil', 'bad angel' ইত্যাদি কথাগুলি প্রাক্-খৃষ্টীয় যুগের নারীর সংজ্ঞা—'a necessary evil, a natural temptation, a desirable calamity, a domestic peril, a deadly fascination and a painted ill (Chrysostom)'—মনে করিয়ে দেয়। শুধু সেক্সপীয়ারের দুঃখ-বেদনা নয়—তাঁর ক্রোধ ও ঘৃণার মূর্তিটি যেন এখানে দেখতে পাচ্ছি। তৎসত্ত্বেও গোবিন্দদাসের 'ভাওয়াল' বিষয়ক সনেটগুলির চেয়ে এ সনেটটি উৎকৃষ্টতর।

সনেটের ক্ষেত্রে গোবিন্দচন্দ্রের ব্যর্থতার দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে শিল্পকর্ম সম্বন্ধে কবির অমনোযোগ বা যত্নের অভাব। তাঁর কাব্য-প্রকাশের ঢঙটা ছিল কতকটা অশিক্ষিতপটু স্বভাবকবির মতো। তিনি মুখে যা এসেছে তা-ই বলে গেছেন, কোনো কথা রেখে ঢেকে বলার প্রয়োজন বোধ করেন নি। তাঁর প্রকাশ-রীতিতে অনুশীলনের কোনো ছাপ নেই। তাতে যে অকপটতা বা সহজিয়া ধর্ম প্রকাশ পেয়েছে তা অসংস্কৃত লোক-কবির পক্ষে প্রশংসার কথা হলেও সনেটকারের পক্ষে নয়। কারণ সনেট একটা বহু পরীক্ষিত শিল্পকর্ম ও তার জন্য সযত্ন সাধনা অত্যাবশ্যক। নিচের উদ্ধৃতি দুটি গোবিন্দচন্দ্র দাসের শিল্প-চেতনার অভাব নিঃসন্দেহে সূচিত করছে—

আমরা দুজনে করি প্রাণ বিনিময়,
হিংসায় পাড়ার লোকে তারে বলে চুরি!
চুরি কি এমনতর বলে কয়ে হয়?
দিতে গেলে চুরি বলে বিষম চাতুরী। —আমরা।

শকুনী খাইলে মরা তখনি ফুরায়,
রমণী জীবিত রেখে দিনে দিনে খায়। —নারী ও শকুনী।
তব জন্ম-ভূমি যেই তার এই হাল্,
হয়েছে গার্ডেন যেন জুওলজিকাল্।

— কালীনারায়ণ রায়।

তৃতীয়তঃ, গোবিন্দচন্দ্র সনেট রচনায় যে সেক্সপীরীয় পদ্ধতিটিকে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নিখুঁত রূপায়ণেও তিনি তেমন সচেষ্ট ছিলেন বলে মনে হয় না। কতকগুলি সনেটে তিনি যেমন কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ মিলের পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তেমনি আবার কতকগুলি সনেটে নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়েছেন। যেমন 'আমার দেবতা' কবিতার মিলের রীতি হচ্ছে—কখকখ, গখগখ, পফপফ, চচ। এখানে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল দ্বিতীয় চতুষ্কে পুনরাবৃত্ত হওয়ায় মিলের সংখ্যা সাতের বদলে ছয় হয়ে গেছে। আবার কোথায়ও কোথায়ও দুটি মিলের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য—যেমন 'শরতের উষা'য় 'নীহার-বালিকার' মিলের সঙ্গে 'মনোহর-আদর'-এর পার্থক্য নাম মাত্র। এসব নিয়মের ব্যতিক্রমের ক্ষেত্রে তাঁর কবিতাগুলি শিথিল বা ভঙ্গ সেক্সপীরীয় সনেটের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

তবে স্বীকার করতেই হবে, তাঁর সনেটগুলিতে তিনটি চতুষ্ক ও দ্বিপদীটি সম্পূর্ণ আকার পেয়েছে এবং তিনি সেগুলিকে পৃথক করেই দেখিয়েছেন। তাছাড়া কোনো কোনো সনেটে দ্বিপদী যথার্থই epigrammatic রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই সমস্ত কারণে নিয়মের কিছু কিছু ব্যতিক্রম সত্ত্বেও তাঁর সনেটগুলি সেক্সপীরীয় মণ্ডলেরই অন্তর্ভুক্ত।

যেখানে কবির অন্তরাবেগের প্রচণ্ডতা ও রোষ-কষায়িত মনের তীব্র জ্বালা নেই এবং শান্ত সমাহিত চিত্তের নিবিড় উপলব্ধির পরিচয় আছে সেখানে গোবিন্দচন্দ্রের সনেটেও কাব্য-সৌন্দর্য অভিব্যক্ত হয়েছে। যেমন—

ওঠে নি এখনো রবি ফোটে নি কিরণ,
সাদা সাদা ছায়াময় জ্যোতি সুকোমল,
হাসিমাখা আধ স্বপ্ন আধ জাগরণ,
উজলি উঠিছে যেন নীল নভতল!

জাগে জাগে হইয়াছে বন উপবন,
পবনে বহিছে ধীরে নব পরিমল,
বালিকার দেহে ছিল ঘুমায়ে যৌবন,
এখনি খুলিবে যেন নয়ন-কমল।
সোনার শৈশব স্বপ্ন করে পলায়ন,
চুপে চুপে লাজ ভয়ে তারকার মত,
বালিকা রূপের উষা করে আগমন,
পশ্চাতে লইয়া যেন স্বর্গ শত শত।
হৃদয়ে সুমেরু-শিশু জাগিতেছে কিবা,
অই বুঝি ভোর হয় ত্রিদিবের দিবা।

—বালিকা।

স্থান বিশেষে তাঁর সনেটের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের সনেটের ক্ষীণ প্রভাব চোখে পড়ে। তবে ভাব, ভাষা, রীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে তিনি যে মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' কাব্যমণ্ডল থেকে অনেকটা দূরে ছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

৪.

কামিনী রায় কবি হিসেবে সেকালেরও নন, একালেরও নন—তিনি যুগ-সন্ধির কবি। কাব্যাদর্শে তিনি হেমচন্দ্রের যুগের সমষ্টি-চেতনা, বস্তুধর্মিতা ও স্পষ্টবাদিতাকে যেমন অঙ্গীকার করে নিয়েছিলেন তেমনি রবীন্দ্রযুগের আত্ম-মগ্নতা, ব্যক্তি-চেতনা ও রহস্যরস সম্পর্কে সজাগ ছিলেন। এই দুই আদর্শের সংলগ্নতার ফলে তাঁর কাব্যকলায় একদিকে দেখা দিয়েছে সংযম ও সংহতি, অন্য দিকে ব্যক্তিগত সুখদুঃখবোধের শান্ত সৌন্দর্য। হেমচন্দ্রদের কাছ থেকে পাওয়া অকৃত্রিম হৃদয়ধর্ম ও চক্ষুষ্মানতার সুস্থ আদর্শ ছিল বলেই তিনি ব্যক্তিগত শোক ও আনন্দের অনুভূতিকে আত্মভাবপ্রধান কবিদের মতো সীমাহীনের ব্যাকুলতায় উৎকণ্ঠিত করে তোলেন নি—বরং শান্তরসাশ্রিত উপ-লব্ধির মধ্যে তাকে প্রত্যক্ষীভূত করে তুলতে চেয়েছেন। তাছাড়া বাস্তব জীবন-ধর্মে তাঁর সহজ বিশ্বাস এবং লোকজীবনসুলভ স্বাভাবিক ঈশ্বরনির্ভরতা ও

নীতিচিন্তাও সমস্ত রকমের ভাবাতিরেক থেকে তাঁকে রক্ষা করেছে। সর্বোপরি, তিনি কবি হিসেবে ছিলেন কতকটা বাক্‌কুণ্ঠ। আর সে সব কারণেই সনেট-চর্চায় তাঁর সিদ্ধিলাভ ঘটেছে।

কামিনী রায়ের পক্ষে সনেট ছিল প্রতিভার স্বক্ষেত্র। তাঁর দুটি উৎকৃষ্ট কাব্য-গ্রন্থ 'অশোক-সঙ্গীত' (১৯১৪) ও 'জীবন-পথে' (১৯৩০) সনেট-সংগ্রহ। তাছাড়া তাঁর অন্যান্য কাব্য-গ্রন্থেও কিছু কিছু সনেট সংকলিত হয়েছে। কবির সনেট-সংকলন দুটি বিশ শতকে প্রকাশিত হলেও তাদের অনেকগুলি সনেট উনিশ শতকে লিখিত। তাছাড়া তাঁর কাব্যধারায় বিবর্তনের তেমন সুস্পষ্ট চিহ্ন নেই বলে বর্তমান প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে প্রকাশিত তাঁর সনেটেরও আলোচনা করা যেতে পারে।

'মাল্য ও নির্মাল্য' (১৯১৩) গ্রন্থে 'হৃতাভিজ্ঞান' নামে যে সনেটটি আছে, তার মিলের রীতি হচ্ছে কখখক, ককখখ, পফপফ, চচ। স্পষ্টতঃই দ্বিতীয় চতুষ্কে নিয়মানুগত্যের অভাব আছে। 'আলো ও ছায়ার' সমকালে লিখিত যে সমস্ত কবিতা এই গ্রন্থে সংগৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে 'দিল্লী', 'স্মৃতিচিহ্ন' ও 'সাজাহান' নামক সনেট তিনটি উল্লেখযোগ্য। তাদের মিল-বিন্যাস হচ্ছে যথা-ক্রমে কখখক, কখখক, কচছ কচছ; কখখক, খগগখ, চছজ চছজ; কখখক, কখখক, চছজ চছজ। লক্ষণীয় এই যে প্রথম দুটি সনেট নিয়মের দিক থেকে নিখুঁত নয়। প্রথমটির ষট্‌কবন্ধে 'ক' মিলের পুনরাবৃত্তি অবাঞ্ছিত, দ্বিতীয়টির দ্বিতীয় চতুষ্কে 'ক' মিলের বদলে 'গ' মিলের সংযোজন নিয়মানুগ নয়। এ দুটিকে ভঙ্গ পেত্রার্কীয় সনেট বলতে হয়। তৃতীয়টি কবিতা হিসেবে যেমন সুখ্যাত, তেমনি গঠনের দিক থেকেও প্রায়-নিখুঁত। অষ্টম চরণের পর ভাবের আবর্তন-সন্ধি আছে। তবে উপচ্ছেদ অন্তে থাকলেও প্রথম চতুষ্কের গঠন স্ববলম্বিত নয়—ফলে ভাবগত ইউনিট হিসেবে সমগ্র অষ্টকটিকেই গ্রহণ করতে হয়।

এই সৌধরাজি পানে চাহি যতবার — ক
অতল বিস্ময় মাঝে তত ডুবে যাই। — খ
সৌন্দর্যে পুণ্যের বাস। ভাবিয়া না পাই, — খ
ভ্রাতৃরক্তে সিংহাসনে অভিষেক যার, — ক
এমন শুভ্রতার মাঝে কেমনে বিহার — ক
করিত সে। বিধি, যারে স্নেহ দাও নাই, — খ
তারে কেন আঁখি দিলে, তোমারে সুধাই? — খ

অথবা প্রস্তরে হিয়া গঠেছিলে তার ? — ক
মুছে গেছে ধরা হ'তে শোণিতের দাগ, — চ
রুধির-রঞ্জিত হস্ত ধূলি-পরিণত, — ছ
সে হস্তের শ্বেতশোভা করিতে প্রচার, — জ
এই উচ্চ কীর্তি স্তম্ভ রয়েছে সজাগ ; — চ
প্রিয়ার প্রণয় তার জানাইছে কত — ছ
আজ, দীন ভারতের রত্ন অলঙ্কার। — জ

—সাজাহান।

সুতরাং এটিকে উৎকৃষ্ট পেত্রার্কীয় সনেট হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। কবিতাটির স্থানবিশেষে প্রবহমাণ ছন্দের ব্যবহারও উল্লেখযোগ্য। তবে পঞ্চম চরণটিতে একটি মাত্রা বেশী আছে।

'অশোক-সঙ্গীতের' সনেটগুলিও পেত্রার্কীয় পদ্ধতিতে গঠিত। মিলে চমৎকারিত্ব বা বিস্ময়করতা কিছু নেই বটে, তবে তেমন খুঁতও নেই। আবর্তন-সন্ধি কোথায়ও স্পষ্ট, কোথায়ও বা অস্পষ্ট। কবিতাগুলির চরণে চরণে শোকবিক্ষুব্ধ হৃদয়ের জ্বালা নয়, অভিমান বা স্নেহকাতরতার মৃদু কম্পন মাত্র অনুভব করা যায়। নিয়তির কাছে আত্মসমর্পণ করেই তিনি যেন শান্তি খুঁজেছেন, যা পেয়েছেন তারই সুধায় চিত্তকে ভরিয়ে নিতে চেয়েছেন।

যে মাতৃস্বাদ
তুই দিলি এ জীবনে, সেই রসে ভোর
আজ ভুলিয়াছি শোক

*   *   *   *

ছিলে যে ক'দিন
সেই ক'দিনের ভাগ্য তুলনাবিহীন।

তবু সেই শান্ত বিশ্বাসের বুক ভেঙ্গে কোথায়ও কোথায়ও উঠেছে দীর্ঘশ্বাস—'সন্তান-বিরহ বড়ই কঠিন ব্যথা, বড় সে কঠিন।' এবং সেখানেই কবিতাগুলির মাধুর্য। একটি সনেট উদ্ধৃত করছি—

তব পাঠগৃহ-লগ্ন চামেলির লতা — ক
প্রতিদিন ফুটাইছে ফুল নব নব, — খ
মধুর সৌরভ-স্নাত, শুভ্র ও পেলব, — খ
তাহার জীবনে নাই কোন ব্যাকুলতা, — ক

অঙ্গে থাক ক্ষত চিহ্ন, ঢেকে রাখে ব্যথা ক
কাটিবার ছাঁটিবার, গৃহমাঝে তব খ
ছড়ায় সুরভি শ্বাস। আমি কবে হব খ
ব্যথায় নীরব নম্র, পুষ্পভার-লতা ? ক
প্রতিদিন দীপ্ত রবি কত প্রাণখানি চ
করিবে কিরণস্নাত ; বিনত এ শিরে ছ
বহি যাবে বর্ষা বায়ু ; অমৃতের বাণী চ
কভু উচ্চৈঃস্বরে, কভু অতি ধীরে ধীরে ছ
সুদূর সাগর হ'তে দিবে মোরে আনি, চ
আমিও আনন্দ গন্ধ দিব ধরণীরে। ছ

—অশোক-সঙ্গীত।

'জীবন-পথের' সনেটগুলিতে নিচু গলায় কবি অনেকটা একই সুরে গেয়েছেন জীবনের নানা গান। তাঁর গলা আগের মতোই কোথাও চড়ে নি। তবে রং-ফেরা অস্তিত্বের এক একটা মুহূর্ত কখনও প্রেমের স্মৃতি-চারণায়, কখনও ঋতুচক্র-ভাবনায়, কখনও বা সকরুণ অনুভূতির দোলায় চোদ্দটি ছত্রের মধ্যে অবিস্মরণীয় হয়ে উঠেছে। সুদূরের ভাবনা বা সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষা বা কল্পনা-প্রবণতার অসামান্য প্রসার সনেটগুলির মধ্যে কোথায়ও দেখা যায় না। তাঁর প্রাণের কথা—

তবু হৃদয় মোর দীর্ঘ রাত্রিদিন
এই পান্থশালা পানে ফিরে ঘুরে আসে।
* * * *
বাহির হইব আমি, বাধাবন্ধহীন
সংসারের রাজপথে আপন তল্লাসে।

সংসারের রাজপথে চলার সময়ে ঈশ্বর-বিশ্বাস তাঁকে কবচের মতো রক্ষা করুক, এই শুধু কামিনী রায়ের আন্তরিক প্রার্থনা। তাঁর সনেটগুলি যেন এক একটা ক্ষুদ্র গবাক্ষ—তাতে জ্বলছে বর্তমান অনুভূতি বা স্মৃতির প্রদীপ, নিত্যের জ্যোতির চেয়ে অনিত্যের নশ্বর আলো বিতরণেই তার অধিকতর গৌরব। তবে সনেট-পরম্পরায় সেই আলোর ছটাও অবিচ্ছিন্ন মালার মতো প্রতিভাত।

কি পেয়েছি, কি দিয়েছি, লয়ে কি সঞ্চয়
চলেছি, কেন সে চিন্তা ? কি হইবে জানি
কতখানি স্বপ্ন, আর সত্য কতখানি ?

জীবনের আদ্যোপান্ত জাগরণ নয়,
সমস্তই নহে স্বপ্ন। তাও যদি হয়,
ক্ষতি কি? একান্তে হেথা মোরা দুটি প্রাণী
পরস্পরে পরিতৃপ্ত, সর্ব দুঃখগ্লানি
মুছে গেছে প্রেমস্পর্শে, ঘুচে গেছে ভয়।
মোরা আসি নাই হেথা বহিবারে ভার,
দিনের মজুরি লয়ে, ধনীর আলয়ে
খাটিতে ঘর্মাক্ত ক্লান্ত; জীবন-উৎসবে
আদৃত অতিথি মোরা বিশ্ববিধাতার;
অমৃত পড়িলে পাতে পিয়া নিঃসংশয়ে,
কহিব—মানবভাগ্যে অমৃত সম্ভবে।

কখনও কখনও কামিনী রায় সনেটের রূপবন্ধে নূতনতর পরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন। যেমন—

তোমার দুঃখ দেখি পরাণে দুঃখ পাই
আপন মনোব্যথা সকলি ভুলে যাই।
এসো হে দুঃখী এস, এ বুকে রাখ শির
শীতল এ অঞ্চলে মুছেদি আঁখি নীর। ইত্যাদি।

—সমবেদনায় পত্নী (১৮৯৭)

এতে সনেটের চেয়ে গানের ঝংকারই বেশী অনুরণিত। ৮+৬-এর বদলে ৭+৭ পর্ব-বিন্যাস সনেটের গভীর-গম্ভীর ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি করতে পারে নি। তবে এই সব পরীক্ষামূলকতার নিদর্শন বাদ দিলে তাঁর সনেটগুলিকে পেত্রার্কীয় রীতির ভাল উদাহরণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। তাঁর অষ্টকগুলি মোটামুটি নিয়মানুগ, ষট্‌কগুলি ব্যভিচারী না হয়েও বৈচিত্র্যপূর্ণ (চছজ চছজ/চছছ চচছ/চছছ চছচ ইত্যাদি)। ছন্দের প্রবহমাণতা তাঁর সনেটের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এবং সে-ক্ষেত্রে মধুসূদনের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

৫.

উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে মহিলা কবি হিসেবে সরোজকুমারী দেবী কিছুটা খ্যাতি লাভ করেছিলেন। সনেট রচনার যে ফ্যাসান সেকালে প্রচলিত

হয়েছিল, তিনি তার বশবর্তী হয়ে কিছু সনেটও লিখেছিলেন। ১২৯৯ বঙ্গাব্দের 'সাহিত্য' পত্রিকায় (৩য় বর্ষ, ১১ সংখ্যা) তাঁর রচিত ২৪টি সনেট এক সঙ্গে প্রকাশিত হয়। বিষয় বঙ্কিম-উপন্যাসের নায়িকা। তখনকার দিনে এই বিষয়ে কবিতা বা সনেট লেখা যে একটা প্রচলিত রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তা আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে লক্ষ্য করেছি। সরোজকুমারীর লিখিত সনেটগুলির নাম হচ্ছে এই—কপালকুণ্ডলা; মতি বিবি; শ্যামাসুন্দরী; ভ্রমর; রোহিণী; মৃণালিনী; মনোরমা; গিরিজায়া; শৈবলিনী; দলনী বিবি; কুন্দ; সূর্যমুখী; কমল; তিলোত্তমা; আয়েসা; বিমলা; শান্তি; কল্যাণী; চঞ্চলা; প্রফুল্ল; সাগর; শ্রী; রমা; জয়ন্তী। নায়িকাদের জীবনের কাহিনী ও ঘটনাধারার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের চরিত্র-চিত্র পরিস্ফুটনই কবিতাগুলির লক্ষ্য। সনেটগুলির মধ্যে একদিকে মধুসূদন ও তাঁর অনুকারকবৃন্দের, অন্য দিকে দেবেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাব আছে। তুলনায় রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদীগুলির প্রভাব কম। রূপ ও রীতির দিক থেকে সরোজকুমারী দেবেন্দ্রনাথের মতো সেক্সপীরীয় আদর্শই অনুসরণ করেছেন। তাঁর রচিত কয়েকটি সনেটের মিলসূচক শব্দগুলি উদ্ধৃত করছি—

(১) শ্যামাসুন্দরী—হৃদয়ে-কাকলি-ফুটিয়ে-কি বলি
মল্লিকা-তরে-বালিকা-ঝরে
প্রায়-সরলা-হায়-চপলা
ছায়-হায়

(২) দলনী বিবি—শশী-মালায়-খসি-বেলায়
জানে-ছায়ায়-সিংহাসনে-মায়ায়
শেষ-বাণী-অবশেষ-বাহিনী
দেবতা-ব্যথা

(৩) চঞ্চলা —পরে-আবেগে-ঝরে-অনুরাগে
শয্যায়-মাঝে-প্রায়-আছে
লহরে-নয়নে-শিখরে-চরণে
রাজরাণী-বাহিনী

(৪) জয়ন্তী —আলোকে-ত্রিশূল-ঝলকে-ভুল
মণ্ডপ-মগন-প্রতাপ-নয়ন
তোমার-তরে-ধার-ঝরে
উদ্‌যাপন-আপন

লক্ষণীয় এই যে, 'দলনী বিবি'-তে প্রথম চতুষ্কের একটি মিল ('মালায়-বেলায়') দ্বিতীয় চতুষ্কে ('ছায়ায়-মায়ায়') পুনরাবৃত্ত হয়েছে। এটি ছাড়া আর কোনো ত্রুটি সনেটগুলির মিলে নেই। পয়ারপুচ্ছ রচনায় তিনি কতকটা কৃতিত্ব দেখাতে পেরেছেন—কখনও পূর্ববর্তী ১২টি চরণের বক্তব্যের উপসংহার, কখনও বা স্বতন্ত্র উজ্জ্বল বিবৃতি হিসেবে এগুলি উপভোগ্য। সরোজকুমারীর একটি সনেট এখানে পুরোপুরি উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

প্রদোষে সিন্ধুর কোলে দাঁড়ায়ে পথিক,
কে এলো বিজন পথে, বুঝি দিগঙ্গনা
এলেন স্বরগ হতে দেখাইতে দিক,
কাতরে এমন আর কাহার করুণা ?
কিম্বা বনদেবী বুঝি হেথা নিরজনে,
প্রকৃতির বিকশিত শ্যামল অঞ্চলে
মগন ছিলেন নিজ সৌন্দর্য-স্বপনে,
সহসা ভাঙিল ঘোর সকাতর বোলে।
কি মধুর শোভে আলুলায়িতকুন্তলা,
চাঁদ যেন মেঘে ঢাকা তেমনি মুখানি ;
জ্যোতির্ময় আঁখে যেন ঝলকে চপলা,
চঞ্চল সমীর খেলে সে অঞ্চল টানি,
'পথিক ভুলেছো পথ !'—প্রদোষ আঁধার—
উঠিলেন বনদেবী করুণা অপার।

—কপালকুণ্ডলা।

উনিশ শতকের একেবারে শেষ দিকে আরও কিছু গৌণ কবির রচনায় সনেট-আদর্শের অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' প্রকাশের পর তাঁরই আদর্শে চতুর্দশপদী রচনার যে ফ্যাসান (পরবর্তী অধ্যায়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য) প্রচলিত হয়েছিল, এঁরা তার মধ্যে বাস করেও সনেটের বিশিষ্ট রূপাদর্শ নিজেদের শক্তি অনুযায়ী বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন। অবশ্য এঁদের মধ্যে কেউ কেউ যেমন সনেট লিখেছেন, তেমনি চতুর্দশপদীও লিখেছেন। তুলনামূলকভাবে বিচার করলে দেখা যায়, পেত্রার্কীয় সনেটবন্ধের চেয়ে সেক্সপীরীয় সনেটবন্ধই এঁদের কাছে অধিকতর প্রিয় ছিল। তার একটা কারণ হয়ত এই যে, পেত্রার্কীয় সনেটের চেয়ে সেক্সপীরীয় সনেট রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ।

সেদিক থেকে দেখলে মনে হয়, উনিশ শতকের শেষদিকে বাঙলা সনেটের ক্ষেত্রে মধুসূদনের সনেটগুলির আদর্শ তেমন স্বীকৃতি পায় নি। গৌণ কবিদের সনেট-রচনার কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

শিশু

অশরীরী আনন্দের ক্ষুদ্র এক কণা
তৃপ্তির অধরচ্যুত একবিন্দু হাসি
আপনে আপনি মগ্ন এত আনমনা
ভুলে কি ধরার গেহে ফুটিয়াছে আসি
বিহগের নভঃপ্লাবী স্বর মধুময়
বাসন্তী পূর্ণিমা রাতে জোছনা অঞ্চল
আকুল সৌরভভরা কুসুম-হৃদয়
প্রেমের আলোকে দীপ্ত নয়ন চঞ্চল
শোকমুক্ত হৃদয়ের আনন্দ উচ্ছ্বাস
স্তব্ধরাতে দূরাগত বাঁশরীর গান
সন্ধ্যার ললাটে স্নিগ্ধ তারকাপ্রকাশ
কি আছে জগতে বল তোমার সমান
ব্যথিত কাতর হৃদি জুড়াবার তরে
ভুলে কি ফুটেছে আসি এ আঁধার ঘরে ?

—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ (সাহিত্য, ১৩০২)

হৃদয়ের সাথে বুঝি হৃদয়ের কথা !
দোঁহারে টানিছে দোঁহে আপনার পানে,
জানাইতে মরমের চির আকুলতা
এসেছে হৃদয় ছুটি ভাসিয়া নয়ানে।
গোপন প্রাণের দ্বার গেছে যেন খুলে,
দোঁহার লুকানো আশা দেখিছে দোঁহায়,
উথলিছে প্রেমসিন্ধু আঁখি-উপকূলে,
ভ'রে উঠে দয়শের হরষ-জ্যোৎস্নায়।

কত না মধুর সাধ সুখের পিপাসা
জাগিছে অতৃপ্তি নিয়ে নয়নের কোণে ;
নীরব মনের কত সুকোমল ভাষা
বুঝিতেছে পরস্পরে না বলে না শুনে ;
প্রাণে বাঁধিতেছে প্রাণ গাঢ় আলিঙ্গনে,
চেয়ে শুধু অনিমিখে নয়নে নয়নে।

— বিনয়কুমারী বসু (সাহিত্য, ১২৯৮, বৈশাখ)

শাসন

কি দিয়াছ ? তাই চাও লইতে ছিনায়ে,
নয়নে ভ্রূকুটি বাণ করিয়া যোজন,
শশী-মুখে রাগ-রাহু করিয়ে ধারণ,
শাসনের মেঘ মন্দ্রে পরাণে কাঁপায়ে ?
কেড়ে লবে ছিনে লবে হৃদয়ে কাঁদায়ে
হৃদয়ের আভরণ প্রেম মোহময়।
তাই বুঝি দেখাইছ এ দারুণ ভয়
নিষেধ করিছ সখা লুটাইতে পায়ে ?
নাহি শঙ্কা নাহি ভয় হইতে কাঙাল,
অনুগ্রহ-করা-প্রেম লও দয়া করি,
পরাণে নাহিক আর মোহ-মদিরতা।
সম্মুখে শোকের সিন্ধু চঞ্চল বিশাল
ডাকিছে সস্নেহে মোরে তুলিয়া লহরী
মিশাতে অনন্ত মাঝে হৃদয়ের ব্যথা।

—বেণোয়ারীলাল গোস্বামী (ঐ, জ্যৈষ্ঠ)

টেনিসন্

বড়ই দারুণ দেশ হিমানীতে ভরা ;
মধ্যাহ্ন ফুটিতে নারে রবির কিরণ,
না জানে সে দেশবাসী বসন্ত কেমন,
যেন কোন যুগান্তের নির্বাসিত ধরা।

ভেদিয়া সে হিমানীর মরুময় কারা
তুমি ত ফুটেছ রবি! উজল বরণে,
নবাগত বসন্তের সোনার কিরণে
হেরে ও নূতন দৃশ্য দেশ আত্মহারা।
কেমন বহিছে সদা মলয় অনিল,
ডালে ডালে বন-কোণে বিহগের গান,
মৃত চিত বিমোহিত—অবশ পরাণ
উড়িছে সুদূর নভে মেঘ নবনীল,
নিশার বিমল জ্যোৎস্না, সমুজ্জল তারা,
ফুল-বনে ফুলময়ী হসিতা সে ধরা।

— নগেন্দ্রনাথ সোম (ঐ, ভাদ্র)

সেক্সপীরীয় সনেট লেখা সেকালের কবিদের কাছে কতটা প্রিয় শিল্পকর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল তা প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ষের (১৩০১ ২) 'জ্যোতিঃ' পত্রিকা দেখলে বোঝা যায়। প্রতি সংখ্যার প্রথমেই একটি সনেট প্রকাশ করা পত্রটির রীতি ছিল। লেখকদের মধ্যে ছিলেন যোগীন্দ্রনাথ সরকার, উমেশচন্দ্র সরকার, বঙ্কিম বিহারী দাস ইত্যাদি। কোনো কোনো কবিতার শেষে কবির নাম নেই। একটি সনেট এখানে উদ্ধৃত করছি—

ভিখারী

সারাদিন অনশনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া
শ্রান্ত দেহে বিলুণ্ঠিত হতেছি ধরায়;
আসিছে আঁধার-ঘন চৌদিকে গ্রাসিয়া,
এ ঘোর গহনে আমি একা অসহায়।
কে আছে গো, নাশ আসি মরমের ক্লেশ;
সকলেরি ঘরে ঘরে জলিছে আলোক,
সবাই প্রফুল্ল সুখ-স্বচ্ছন্দে অশেষ,—
আমারে ঘেরিয়া শুধু শান্তিহীন শোক!

কে আছে গো, একবার স্নেহের অঞ্চলে
শোক-তপ্ত নয়নের মলিন মুছাও,
সান্ত্বনা ঢালিয়া প্রাণে তুলে লহ কোলে,
সন্ত্রস্ত প্রাণের ভয় ভাবনা ঘুচাও।
ভুলে যাবে শোক তাপ ও মুখ নেহারি,
এস কাছে 'মা' বলিয়া জুড়াবে ভিখারী।

—যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

পরিশেষে একটি ব্যঙ্গাত্মক সনেট উদ্ধৃত করে স্বর-বৈচিত্র্যের পরিচয় দিচ্ছি—

একটি কুক্কুরের প্রতি

চিরদিন পৃথিবীতে আছিল প্রবাদ
কুক্কুর চীৎকার করে চন্দ্রোদয় দেখি
আজি এ কলির শেষে অপরূপ এ কি
কুক্কুরের মতিভ্রম বিষম প্রমাদ।
চিরদিন চন্দ্রপানে চাহিয়া চাহিয়া
এতদিনে কুক্কুর কি হইল পাগল?
হাসিছে নবীন রবি নভঃ উজলিয়া
তাহে কেন কুক্কুরের পরাণ বিকল?
নাড়িয়া লাঙ্গুলখানি, ঊর্ধ্বপানে চাহি
ঘেউ ঘেউ ভেউ ভেউ মরে ফুকারিয়া
তবু ত' রবির আলো ম্লান হল নাহি
নাহি হল অন্ধকার জগতের হিয়া।
হে কুক্কুর, ঘোষ কেন আক্রোশ নিষ্ফল
অত ঊর্ধ্বে পহুঁছে কি কণ্ঠ ক্ষীণবল?

—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

৭। বাঙলা চতুর্দশপদীর চরম উৎকর্ষ : রবীন্দ্রনাথ

কবি-কলম্বাস রবীন্দ্রনাথ কাব্য-সাহিত্যের প্রতিটি প্রদেশ আবিষ্কারে নিরন্তর উৎসাহী ছিলেন। যেটা অন্য কবির স্বক্ষেত্র—স্বরচিত ক্ষেত্র—তাকে আপন করে নেওয়ার মধ্যে তিনি কোনো অগৌরব দেখতে পান নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, 'বাতাসে সত্যের যে প্রভাব ভেসে বেড়ায় তা দূরের থেকেই আসুক বা নিকটের থেকে, তাকে সর্বাগ্রে অনুভব করে এবং স্বীকার করে প্রতিভাসম্পন্ন চিত্ত।' তাতে প্রমাণ হয় প্রতিভার প্রাণবত্তার। আর সেই প্রতিভার প্রাণবত্তা রবীন্দ্রনাথের ছিল বলেই য়ুরোপের কাব্য-সাহিত্যের বিচিত্র ভাণ্ডার থেকে ভাব ও রূপের সংকেত গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করেন নি। পাশ্চাত্ত্য দেশ তাঁর মনকে আর কিছু না দিক, কাব্যের বিচিত্র সম্ভাবনার তীব্র চেতনা দিয়েছিল, সরস্বতীর মণি-হর্ম্যের কক্ষ-বৈচিত্র্যের আভাস দিয়েছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি একথাও বিশ্বাস করতেন যে, আপন প্রতিভাবলে কবি যদি পরকীয়কে স্বকীয় করে নিতে না পারেন তবে তাঁকে নির্লজ্জ অধমর্ণতার দায় ও অক্ষম সৃষ্টির বোঝা বহন করে চলতে হয়। তাঁর নিজের ক্ষেত্রেও দেখতে পাই, তিনি স্থানবিশেষে অন্যের কাছ থেকে সংকেতটুকু মাত্র নিয়েছেন এবং তা সম্বল করে শেষ পর্যন্ত আপন সৃষ্টির পথ আপনি রচনা করেছেন। 'কুশ জাতকে' সুদর্শনা-কুশের যে বীজ-কাহিনীটুকু আছে এবং মেটারলিঙ্কের সাংকেতিক নাটকে যে রূপাদর্শটির সন্ধান পাওয়া যায় শিল্পসৌন্দর্যময় ও ভাবগভীর 'রাজা' নাটকের সঙ্গে তার মিল সামান্যই এবং নাটকটির শিল্প-গৌরব সর্বতোভাবে রবীন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য। অন্যত্র দেখেছি[১], গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির উল্লাসে যে সমস্ত শিল্প-মাধ্যম সন্ধান করেছিলেন পাশ্চাত্ত্য ওডের রূপবন্ধ তাদের অন্যতম। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, তাঁর প্রতিভার স্পর্শে এই বিদেশী রূপবন্ধটিও রাবীন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। এ থেকে সিদ্ধান্ত করতে হয়, রবীন্দ্রনাথের মতো দিগ্বিজয়ী কবি-পুরুষ পর-রাজ্য আবিষ্কার ও অধিকার করেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না, মৌলিক উদ্ভাবকের মতো তাকে নিজস্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে পরিণত করাই তাঁর প্রতিভার স্বধর্ম। আর সে কারণেই পূর্বসূরীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সনেটের নিয়মানুগত অ্যাব্‌স্ট্রাক্ট ফর্মটির বিশ্বস্তভাবে অনুশীলন করা তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক ছিল না।

১. মৎপ্রণীত 'আধুনিক বাঙলা গীতিকবিতা (ওড)' দ্রষ্টব্য।

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ কখনই ভারতচন্দ্র বা মধুসূদনের মতো শিল্প-সচেতন কবি ছিলেন না। এর অর্থ এই নয় যে, তাঁর কাব্যের শিল্পরূপ বিশৃঙ্খল ও মূল্যহীন। বরং তাঁর মনের আগুন নিত্য নতুন ফর্মের সাহায্যে রূপ-সৃষ্টির সুন্দর আয়োজন করে গেছে, এ অনস্বীকার্য সত্য। তবে তাঁর কবি-মন কখনই সচেতনভাবে ফর্মের অনুশীলন করতে ভালোবাসত না। আলঙ্কারিক ভাষায় বলা যায়, তাঁর কাব্যের ভাব ও রূপ একই মানসিক বেগ বা প্রযত্নের সৃষ্টি। বীজ যেমন নিজেকে প্রকাশ করতে গিয়ে গাছের সৃষ্টি করে ফেলে অথচ কী সৃষ্টি করছে নিজে জানে না, তেমনি কবির ভাবও নিজের অজ্ঞাতসারেই নানা রূপ পরিগ্রহ করে গেছে। ফর্মটাও যে আলাদা চর্চার বিষয় এটা তিনি কাব্যে তেমন স্বীকার করে নিয়েছেন বলে মনে হয় না। অথচ আমরা জানি সনেট রচনায় কবির আঙ্গিক-চেতনা প্রবল না হলে চলে না। তাছাড়া ফর্ম সম্বন্ধে একটা অতৃপ্তি ও অসহিষ্ণুতা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বরাবরই দেখা গেছে। একই জিনিষকে নানা আধারে উপস্থাপনার যে প্রবণতা তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করি তা থেকে বোঝা যায়, কোনো শিল্প-রূপকেই তিনি অপরিহার্য বা অপরিবর্তনীয় বলে মনে করতেন না। নিত্যনব রূপের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি এক নাটক থেকে আরেক নাটক, গল্প থেকে নাটক, কাব্যনাট্য থেকে নৃত্যনাট্য, কবিতা থেকে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন এবং পূর্ববর্তী রচনার রূপান্তর, পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে সাহিত্যকর্মের রূপভঙ্গিমা সম্বন্ধে নিজের অস্থির মনেরই স্বাক্ষর রেখে গেছেন। সেই সব রূপান্তর, পরিমার্জন ও পরিবর্ধনের ফলে রবীন্দ্রনাথের সংশ্লিষ্ট রচনাগুলির মধ্যে সব সময়েই যে অধিকতর পূর্ণতা বা উৎকর্ষ এসেছে এমন নয়। আসল কথা, রবীন্দ্র-সাহিত্য-শিল্পের পরিবর্তনশীলতা তাঁর সৃজন-মানসের অস্থির ধর্মেরই পরিচায়ক। এই ধরনের শিল্প-সচেতনতার অভাব ও রূপপরিবর্তনশীলতার লক্ষণ রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যেখানে সুস্পষ্ট, সেখানে তাঁর পক্ষে অন্যান্য কাব্যরূপের চেয়ে অপেক্ষাকৃত অনমনীয় সনেটবন্ধে কবিতা রচনা করা যে সহজ ও স্বাভাবিক ছিল না, এ কথা মানতেই হবে।

তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথের কবি-মন ছিল রোমান্টিক, আবেগপ্রধান ও উচ্ছ্বাসপ্রবণ। তবে একটা শান্ত বিশ্বাস, আশাবাদী পুরুষার্থ ও অধ্যাত্ম-বিবেক সেই রোমান্টিক মানসপ্রবণতার মুখে কখনও কখনও লাগাম জুড়ে দিয়েছে, আত্মস্থতা এনেছে। কিন্তু সনেটের লিরিক-কল্পনায় যে ক্লাসিসিজমের ঝোঁক থাকে তার সঙ্গে কবিগুরুর রোমান্টিক মানসের এই আত্মস্থতার ভেদ আছে। তাছাড়া

সনেটের উজ্জ্বল রূপাবয়ব নির্মাণ করতে হলে শুধু রোমান্টিক মনের আত্মহুতা থাকলেই চলে না, অনেকখানি ভাবকে স্বল্পতর ভাবনায় সংহতি দিয়ে একটা নিরেট মূর্তির মধ্যে ফুটিয়ে তোলার জন্য গভীর ও গম্ভীর, সত্য ও সরল, পরিমিত ও নিয়মানুগ প্রকাশ-নৈপুণ্য থাকা চাই। রবীন্দ্রনাথের তা ছিল না বলেই সনেটকে তাঁর প্রতিভার স্বক্ষেত্র হিসেবে নির্দেশ করা যায় না। সনেটের কাব্য-স্থাপত্য তাঁর প্রতিভাসাধ্য ছিল না।

চতুর্থতঃ, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র বিপুল সৃষ্টিতে তাঁর গীতিপ্রতিভার বহুমুখী লীলার পরিচয় আছে। তিনি তাঁর নর্মবাঁশিতে মধুর ও কোমল গভীর ও গম্ভীর, কঠিন ও জটিল কত সুরই না সৃষ্টি করে গেছেন! তার প্রমাণ যেমন তাঁর গানে আছে, তেমনি কবিতায়ও আছে। গীতিকবিতা তাঁর কবিসত্তার স্বক্ষেত্র ছিল বলে বহুগুণিত সঙ্গীতধর্মে সেগুলি শ্রবণ-মনকে মুগ্ধ করে। তাতে কখনও শোনা যায় ধ্রুপদের গম্ভীর ও বিলম্বিত তাল, কখনও খেয়ালের বিচিত্র রাগিণী, কখনও ঠুংরির নিপুণ সুরধ্বনি, কখনও বা পল্লীসঙ্গীতের উদার তান। এমন বহু বিচিত্র সুরস্রষ্টা রূপে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁর পক্ষে গীতিকবিতাতেও সুরের প্রাধান্য ও সঙ্গীতগুণের প্লাবন সৃষ্টির দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া খুবই স্বাভাবিক ছিল। বস্তুতঃপক্ষে সঙ্গীতময়তার জন্যই তাঁর অনেক গীতিকবিতা সহজে গানে রূপান্তর লাভ করেছে। 'কড়ি ও কোমল' নামক কাব্যগ্রন্থে 'তবু' শীর্ষক যে কবিতাটি আছে (প্রথম চরণ : তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলি,), তা যে ঈষৎ পরিবর্তনেই গীতরূপ (প্রথম চরণ : তবু মনে রেখো যদি দূরে যাই চলে) লাভ করেছে তার কারণ মূল কবিতাটির ছন্দ-রূপের মধ্যেই ছিল একটা সঙ্গীতাত্মকতা এবং প্রতি স্তবকের সূচনায় একই ছত্রাংশের পুনরাবৃত্তির মধ্যেই ছিল সঙ্গীতসুলভ ধ্রুবপদের ইঙ্গিত। কয়েকটি শব্দের পরিবর্তনে এমনভাবে কবিতা যেখানে গানের অবয়ব লাভ করে সেখানে ভাব-চিন্তার অধীনে এবং তারই সমান্তরাল-ভাবে (অর্থাৎ সুরের প্রাধান্য না ঘটিয়ে) সনেটের ছন্দঃস্পন্দ ও মিলবিন্যাসকে সুনিয়ন্ত্রিত ও সমবায়ী ধ্বনি-পরিণামের দিকে নিয়ে যাওয়ার ধৈর্য রবীন্দ্র-প্রতিভার ছিল বলে মনে হয় না।

২.

প্রশ্ন উঠতে পারে, কবিগুরুর প্রতিভা সাধারণভাবে সনেটের কাব্য-স্থাপত্য সৃষ্টির পক্ষে অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও এবং সনেটের নিয়মপ্রধান শিল্পরূপ সম্বন্ধে

মনোযোগী ও যত্নবান হওয়ার মতো মানসিক স্থৈর্যের অভাব তাঁর থাকা সত্বেও রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'সেঁজুতি' পর্যন্ত দীর্ঘ কবি-জীবনে মাঝে মাঝেই সনেট বা সনেটকল্প কবিতা বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনার চেষ্টা করলেন কেন? বিষয়বস্তু বা ভাবাদর্শের দিক থেকে এই জাতীয় কবিতা রচনা করা কি অপরিহার্য ছিল? এই সব প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে গেলে প্রথমে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে 'কড়ি ও কোমলের' দিকে।

রবীন্দ্রনাথ যখন 'কড়ি ও কোমল' রচনা করেন তখন তাঁর মধ্যে নবযৌবনের 'আত্মপ্রকাশের একটা প্রবল আবেগ' ও 'আত্মবিস্মৃত বে-আইনী প্রমত্ততা' ছিল। তবে উত্তম গীতিকবিতা সৃষ্টির জন্য ব্যক্তিত্ববোধের যে আত্মস্থতা প্রয়োজন তা তখনও কবির মধ্যে আসে নি। তাঁর মনের ভাব তখনও পুরোপুরি স্বকীয় ভাষায় স্বমূর্তি ধরে উঠতে পারে নি। 'মানসী'তেই প্রথম রবীন্দ্রনাথ যথার্থভাবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে শিল্পীসত্তার পূর্ণ সহযোগ ঘটে। সুতরাং এটা ঐতিহাসিক সত্য যে, 'কড়ি ও কোমল' কাব্যখানি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ববর্তী রচনা। সত্য বটে, যে 'কপিবুক' রচনা ও 'মডেল-লেখা নকল করার সাধনা' প্রাক্-'সন্ধ্যাসঙ্গীত' যুগে চলেছিল তা ততদিনে শেষ হয়ে গিয়েছে, তবু রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' পর্যন্ত বাইরের আদর্শ বা আবহাওয়াকে একেবারে পেরিয়ে আসতে পারেন নি। কচি আমের গুটি তখন দেখা দিয়েছে বটে, তবে আমের বোলও একেবারে ঝরে পড়ে নি। স্মরণ রাখতে হবে, সেকালেও কোনো কোনো রসজ্ঞ ব্যক্তি 'কড়ি ও কোমলে' ফরাসী কাব্যের প্রভাব দেখেছেন। সুতরাং আমার মনে হয়, কাব্যটিতে রবীন্দ্রনাথ যে সনেট বা সনেটকল্প কবিতার চর্চা করলেন তার পেছনে বাইরের প্রভাব থাকতে পারে। বাঙলা সনেটের যে ইতিবৃত্ত আমরা পূর্বের দুটি অধ্যায়ে রচনা করেছি, তা থেকে বোঝা যায় যে, মধুসূদন সনেটের যে সার্থক সূচনা করেন তার একটা কালানুক্রমিক ধারাবাহিকতা রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ রায়, রাধানাথ রায় প্রমুখ গৌণ কবিরা অব্যাহত রেখেছিলেন।[২] অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, রবীন্দ্রনাথ যেমন মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতা-

২. 'কড়ি ও কোমলের' প্রসঙ্গে 'কবির মন্তব্যে' রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'এই রীতির কবিতা তখনো প্রচলিত ছিল না।' মন্তব্যটি সনেট-রীতি সম্পর্কে যে প্রযোজ্য নয়, বর্তমান গ্রন্থের চতুর্থ ও পঞ্চম অধ্যায়ের বিষয়বস্তুই তার প্রমাণ।

বলীর' সঙ্গে পরিচিত ছিলেন তেমনি পরিচিত ছিলেন পূর্বোক্ত গৌণ কবিদের কাব্যকলার সঙ্গে।[৩] পূর্ববর্তীদের সেই সব সনেট বা সনেটকল্প কবিতা দেখে 'কড়ি ও কোমলে' ঐ জাতীয় কবিতা রচনায় অগ্রসর হওয়া রবীন্দ্রনাথের পক্ষে অস্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া ফরাসী কাব্যও সনেটের দিকে কবিগুরুর দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকতে পারে[৪]। আর সে-কারণেই আমার মনে হয়, নিজের প্রতিভার ঠিক অনুকূল না হওয়া সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ যে সনেটের চর্চা শুরু করেছিলেন, তার জন্য এই জাতীয় কবিতা রচনার দেশী ও বিদেশী ফ্যাসানও কতকটা দায়ী।[৫]

দ্বিতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ 'মনের আনন্দ' ও 'কল্পনার আবেগ' নিয়ে 'ছবি ও গানে' অনেকটা নভশ্চর হয়ে পড়লেও 'কড়ি ও কোমলে' বাস্তব সংসারের ডাঙ্গার পথ বেয়ে চলতে শুরু করেন। যুবককবির প্রেমস্বপ্নও এখানে স্পষ্টতঃই দেহাশ্রয়ী। কাব্যটির মধ্যে এই যে বাস্তবানুগত্য ও দেহভাবনা, মর্ত্যপ্রীতিরস ও সুখদুঃখবিরহমিলনপূর্ণ জীবনতৃষ্ণা আছে তাও হয়ত রবীন্দ্রনাথকে সনেটের দিকে আকৃষ্ট করেছে। মর্ত্য-বন্ধন ও দেহ-পীড়ন থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষাও যেমন এই যুগেই কবির মনে থেকে থেকে জেগে উঠেছে, তেমনি সনেটের 'ছোটোফুলের' মধ্যেও কবি দেখেছেন 'স্বাধীনতা', 'সমুদ্রের উদার বাতাস' ও 'বৃহৎ জগৎ, আর বৃহৎ আকাশ।' তাছাড়া পেত্রার্কা, দান্তে প্রমুখ কবিদের কাব্যানুশীলন করতে গিয়ে (তিনি এ-দু'জনকে নিয়ে অল্পবয়সেই প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সে-কথা এখানে স্মরণীয়) তিনি নিশ্চয়ই দেখেছিলেন প্রেমভাবনা প্রকাশের পক্ষে সনেট কাব্যবন্ধের উপযুক্ততা.

৩. অন্ততঃ রাজকৃষ্ণ রায়ের কবিতার সঙ্গে যে তিনি পরিচিত ছিলেন তা। প্রমাণ আছে রবীন্দ্রনাথ লিখিত প্রথম সাহিত্যসমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে।

৪. ভাবের দিক থেকে ফরাসী কাব্যের প্রভাব 'কড়ি ও কোমলে' যদি থাকেও তবু গঠনরীতির দিক থেকে ফরাসী সনেটের কোনো প্রভাব তাতে নেই। অবশ্য ফরাসী ভাষায় ফরাসী রীতির সনেটই শুধু লেখা হয় নি, পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় রীতির সনেটও লেখা হয়েছে।

৫. অবশ্য রবীন্দ্রনাথের চর্চার ফলে বাঙলা কাব্যে সনেট রচনার ফ্যাসান খুব ব্যাপকতা লাভ করে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলোচিত কবিরাও রবীন্দ্রনাথের সনেটের দ্বারা কম-বেশী পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

কতখানি। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত করা অন্যায় নয় যে, 'কড়ি ও কোমলের' বাস্তবানুরাগ, মর্ত্যভাবনা ও প্রেমতৃষার বিষয়বোধও সনেটের আঙ্গিকে কবিতা রচনায় রবীন্দ্রনাথকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে. রবীন্দ্রনাথ যখন সৌন্দর্যের নিরুদ্দেশ আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌বেজিত হয়েছেন তখন সনেট রচনা করেন নি—সাধারণ গীতিকবিতা বা ওড-জাতীয় গীতিকবিতা লিখেছেন। কিন্তু যখন তিনি বাস্তববোধে প্রবুদ্ধ, মর্ত্যপ্রীতিরসে বিভোর ও ঐতিহ্যাশ্রয়ী লোকায়ত ভাবনায় ভাবিত তখন তাঁর হাতে অনেক সময় সনেট জন্ম নিয়েছে। 'কড়ি ও কোমল', 'চৈতালি', 'নৈবেদ্য,' 'স্মরণ', 'উৎসর্গ' ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থে তার প্রমাণ আছে (ব্যতিক্রমের নিদর্শনগুলি গুরুত্বপূর্ণ নয়)।

তৃতীয়তঃ, রবীন্দ্রনাথ জানতেন,—চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরে কবির ভাব সংহত হয়ে আসে ('বিহারীলাল' প্রবন্ধ দ্রঃ)। ভাবের উচ্ছ্বাসে দীর্ঘ গীতিকবিতা রচনায় অভ্যস্ত কবি হয়ত কখনও কখনও সনেটের সীমায়িত পরিসরের মধ্যে ধরা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছেন, ভাব ও ভাষার দুর্দমনীয় অতিরেকের বদলে সনেটের সীমা-স্বর্গে মিতভাষী হতে চেয়েছেন। তবে স্বীকার করতেই হবে, কবির সেই সংযমতৃষ্ণা কবি-মনের সর্বকালীন ধর্ম নয় (কারণ সমগ্র কবিজীবনেই চোদ্দ চরণের কবিতা যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি দীর্ঘ গীতিকবিতাও লিখেছেন), তা কোনো কোনো সৃজন-মুহূর্তের সাময়িক চিত্ত-লক্ষণ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে স্পষ্টতঃই সেই সংযম সন্ধানের প্রথম প্রয়াস দেখা যায় 'কড়ি ও কোমলের' যুগে।

রবীন্দ্র-প্রতিভা যে সাধারণভাবে সনেট সৃষ্টির অনুকূল নয় এটা যেমন আমরা দেখলাম, তেমনি দেখলাম (তৎসত্ত্বেও) রবীন্দ্রনাথ কেন 'কড়ি ও কোমল' থেকে 'সেঁজুতি' পর্যন্ত কবি-জীবনে মাঝে মাঝে সনেট বা চতুর্দশপদী লিখেছেন। এখন বিচার করে দেখা দরকার, এই জাতীয় কবিতা রবীন্দ্রনাথের হাতে কী রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং সনেট হিসেবে তাদের মূল্য কতখানি।

'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী' কাব্যে মোট ৬২টি (৫৮+৪) চোদ্দ

চরণের কবিতা আছে। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তিনটি মাত্র পেত্রার্কীয় আদর্শে গঠিত হয়েছে—

(১) ছোটোফুল—কখখক খকখক চছচছচছ

(২) পূর্ণমিলন—কখকখ কখকখ চছচছছচ

(৩) হৃদয়-আকাশ—কখকখ কখকখ চছছচছচ

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, এই তিনটির মধ্যে একটিতেও খাঁটি পেত্রার্কীয় মিলের রীতি (কখখক কখখক চছজচছজ/চছচছচছ ইত্যাদি) অনুসৃত হয় নি। ষট্‌কে দুটি বা তিনটি মিলের বিচিত্র সজ্জা নিয়মানুমোদিত এবং সে-কারণেই কবিতাগুলির ষট্‌কের মিল আপত্তিজনক নয়। কিন্তু সংবৃত চতুষ্কযুগলের সাহায্যে অষ্টক রচনার যে রীতি (অর্থাৎ কখখক কখখক) সুপ্রতিষ্ঠিত এখানে স্পষ্টতঃই তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। তাছাড়া তিনি প্রথম কবিতাটির চতুষ্ক দুটিতে মিলের একই ক্রম রক্ষা করেন নি (অর্থাৎ প্রথম সংবৃত চতুষ্কে কখখক, দ্বিতীয় বিবৃত চতুষ্কে খকখক)। তবে এই জাতীয় ত্রুটি খুব গুরুতর নয় এবং মধুসূদনের সনেটেও এ-ধরনের উদাহরণ মেলে। আবর্তন-সন্ধি তিনটি কবিতাতেই আছে —তবে সর্বত্র সমান নয়। 'হৃদয়-আকাশে' অষ্টম চরণের পর ভাবের বক্রায়ণ খুব স্পষ্ট নয়, 'পূর্ণমিলনে' অষ্টম চরণের পর ভাব যতটা মোড় ফিরেছে দ্বাদশ চরণের পর তার চেয়ে বেশী মোড় ফিরেছে। বস্তুতঃপক্ষে কবিতাটিকে ত্রিধাবিভক্ত বলে মনে হয়। অবশ্য 'ছোটোফুলের' আবর্তন-সন্ধি স্পষ্টতর ও বলিষ্ঠতর—বিশেষ থেকে নির্বিশেষে, বন্ধন থেকে মুক্তির দিকে কবির এখানে উত্তরণ ঘটেছে। কিন্তু এই আবর্তন-সন্ধি—তা স্পষ্টই হোক আর অস্পষ্টই হোক—কবির সজ্ঞান অভিপ্রায় ও সচেতন শিল্পকর্মের ফল বলে মনে হয় না; তা যেন কতকটা আকস্মিক। বস্তুতঃপক্ষে কবিতা তিনটিতে যে ছন্দ-সঙ্গীত সৃষ্টি হয়েছে তা মিল-বিন্যাসের কৌশল (ও ভাবগত বক্রায়ণ) সত্ত্বেও অনর্গল প্রবহমাণতায় একস্বরা রূপ পরিগ্রহ করেছে, যথার্থ পেত্রার্কীয় কাব্য-সঙ্গীতের মতো জটিল ধ্বনি-বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সমবায়ী ও সুবলয়িত সঙ্গীত-পরিণাম লাভ করতে পারে নি। সুতরাং বাহ্যতঃ নিয়মসম্মত হলেও এই সনেট তিনটিতে, তলিয়ে দেখতে গেলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ঠিক লক্ষ্যভেদ করতে পারেন নি।

আলোচ্য দুটি কাব্যগ্রন্থে খাঁটি সেক্সপীরীয় মিলের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে নিম্নলিখিত বারোটি কবিতায়—হৃদয়ের ভাষা; স্মৃতি; কেন; পবিত্র প্রেম; অস্তমান রবি; অস্তাচলের পরপারে; অক্ষমতা; জাগিবার চেষ্টা;

কবির অহঙ্কার; বিজনে; সত্য (১); তবু ('মানসী')। কবিতাগুলির মিলের পদ্ধতি হচ্ছে—কখকখ গঘগঘ পফপফ চচ। বিচার করলে দেখা যায়, পেত্রার্কীয় ঢঙের সনেটগুলির চেয়ে এই সেক্সপীরীয় ঢঙের সনেটগুলি অধিকতর স্বচ্ছন্দ এবং ভাবোপযোগী। কারণ একথা সত্য যে, পেত্রার্কীয় সনেট অপেক্ষা সেক্সপীরীয় সনেট অনেক বেশী স্বাধীন রচনা (প্রথমটিতে মিলের সংখ্যা মাত্র চার/পাঁচ, দ্বিতীয়টিতে সাত; ফলে দ্বিতীয়টির রচনা অপেক্ষাকৃত কম মনোযোগ ও পরিশ্রমসাপেক্ষ) এবং রবীন্দ্রনাথের বন্ধন-অসহিষ্ণু কবি-মনের পক্ষে স্বভাবতঃই দ্বিতীয়টি অধিকতর অনুকূল। তবে পেত্রার্কীয় সনেটের তুলনায় এই আপেক্ষিক স্বাচ্ছন্দ্য ও উৎকর্ষ সত্ত্বেও সেক্সপীরীয় রীতির সনেট রচনায়ও রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি সিদ্ধিলাভ করেন নি। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবির সনেটগুলির গঠন logical deduction-এর ভঙ্গি নেয় নি; ভাবের ক্রমাভিব্যক্তির বুদ্ধিসিদ্ধ বিন্যাসের দিকে কবি তেমন দৃষ্টি দেন নি; আবেগের সঙ্গে চিন্তার ওতপ্রোত সহযোগ ঘটে নি। কিন্তু দ্বাদশ চরণ জুড়ে ভাবের আবেগাত্মক একমুখী প্লাবনের পর যখন শেষ দুটি চরণে তার সংক্ষেপ বা সংহতির প্রশ্ন উঠেছে, তখন স্বভাবতঃই বুদ্ধির বয়ন-কৌশলের ওপর কবিকে অকস্মাৎ খুব বেশী নির্ভর করতে হয়েছে। আর তার ফলে কবিতাগুলির আভ্যন্তরীণ ভারসাম্য যেমন কতকটা বিপর্যস্ত হয়েছে, তেমনি বাইরের গঠনও প্রত্যাশিত পরিমাণে মসৃণ হয়ে ওঠে নি। নবযৌবনের আত্মপ্রকাশের আবেগ যদি এত প্রবল না হত, কবিতাগুলি যদি ধাপে ধাপে সুপরিকল্পিত প্যাটার্নে বুদ্ধিধর্মের আলোকিত সমন্বয়ে অনিবার্য পরিণামের দিকে এগিয়ে যেত তবে সেক্সপীরীয় সনেট হিসেবে এদের গঠন হত আরও পরিচ্ছন্ন। কবিতাগুলির রসমধুর ও শ্রুতিসুন্দর ভাষাবিন্যাস এবং ক্ষেত্র-বিশেষে অন্তিম পয়ারের বৈসাদৃশ্যজনিত উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও তাদের রূপ-সমগ্রতায় এ-ত্রুটি অবশ্য স্বীকার্য।

উদাহরণ স্বরূপ 'পবিত্র প্রেম' কবিতাটি বিচার করা যাক্—

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না ওরে, দাঁড়াও সরিয়া। ক
ম্লান করিও না আর মলিন পরশে। খ
ওই দেখ তিলে তিলে যেতেছে মরিয়া, ক
বাসনা নিশ্বাস তব গরল বরষে। খ
জান না কি হৃদিমাঝে ফুটেছে যে ফুল, গ
ধূলায় ফেলিলে তারে ফুটিবে না আর। ঘ

জান না কি সংসারের পাথার অকূল ঘ
জান না কি জীবনের পথ অন্ধকার। ঘ
আপনি উঠেছে ওই ভব ধ্রুবতারা, প
আপনি ফুটেছে ফুল বিধির কৃপায়, ফ
সাধ করে কে আজিয়ে হবে পথহারা— প
সাধ করে এ কুসুম কে দলিবে পায়। ফ
যে প্রদীপ আলো দেবে তাহে ফেল শ্বাস, চ
যারে ভালোবাস তারে করিছ বিনাশ। চ

এই কবিতার প্রথম বারো চরণে পবিত্র প্রেমের প্রতি কবির আকর্ষণ ও বাসনা-গরল সম্বন্ধে তাঁর প্রবল বিতৃষ্ণা উচ্ছ্বসিত ও আবেগাত্মক রূপ লাভ করেছে। মঙ্গল-প্রেমের ধ্রুবতারাকে দেখে 'লাজরক্ত লালসার রাঙা শতদলকে' বর্জন করার যে আগ্রহ এখানে অভিব্যক্ত তা কবির কোনো মনন-ক্রিয়ার অনিবার্য ফল নয়—এ তাঁর এক ধরনের ভাবাবেগেরই প্রকাশ মাত্র। রবীন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গির মধ্যে বুদ্ধিবিন্যাসের লক্ষণের চেয়ে হৃদয়-দোলার লক্ষণই অধিকতর প্রকট। লক্ষণীয় এই যে, কবিতাটির বাক্-রূপও কতকটা গানের মতোই হয়ে উঠেছে। 'ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না ওরে', 'কে আজিয়ে'—যেমন এই ধরনের বাক্-বিন্যাস, তেমনি 'জান না কি' (তিনবার) ও 'সাধ করে' (দু'বার) বাক্যাংশের পুনরাবৃত্তি অনিবার্যভাবেই গানের বচনভঙ্গি ও ধ্রুবপদ স্মরণ করিয়ে দেয়। সুতরাং সঙ্গতভাবেই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, কবিতাটির প্রথম বারো চরণ সঙ্গীতাত্মক ও আবেগ-নির্ভর। কিন্তু তার পরেই অন্তিম পয়ারবন্ধে কবি তুলনাত্মক রীতিতে যে উপসংহার টেনেছেন, তা একান্তই বুদ্ধিপ্রসূত। ফলে ভাবে ও ভঙ্গিতে প্রথম বারো চরণের সঙ্গে শেষ দুই চরণের একটা পার্থক্য এসে গেছে এবং সেই পার্থক্যের জন্যই কবিতটার গঠনও সুবলয়িত ও সুষম হয়ে ওঠে নি। সেক্সপীরীয় সনেট হিসেবে 'পবিত্র প্রেমের' এখানেই ত্রুটি।

এই বারোটি সনেট ছাড়া আরও এমন কতগুলি সনেট রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন যাদের মধ্যে সেক্সপীরীয় পয়ারপুচ্ছ আছে বটে, কিন্তু তাদের চতুষ্কত্রয়ে নিয়মের বিশুদ্ধ অনুসরণ নেই। যেমন—

(১) প্রাণ—কখকখ গঘগঘ পধপধ চচ
(২) স্তন (১)—কখখক কখপপ গকগক চচ
(৩) স্তন (২)—কখকখ গকগপ পকপক চচ

(৪) চুম্বন—কখকগ গঘখগ খগচখ চচ

(৫) বিবসনা—কখখক গগখগ খপখপ চচ

(৬) বাহু—কখখক কগকগ পফপফ চচ

(৭) হৃদয়-আসন—কখকখ গঘগঘ খপখপ চচ

(৮) স্বপ্নরুদ্ধ—কখকখ খগখগ পফপফ চচ

প্রথম, সপ্তম ও অষ্টমটি ছাড়া অন্য পাঁচটিকে মিলের পদ্ধতির দিক থেকে শুদ্ধ সেক্সপীরীয় সনেট বলাও কঠিন, কারণ পয়ারপুচ্ছ ছাড়া অন্য কোথায়ও প্রথানুগত্য নেই। দ্বিতীয়তঃ, কবিতাগুলির মিলের যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তার মধ্য থেকে কোনো বিশেষ ছক বার করা যায় না—আটটি কবিতার মিলের রীতি আট রকমের। তৃতীয়তঃ, কোনো কোনো মিলের সংস্থান খুবই অদ্ভুত ধরনের। যেমন স্তন (১) কবিতায় দ্বিতীয় চতুষ্কের অন্তর্গত সপ্তম ও অষ্টম চরণকে মিলের জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে তৃতীয় চতুষ্কের অন্তর্গত যথাক্রমে নবম ও একাদশ চরণ পর্যন্ত। 'চুম্বন' কবিতায় 'খ' মিলের দ্বারা আবদ্ধ হয়েছে দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ চরণ এবং সেই চরণগুলি হচ্ছে তিনটি চতুষ্কের অন্তর্ভুক্ত। 'চ' মিলটি প্রথমে এসেছে একাদশ চরণে এবং পুনরাবৃত্ত হয়েছে পয়ারপুচ্ছে। তার ফলে একদিকে যেমন চতুষ্কগুলি ('চুম্বনে' পয়ারপুচ্ছও বটে) মিলের দিক থেকে স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গঠন লাভ করে নি, তেমনি কোনো কোনো অন্ত্যমিল প্রত্যাশিত চরণান্তরে সমধ্বনির সহযোগিতা পায় নি, পেয়েছে অপ্রত্যাশিত চরণান্তরে। মিলগুলির সেই ক্ষণিক নিরবলম্বতা ও অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে অনুরণিত সমধ্বনির আকস্মিকতা সনেটগুলির পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক হয়েছে। মিল-প্রয়োগের ও গঠনভঙ্গির এই স্বেচ্ছাচারিতা নিয়মনিষ্ঠ সনেটের ক্লাসিক্যাল চরিত্রের পক্ষে অতি-ব্যভিচারী লক্ষণ মাত্র।

কাব্যগ্রন্থ দুটিতে অনেকগুলি পয়ারপুচ্ছহীন চতুর্দশপদী আছে। সেই কবিতাগুলিকে পেত্রার্কীয় সনেট-আদর্শে বিচার করলে তাদের নিয়মভ্রষ্টতা সহজেই চোখে পড়ে।

(১) গীতোচ্ছ্বাস—ককখগখগপগ/চখছছচছ

(২) চরণ—কখকখগকগক/চচকছকছ

(৩) অঞ্চলের বাতাস—ককখকখখকখ/কখখচখচ

(৪) নিদ্রিতার চিত্র—কখকখগঘগঘ/চছচজছজ

(৫) পবিত্র জীবন—কখকখগগঘগ/ঘচঘচঘচ

(৬) সিন্ধুগর্ভ—কখকখখকখগ/খগকচছচ

(৭) সিন্ধুতীরে—ককখখগঘগঘ/খচচখখচ

দেখা যাচ্ছে, উদাহৃত এই সাতটি সনেটেও কোনো সামান্য লক্ষণ নেই, কোনো বিশেষ ছক অনুযায়ী এগুলি রচিত হয় নি। মিলের ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে মিত্রাক্ষর-প্রবণতা যেমন দেখা যায় তেমনি দেখা যায় বিশৃঙ্খলা। অষ্টকের মিলকে ষট্‌কে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টার ফলে মিলসূচক চরণগুলির মধ্যে অসঙ্গত ব্যবধান অনেক ক্ষেত্রেই এসে গেছে। অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ হয় অস্পষ্ট, নয় অনুপস্থিত। সুতরাং এই জাতীয় কবিতাকে পেত্রার্কীয় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত না করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে।

সুতরাং 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীর' চতুর্দশপদীগুলি সম্পর্কে আমার সিদ্ধান্ত হচ্ছে—

(১) মাত্র ১৫টি (৩+১২) হচ্ছে বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেট।

(২) অবশিষ্ট ৪৭টি হচ্ছে নিয়মভ্রষ্ট গঠন ও বিশৃঙ্খল মিলের কবিতা।

(৩) সেই ৪৭টি কবিতায় শুধু যে খাঁটি পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেট-আদর্শের ব্যভিচার ঘটেছে তা নয়, তাতে রবীন্দ্রনাথের সনেট রচনার কোনো নিজস্ব ছকেরও সন্ধান পাওয়া যায় না।

(৪) সেই ৪৭টি কবিতার মধ্যে কতকগুলি পয়ারপুচ্ছযুক্ত (অর্থাৎ তথাকথিত সেক্সপীরীয়) কবিতায় মিলের সংখ্যা তিন, চার, পাঁচ ও ছয়। তিন, চার পাঁচ ও ছয় মিলের এই কবিতাগুলিকে শিথিল বা ভঙ্গ সেক্সপীরীয় সনেটও বলা যায় কি না সন্দেহ। সাংগঠনিক গুণাগুণের দিক থেকে মধুসূদনের শিথিল বা ভঙ্গ সেক্সপীরীয় সনেটগুলির চেয়ে এগুলি নিকৃষ্টতর।

(৫) সেই ৪৭টি কবিতার মধ্যে পয়ারপুচ্ছহীন কতকগুলি কবিতা আছে যাদের পেত্রার্কীয় মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা সন্দেহ। তাদের মিলের সংখ্যা তিন থেকে সাত। সাংগঠনিক দিক থেকে এগুলি মধুসূদনের শিথিল বা ভঙ্গ সেক্সপীরীয় সনেটগুলির চেয়ে উৎকৃষ্ট নয়।

(৬) সেই ৪৭টি কবিতার মধ্যে যেগুলি তথাকথিত সেক্সপীরীয় (উপরের ৪নং সূত্র দ্রষ্টব্য), তাদের প্রথম আট চরণে কোথায়ও কোথায়ও দুইটি বা তিনটি মিল দেখা যায়। তার পেছনে পেত্রার্কীয় সনেটের অষ্টকের প্রভাব থাকা অসম্ভব নয়। সুতরাং পেত্রার্কীয় ধরনের অষ্টক ও সেক্সপীরীয় ধরনের পয়ারপুচ্ছ থাকায় এগুলি কতকটা মিশ্ররীতির কবিতা হয়ে উঠেছে।

(৭) সেই ৪৭টি কবিতার মধ্যে কোনো কোনোটিতে যে অষ্টক-ষট্‌ক ছেদের অভাব ও মিল-প্রয়োগের বিশেষ রীতি লক্ষ্য করা যায় তা ওয়ার্ডস্‌-ওয়ার্থের অনুরূপ সনেট স্মরণ করিয়ে দেয়।

(৮) আগাগোড়া মিত্রাক্ষর দ্বিপদী দ্বারা চতুর্দশপদী রচনার চেষ্টা কবি এখানে করেন নি বটে, তবে কোথায়ও কোথায়ও কবিতার আরম্ভে বা অন্ত কোনো স্থানে সেই ধরনের দ্বিপদী আত্মপ্রকাশ করেছে।

(৯) কবির অসতর্কতায় কোনো কোনো কবিতা ত্রয়োদশ চরণে সমাপ্ত হয়েছে, (কড়ি ও কোমলের 'রাত্রি', সোনার তরীর 'খেলা' উল্লেখযোগ্য)।

(১০) কোনো কোনো চতুর্দশপদীর চরণের পরিমাপ রবীন্দ্রনাথ ১৬ ('গান-রচনা'), ১৮ ('রাত্রি', 'চিরদিন') ও ২০ ('যৌবন-স্বপ্ন') মাত্রায় প্রসারিত করেছেন। কবির সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষার ঐতিহাসিক মূল্য থাকলেও তিনি সর্বত্র সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি।

(১১) কোনো কোনো মিলকে তিনি অসম্পূর্ণ বা নিরবলম্ব রেখে দিয়েছেন, তাতে সংশ্লিষ্ট কবিতার ধ্বনিরূপ পঙ্গু হয়ে গেছে ('সিন্ধু-গর্ভ' কবিতার ত্রয়োদশ চরণ দ্রষ্টব্য)।

(১২) চতুর্দশপদীগুলির ছন্দকে প্রবহমাণ করার কোনো চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ এখানে করেন নি—সে চেষ্টা তিনি করেছেন পরবর্তীকালে।

(১৩) সনেট-পরম্পরা রচনার কিছু উদাহরণ কাব্যগ্রন্থদুটিতে আছে ('স্তন', 'চিরদিন')।

(১৪) সবচেয়ে বড় কথা, রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ সনেট রচনার নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস করেন নি এবং সেটা তাঁর সজ্ঞান অভিপ্রায়ের মধ্যেও ছিল কিনা সন্দেহ।

৪.

কিছু সংখ্যক বিশুদ্ধ পেত্রার্কীয় ও সেক্সপীরীয় সনেট রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীর' চতুর্দশপদীগুলিতে যে ধরনের নিয়মভ্রষ্টতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছেন তার জের চলেছে 'চিত্রা' পর্যন্ত। কিন্তু 'চৈতালিতে' কবির চতুর্দশপদী আরও সংস্কারমুক্তির (liberalisation) পথে অগ্রসর হয়েছে। মাঝে মাঝে মিত্রাক্ষর দ্বিপদী রচনার কিছু প্রয়াস দেখা

গেলেও রবীন্দ্রনাথ এতদিন মিলসজ্জার বিচিত্রতার দিকেই লক্ষ্য রেখেছেন। কিন্তু 'চৈতালির' প্রায় সব চতুর্দশপদীই তিনি রচনা করেছেন সাতটি সাদাসিধে মিত্রাক্ষর দ্বিপদীর সাহায্যে। তাছাড়া সনেটের অন্যান্য সাংগঠনিক বৈশিষ্ট্যও কবিতাগুলির মধ্যে অনুপস্থিত। পয়ার-মিলের এই একাধিপত্য 'নৈবেদ্যের' চতুর্দশপদীগুলির মধ্যেও আছে। তাছাড়া শেষোক্ত কাব্যটির মধ্যে স্তবক-সজ্জায়ও নূতনত্ব দেখাবার চেষ্টা করেছেন। কিছু উদাহরণ দিচ্ছি—

২২ নং—৬+৮

২৩ নং—৮½+৫½

২৫ নং—২+৬+৬

২৮ নং—২+৪+৬+২

৩০ নং—১+৭½+৩½+২

৩২ নং—৪+৮+২

৩৪ নং—১০+৪

৪৫ নং—৪½+৮(½+৭+½)+১½

এই ধরনের স্তবকসজ্জা (মিলের প্রশ্ন যদি নাও তোলা হয়) যেখানে আছে সেখানে পেত্রার্কীয় সনেটের দ্বিধাবিভক্ত রূপ কিংবা সেক্সপীরীয় সনেটের চতুর্ধা-বিভক্ত রূপকে একেবারে ভেঙেচুরে দেওয়া হয়েছে। 'নৈবেদ্যের' কবিতাগুলির গড়নের সঙ্গে স্পষ্টতঃই রীতিসম্মত সনেটের অবয়ব-সংস্থানের দূরগত সারূপ্যও নেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, সনেটের রূপাদর্শকে নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্ত করার যে প্রয়াস রবীন্দ্রনাথ 'কড়ি ও কোমলেই' দেখিয়েছিলেন, 'নৈবেদ্যে' স্তবকসজ্জার ক্ষেত্রেও সেই প্রয়াস অব্যাহত আছে। তবে পয়ার-মিল হলেও মিল তিনি বজায় রেখেছেন। অবশ্য সেই মিলটুকুকেও বর্জন করার উদাহরণ 'প্রান্তিকের' ৩নং ও ৫নং কবিতায় আছে।

> এ জন্মের সাথে লগ্ন স্বপ্নের জটিল সূত্র যবে
> ছিঁড়িল অদৃশ্য ঘাতে, সে মুহূর্তে দেখিনু সম্মুখে
> অজ্ঞাত সুদীর্ঘ পথ অতিদূর নিঃসঙ্গের দেশে
> নিরাসক্ত নিয়মের পানে। অকস্মাৎ মহা একা
> ডাক দিল একাকীরে প্রলয়তোরণচূড়া হতে।

ইত্যাদি—৩নং কবিতা।

সনেটের সংস্কারমুক্তির জন্য রবীন্দ্র-প্রয়াসের চূড়ান্ত পরিণাম হচ্ছে এই মিলহীনতা।

তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। সনেটের দুর্গম দেশটি রবীন্দ্রনাথের অনধিকৃত থেকে গেলেও যে চতুর্দশপদীগুলি তিনি রচনা করে গেছেন তা কবিতা হিসেবে মহৎ। বস্তুতঃ তাঁর হাতেই বাঙলা চতুর্দশপদী কবিতা ভাবৈক্যে, কল্পনার সংহত প্রকাশে ও মণ্ডনকলার অনুপম সৌন্দর্যে চরম উৎকর্ষ লাভ করেছে। একটা ছোট্ট পরিসরের মধ্যে মনের ভাবকে পরিস্ফুট করার এমন আশ্চর্য দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। পূর্ববর্তী কাব্যগ্রন্থগুলিতে সর্বত্র কবির স্বপ্নাতুর অনুভূতি ও হৃদয়ভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি, চিত্রকল্পগুলি ছিল অনির্দিষ্ট, ভাষা ও ছন্দ সুষম ও সংহত আকার ধারণ করতে পারে নি। কিন্তু 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসীর' আলোচ্য কবিতাগুলিতে কবির আত্মচেতনা দেহ-সংস্কার ও বস্তুধর্মের মধ্যে অনেকটা সাকার হয়ে উঠেছে। অথচ কবিপ্রাণের সমস্ত উল্লাস, উৎকণ্ঠা, দ্বন্দ্ব ও মুক্তিকামনার মধ্যেও অনুভূতির লাবণ্য ও কল্পনার রঙ অব্যাহত আছে। কবিতাগুলির চিত্রকল্পের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, কবির পুরনো ও নতুন উপমালোক পরিমিতি ও পরিচ্ছন্নতায়, ভাববহনক্ষমতা ও সৌন্দর্য-ধর্মিতায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে। চিত্রকল্পের ওপর কবির অধিকার এত বেড়েছে যে, তিনি নিজের ইচ্ছামতো তা ব্যবহার করেছেন—এমন কি একই চিত্রকল্পকে বিপরীতমুখী ভাবের প্রতিষ্ঠায় সার্থকভাবে নিয়োজিত করেছেন। কবিতার মর্মবস্তু ও প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে চিত্রকল্পগুলি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলে কবিতা-গুলির পক্ষে তা অপরিহার্যও হয়ে উঠেছে। চতুর্দশপদীগুলির গঠন সনেট-আদর্শের দিক থেকে প্রথাসিদ্ধ নয়, এটা আমরা পূর্বেই দেখেছি। তাই প্রত্যেকটি কবিতাকে যদি সনেটের অপরিবর্তনীয় নিয়মের দিক থেকে নয়, পৃথক পৃথক কবিকর্ম হিসেবে বিচার করা যায়, তবে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির প্রশংসা না করার কোনো কারণ নেই। সনেট হিসেবে কবিতাগুলি কৌলীন্যচ্যুত হলেও ভাবানুগ রূপ পরিগ্রহ করার জন্যই এরা কবিতা হিসেবে সার্থক হয়ে উঠেছে। কবিতাগুলির ছন্দোরূপের মধ্যে যে কোনো বিশেষ রাবীন্দ্রিক প্যাটার্নও খুঁজে পাওয়া যায় না, তার কারণ রূপপরিবর্তনশীল রোমান্টিক কবিকর্ম হিসেবেই তিনি এদের সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, তিনি সনেট-নির্দিষ্ট চোদ্দ চরণের পরিসরকে অনবদ্য গীতিকবিতা সৃষ্টির কাজে লাগিয়েছেন এবং আত্মপ্রকাশের প্রেরণাতেই নিজেকে একটা নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে শৃঙ্খলাবদ্ধ করেছেন। কবিতাগুলি পড়লে মনে হয়—'অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ'—এই আশার উদ্দীপন

ও পূরণ তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তিনি যেন ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের মতো বলতে চেয়েছেন—

In truth the prison, unto which we doom
Ourselves, no prison is.

তাঁর হাতে বাঙলা চতুর্দশপদী কতখানি উৎকর্ষ লাভ করেছে তার নিদর্শন হিসেবে 'কড়ি ও কোমলের' একটি রূপলাবণ্যময় ও রসভারাতুর কবিতা এখানে উদ্ধৃত করছি—

অধরের কানে যেন অধরের ভাষা।
দোঁহার হৃদয় যেন দোঁহে পান করে।
গৃহ ছেড়ে নিরুদ্দেশ দুটি ভালোবাসা
তীর্থযাত্রা করিয়াছে অধর সংগমে।
দুইটি তরঙ্গ উঠি প্রেমের নিয়মে
ভাঙিয়া মিলিয়া যায় দুইটি অধরে।
ব্যাকুল বাসনা দুটি চাহি পরস্পরে
দেহের সীমায় আসি দুজনের দেখা।
প্রেম লিখিতেছে গান কোমল আখরে
অধরেতে থরে থরে চুম্বনের লেখা।
দুখানি অধর হতে কুসুম-চয়ন,
মালিকা গাঁথিবে বুঝি ফিরে গিয়ে ঘরে।
দুটি অধরের এই মধুর মিলন
দুইটি হাসির রাঙা বাসর-শয়ন॥

—চুম্বন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টি নিয়ে বিচার করলে দেখা যায়, মধুসূদনের সনেট বাঙলা কাব্যে যতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে, তার চেয়ে বেশী করেছে রবীন্দ্রনাথের চতুর্দশপদী কবিতা। 'কড়ি ও কোমলের' ঢঙে প্রেম ও সম্ভোগের কবিতা লেখা সেকালের কবিদের প্রিয় কবিকর্ম হয়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, প্রিয়নাথ সেন, কামিনী রায়, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, চিত্তরঞ্জন দাশ ইত্যাদি কত কবিই না রবীন্দ্রনাথের এই ছোটো ফুলগুলির সৌন্দর্যে বিমোহিত হয়ে কবিতা রচনায় অগ্রসর হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ এগুলিকে খাঁটি সোনার সঙ্গে তুলনা করেই ক্ষান্ত হন নি, মুগ্ধ কণ্ঠে বলে উঠেছেন—

হে রবীন্দ্রনাথ, তোমার ও সুন্দর-সনেট
কি সরস! নারিঙ্গির সুরভি সমীরে,
মুক্ত বাতায়নে বসি ক্ষুদ্র জুলিয়েট,
ফেলিছে বিরহশ্বাস যেন গো সুধীরে।

*   *   *

নব বলম্বিতা লতা বালিকা যৌবন
শিহরিয়া উঠে যথা সমীর পরশে,
লাজে বাধ বাধ বাণী, রূপের আলসে
ঢল ঢল তোমার ও কবিত্ব মোহন।

—রবীন্দ্রবাবুর সনেট

পরিশিষ্ট

নির্ঘণ্ট

ব্যক্তিপ্রসঙ্গ

সাহিত্য-প্রসঙ্গ